হায়াতে শায়খুল হাদীছ

মাওলানা যাকারিয়া (র.)

আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

হায়াতে শায়খুল হাদীছ
মাওলানা যাকারিয়া (র.)

[শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (র.)-র জীবনী]

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

হায়াতে শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (র.)
মূল ঃ আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)
অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী

প্রকাশকাল
বৈশাখ ১৪০৭
মুহাররম ১৪২১
এপ্রিল ২০০০

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৬৭
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৭০
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২২.৯৭
ISBN : 984-06-0548-8

প্রকাশক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

প্রচ্ছদ অংকন
জসিম উদ্দীন

মূল্য ঃ ৫০·০০ টাকা

HAYAT-E-SAIKHUL HADITH MAULANA ZAKARIA (R.) : (The Life of Shaikhul Hadith Maulana Zakaria (R.)) written by Allama Syed Abul Hassan Ali Nadovi (R.) in Urdu and Translated by Moulana Abdullah Bin Sayeed Jalalabadi Al-Azhari into Bengali and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Shar-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 April 2000

Price : Tk 50·00 ; US $: 2·00

প্রকাশকের কথা

শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (র.) উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলিম, মুহাদ্দিছ এবং বুযুর্গ ছিলেন। এই মহান মনীষীর গোটা জীবনই ছিলো ইসলামের খিদমতের জন্য উৎসর্গকৃত। তিনি পবিত্র কুরআন হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর অগণিত পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি যেমন পবিত্র কুরআন হাদীছ শিখেছেন, শিখিয়েছেন, তদনুযায়ী আমলও করেছেন এবং তা লিখেও গেছেন। এর মধ্যে বিভিন্ন আমলের ফাযায়েল এবং হাদীছশাস্ত্রের উপর তাঁর লিখিত বইগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়া ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি ভারতবর্ষের বাইরেও ইংল্যান্ড, আফ্রিকাসহ বহুদেশ সফর করেছেন। জীবনের শেষ সময়টা কাটিয়েছেন পবিত্র মক্কা-মদীনায় ইসলামের খিদমত করে।

মনীষীদের জীবন থেকে বহু কিছু জানার ও শেখার আছে। এই জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন মনীষীদের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। মাওলানা যাকারিয়া (র.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও তার কর্ম নিয়ে 'হায়াতে শায়খুল হাদীছ নামক গ্রন্থটি রচনা করেছেন ভারতবর্ষের আরেক প্রখ্যাত আলিম, লেখক ও জীবনীকার আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)। উর্দূ ভাষায় রচিত এই জীবনী গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিম ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী। আশা করি এই গ্রন্থখানি কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ সর্ব বয়সের সর্বস্তরের মানুষের উপকারে আসবে এবং পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে। বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র) ছিলেন শতাব্দীর মহীরুহ। তাঁর গোড়ায় রয়েছেন হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র)-এর মত বিগত শতকের মহান আলিমে রব্বানী এবং শাখা-প্রশাখায় পৃথিবীর প্রায় সব ক'টি মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা তাঁর অসংখ্য শিষ্য-শাগরেদ ও তাঁরই হাতে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁর খলীফাগণ। কুরআনের ভাষায় ঃ

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

'তার শিকড় সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত আর শাখা-প্রশাখা আকাশ ছোঁয়া-দিগন্তে বিস্তৃত।' উপমহাদেশের আলিম সমাজে তিনি তাঁর আসল নামের চাইতেও "শায়খুল হাদীছ" নামেই সমধিক পরিচিত। প্রসিদ্ধ তাবলীগী জামাআতের তিনি ছিলেন রূপকার, তাত্ত্বিক ও পরিচালক মুরব্বী। তাঁর কলমনি:সৃত রচনাবলীই তাবলীগী জামাআতের আত্মিক খোরাক ও চালিকাশক্তিরূপে গোড়া থেকেই কাজ করে এসেছে। জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মওলানা ইলিয়াস (র) ছিলেন একাধারে তাঁর আপন চাচা, উস্তাদ ও শ্বশুর। জামাআতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তরণকারী হযরত মাওলানা ইউসুফ (র) একাধারে তাঁর চাচাতো ভাই, শাগরিদ ও জামাআতা ছিলেন। বর্তমান আমীর হযরত মাওলানা এন্‌আমূল হাসানও তাঁরই একজন খলীফা ও জামাআতা। এঁরা প্রত্যেকেই শায়খুল হাদীছের পরামর্শে পরিচালিত হতেন এবং জামাতের এ তিন পুরুষের কাছেই তিনি ছিলেন এক মহান তাত্ত্বিক ও মুরব্বী। বাংলাদেশের তাবলীগ জমাতের আমীর হযরত মওলানা আবদুল আযীয খুলনবী (মাদ্দা যিল্লুহুল আলী) সহ পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মহাদেশে তাবলীগী জামাআতের নেতৃত্বে বরিত ব্যক্তিগণের প্রায় সকলেই তাঁর খিলাফত বা আধ্যাত্মিক সনদপ্রাপ্ত। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাঁর রচিত পুস্তকাবলী জামাআতের কর্মিগণ কর্তৃক মসজিদে মসজিদে পঠিত ও ব্যাপকভাবে শ্রুত হয়ে থাকে। আমি স্বয়ং দূরপ্রাচ্যের সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর ও জহুরবারুতে এবং মধ্যপ্রাচ্যের মক্কা-মদীনা শরীফে ও কায়রোতে

তা' প্রত্যক্ষ করেছি। এ যুগের কোন মনীষীর রচনাবলী এভাবে এত শ্রদ্ধার সাথে পৃথিবীর কোন দেশে পঠিত হয় কিনা সন্দেহ। ১৫ খণ্ডে আরবী ভাষায় প্রকাশিত তাঁর "আওযাজুল মাসালিক ফী শারহে মুয়াত্তা মালিক" আরব বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত। কায়রোর বাজারে কিতাবখানার মূল্য ১৫০ পাউণ্ড বলে "মাক্‌তাবায়ে সাইয়েদিনা মুস্তাফা (সা)"–এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব শায়খ ইবরাহীম সাহেব আমাকে জানিয়েছিলেন।

এহেন একজন যুগবরেণ্য মনীষীর জীবন–চরিত যে কী গুরুত্ববহ ও শিক্ষণীয় তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এত বড় একজন মনীষীর সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের আলোচনাও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বিশেষত আমাদের মত দূরবর্তী এলাকায় বসে। এতদসত্ত্বেও আমি তাঁর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরে লাহোরের উর্দু ডাইজেষ্ট ও উর্দু সাপ্তাহিক "খুদ্দামুদ্দীন" শায়খুল হাদীছ সংখ্যার সাহায্য নিয়ে ৮০ পৃষ্ঠার একটি জীবনী লিখে আমার অনূদিত হযরতের "ফাযায়েলে রমযানের" সাথে জুড়ে দিয়ে ১৯৮৪ সালে "ফাযায়েলে রমযান ও তাঁর অমর রচয়িতা শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (র)" শিরোনামে আমার সম্পাদিত মহানবী স্মরণিকার বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশ করি। তারপরপরই প্রিয়বর মাওলানা সালমান নদভী রচিত শায়খুল হাদীছের একখানা জীবনী পুস্তিকা প্রকাশিত হয় কিন্তু শায়খুল হাদীছের পূর্ণাঙ্গ একখানা নির্ভরযোগ্য জীবনী পুস্তক লেখার উপাদান তাঁর হাতেই বা ছিল কোথায়? তবুও বাংলাভাষার প্রাথমিক উদ্যোগরূপে তাঁর এ উদ্যোগকে অভিনন্দিত করা যায়।

শায়খুল হাদীছের জীবনী রচনার সকল মালমশল্লা হাতে নিয়ে তাঁর একখানা জীবনী রচনায় হাত দিয়ে এযুগের অন্যতম মনীষা ও শায়খুল হাদীছের সুদীর্ঘ কালের স্নেহছায়া ও সাহচর্যপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন আলেম আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (মাদ্দা যিল্লাহুল আলী) লক্ষ লক্ষ উদগ্রীব পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি ও যুগের একটি বিরাট প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় রচিত এ জীবনী পুস্তকে তিনি এমন কিছু তথ্য ও স্বয়ং শায়খুল হাদীসের বিভিন্ন সময়ে তাঁকে লিখিত মূল্যবান পত্রাবলীর উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করে যে মৌলিক গ্রন্থটি রচনা করেছেন, অন্যদের পক্ষে তা কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না। জীবনী রচনায় সিদ্ধহস্ত এ কুশলী লেখকের হাতে তাঁর যৌবনে রচিত হয়েছে "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ" নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ।তারপর একে একে তিনি মাওলানা ইলিয়াস (র)

ও মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর স্বতন্ত্র জীবনী পুস্তক রচনা করেছেন। এ ছাড়া "পুরানে চেরাগ" নামক দুই খণ্ডে লিখিত তাঁর প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় স্মৃতিকথা জাতীয় পুস্তকে তিনি সমকালীন প্রায় সকল মনীষী সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এগুলো কেবল আলোচনা ও স্মৃতিকথাই নয়, মনীষার মূল্যায়নও বটে এবং এ মূল্যায়ন কেবল তাঁর মত একজন প্রজ্ঞাবান ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন মনীষীর পক্ষেই সম্ভব। তাই তাঁরই হাতে লিখিত শায়খুল হাদীছের জীবনী পুস্তকখানা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

মাওলানা নদভী ও তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে আমার আগ্রহ ও কৌতূহল সুদীর্ঘকালের। সম্প্রতি আমার কায়রো অবস্থানকালে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে তাঁর আরবী পুস্তকাবলীর কাটতি ও তাঁর মর্যাদা দেখে আমার সে কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বেও তাঁর একাধিক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

চলতি বছরের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে কায়রো থেকে ফিরেই যখন আমার মিসর সফরের অভিজ্ঞতা একটি ভ্রমণ কাহিনী আকারে লেখার মানসিকভাবে একটু প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এমনি সময় বন্ধুবর মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাসঊদ মাওলানা নদভী লিখিত এ কিতাবখানা অনুবাদ করে দেয়ার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনুরোধ করে পাঠালেন। কাজটি যেহেতু আমার অত্যন্ত মনঃপূত এবং লেখক ও প্রতিপাদ্য মনীষী আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই নিজের ভ্রমণকাহিনী রচনার চিন্তা আপাততঃ বাদ দিয়েই এ কাজে প্রবৃত্ত হই। গণভবন মসজিদের নানা ঝামেলা এবং নিজের সাংসারিক ও সামাজিক বিভিন্ন ব্যস্ততার জন্য অনুবাদকার্যে প্রায় দশ মাস দেরী হলেও প্রকৃতপক্ষে বিগত তিন মাসেই আমি এ কাজটি সম্পন্ন করি। আশা করি মাওলানা নদভী রচিত শায়খুল হাদীছের ধর্মীয় জীবন-চরিত অনুবাদ পাঠক সমাজের জন্যে উপাদেয় প্রতিপন্ন হবে এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজের আদর্শ ও চরিত্রের দুর্ভিক্ষের এই যুগে হযরত শায়খুল হাদীছের আদর্শ জীবনকথা ও শিক্ষাবলী আমাদের আদর্শঅনুসন্ধিৎসু ও ইসলামী বিপ্লব প্রত্যাশী যুব সমাজের আত্মবিশ্বাস ও আদর্শচেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রতিপন্ন হবে। বিশেষত আধুনিক চেতনায় উদ্দীপ্ত একশ্রেণীর লোক যেখানে ইসলামী বিধানকে একটা অবাস্তব ও দুর্বহ বোঝা বলে ভাবতে এবং এগুলো ছাঁটকাট ও সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াজ নীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, এমন কি এ নিয়ে কাজও শুরু করে

দিয়েছেন, সেখানে এ যুগেরই একজন মনীষীর পূর্ণ জীবনকে যখন তাঁরা চৌদ্দ শ' বছর পূর্বকার সেই সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ও সেই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ দেখতে পাবেন, তখন তাদের ভুল ভাঙবে বলে আশা করা যায়। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে হযরত শায়খুল হাদীসের এ জীবনীগ্রন্থখানা আমাদের জীবনী ও চরিতসাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ পুস্তকরূপে গণ্য হবে আশা করি।

আল্লামা নদভী ও হযরত শায়খুল হাদীস রচনাবলীতে মওকামাফিক চমৎকার উর্দু-ফার্সী কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতার পংক্তিগুলোর অনুবাদ আমি কবিতার ছন্দেই উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি ঃ যাতে করে মূলের মতো এগুলোও পাঠককে কিঞ্চিৎ হলেও আনন্দ দিতে পারে। এ ব্যাপারে আমি কতটুকু সফল হয়েছি তা পাঠকই বলতে পারবেন।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত হযরত শায়খুল হাদীসের খলীফাগণের তালিকা "ছড়িয়ে আছেন সবখানে" আমার নিজস্ব সংযোজন। মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) প্রতিষ্ঠিত উর্দু সাপ্তাহিক "খুদ্দামুদ্দীন" পত্রিকার "শায়খুল হাদীস সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত তালিকাটি একদিকে পুস্তকের সৌষ্ঠব বাড়াবে, তেমনি পাঠকগণের একটা বিরাট কৌতুহল নিবৃত্ত করবে বিবেচনায়ই আমি তা সংযোজিত করেছি।

আল্লাহ্ আমাদের সকলের জন্য গ্রন্থখানাকে উপাদেয় ও হেদায়েতের মাধ্যমরূপে কবূল করে নিন–অনুবাদের সমাপ্তির এই শুভলগ্নে এটাই আমার একান্ত মোনাজাত।

গণভবন মসজিদ — খাকসার

শেরে বাংলা নগর — **আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী**

ঢাকা–১২০৭

১৮ই নভেম্বর, ১৯৮৭ খৃ.*

---

*পুস্তক প্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে (এপ্রিল'২০০০ইং) অনুবাদক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ইমাম ও খতীবরূপে কর্মরত। হযরত শায়খুল হাদীছের খলীফা মাওলানা আবদুল আযীয খুলনবী এবং মাওলানা ইন'আমুল হাসানও এখন মরহুম। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন!

পূর্ব কথা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (র.)-এর জীবনী সংক্রান্ত এই দীন প্রচেষ্টা পাঠকদের খিদমতে পেশ করবার এই শুভলগ্নে মনমগজে দু'টি পরস্পর-বিরোধী প্রতিক্রিয়া ক্রিয়াশীল,

প্রথমত, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবোধের অনুভূতি-এই ভেবে যে একজন সত্যিকারের আল্লাহ্ওয়ালা ও মকবূল বান্দার জীবনবৃত্তান্ত, তাঁর ইল্মী ও দীনী খিদমতসমূহ এবং যাহিরী ও বাতিনী কামালাত সম্পর্কে কিছু লেখার যে সৌভাগ্যটুকু হাসিল হয়েছে, হয়ত বা তাই ইহলোকে ও পরলোকে সৌভাগ্যের উপকরণ হয়ে যেতে পারে।

কবির ভাষায় ঃ

حکایت از قدِ آں یارِ دل نواز کنیم
بایں بہانہ مگر عمر خود را راز کنیم

কেবল ভারতবর্ষই নয়, গোটা বিশ্ব জুড়ে বহু শতাব্দী ধরে ধর্মীয় শিক্ষার যে ব্যবস্থা চালু ছিল, যার গণ্ডী ঘরের চারদেয়ালের সীমা থেকে শুরু করে মাদ্রাসা ও জামেয়াসমূহ, পাঠদানের কক্ষসমূহ, পুস্তকাদি রচনা ও সংকলন, খানকার শান্ত-সৌম্য পরিবেশ এবং আন্দোলন ও সংগ্রামের প্লাটফর্ম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিল নির্ভেজাল লিল্লাহিয়াত, ঈমান ও আত্মনিরীক্ষা, উস্তাদ ও শায়খগণের পূর্ণ আনুগত্য, মুরুব্বীদের প্রতি সমর্পিত মন, জীবনব্রত সম্পর্কে পূর্ণ তাওয়াক্কুল ও তুষ্টি, আল্লাহ্নির্ভরতা তথা ত্যাগ-তিতিক্ষা, কঠোর পরিশ্রম, অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় এবং সাধনায় পূর্ণ মনোনিবেশ, সমকালীনদের সাথে আচার-ব্যবহারে বিনয়, ভিন্নমতপোষণকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের প্রতি সু-ধারণা পোষণ, পরস্পরবিরোধী অবস্থার মধ্যে সমন্বয় করে চলার ক্ষমতা ও যোগ্যতা, ইল্মী কামালাত ও বাতিনী স্তরসমূহ অতিক্রমের জন্য কঠোর সাধনা ও দুর্জয় সাহস,

সহকর্মী ও জীবনসঙ্গীদের ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কেই কেবল চিন্তাভাবনা অথচ নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে নির্লিপ্ততা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার (আমার সীমাবদ্ধ জানাশোনা মতে) সর্বশেষ নমুনা ও সর্বগুণের সমন্বিত প্রতীক ছিলেন হযরত শায়খুল হাদীছ। তাই তাঁর জীবনের কোন একটা অতি আবছা বা হাল্কা ছবি আঁকতে হলেও সে যুগের শিক্ষাদীক্ষার কার্যকর শক্তিসমূহ ও সেগুলোর প্রভাব (যা কুদরতেরই কারিগরীতে হযরত শায়খের বাল্য ও যৌবনে এবং তাঁর পরিবেশ-পরিমণ্ডলে তুঙ্গে ছিল)-এর সুফলেরই চিত্র ও সারনির্যাস পরিবেশন এবং তা এমন একটি যুগের প্রভাব ও সাফল্যের চিত্রাঙ্কনপ্রচেষ্টা--যার সমাপ্তি স্পষ্টতই হযরত শায়খের মৃত্যুতে রচিত হয়েছে। এজন্যে এ বর্তমান যুগের একজন কৃতী পুরুষের জীবনীই নয়, একটি ব্যক্তিত্ববহুল যুগ, একটি মনীষা সৃষ্টিকারী সমাজ, একটি জীবনদায়িনী শিক্ষাব্যবস্থা এবং একটি শ্যামল ফলন্ত মহীরুহের শেষ বসন্তের কাহিনীও বটে। এজন্য জীবনীকারের শ্রম, অধ্যয়নক্ষমতা ও দায়িত্ব কেবল একজন ব্যক্তির জীবনী রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার চাইতে ঢের বেশী ব্যাপক, গভীর ও নাজুক। আর তাই পাঠক সমক্ষে এ পৃষ্ঠাগুলো তুলে ধরতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দুলছি-কি জানি এ গুরুদায়িত্ব আমি সত্যিই পালন করতে পেরেছি কি না।

সাথে সাথে মনে মনে ভাবি এবং ভাবতে গিয়ে হৃদয়ের পুরানো জখম বারবার তাজা হয়ে উঠে যে, এ জীবনী তো প্রিয় ভাগ্নে মৌলবী সায়িদ মুহাম্মদ ছানীরই লেখার কথা ছিল-যিনি হযরত শায়খেরই নির্দেশে হযরত মাওলানা ইউসুফ (র.)-এর সুবিশাল জীবনী গ্রন্থ "সাওয়ানেহ-ই-হযরত মওলানা ইউসুফ কান্দেলভী" শিরোনামে লিখে হযরত শায়খের সন্তুষ্টি, প্রশংসা ও দু'আ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তারপর আবার তাঁরই আদেশে ও বিশেষ তাগিদে তাঁর প্রিয় শায়খ ও মুরুব্বী হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর জীবন-চরিত "হায়াতে খলীল" নামে রচনা করেছিলেন। তারপর তাঁরই ইঙ্গিতে তাঁর কৃতী দৌহিত্র মৌলবী মুহাম্মদ হারূনের জীবনী লিখেন। এ তিনটি[১] গ্রন্থের রচনা ও বিন্যাস হযরত শায়খের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং জীবনী রচনার ব্যাপারে তাঁর দক্ষতার প্রতি হযরত শায়খের গভীর আস্থারই পরিচয়বহ। কেননা, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠ ও তাঁর ভক্ত এমন অনেক লেখক ও আলিম মওজুদ ছিলেন-যাঁরা সফরে ও বাটিতে সর্বদা তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। এতদসত্ত্বেও হযরত শায়খ এমন একটি ব্যাপক ও নাজুক কাজের জন্যে তাঁকেই বেছে নিয়েছিলেন। তারপর হযরত মাওলানা

---

১. প্রথমোক্ত কিতাব ৮০২ পৃষ্ঠা কলেবরের, দ্বিতীয়োক্ত ৬৩৬ পৃষ্ঠার এবং তৃতীয়োক্ত বইটি ১৪২ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

আশিক ইলাহী মিরাটীর মতো হযরত সাহারানপুরীর বিশিষ্ট মুরীদ, খলীফা ও দক্ষ লেখকের রচিত "তাযকিরাতুল খলীলের" বর্তমানে হযরতের জীবনী আগাগোড়া পুনর্বিন্যাস করার নির্দেশ দান এবং এ কাজের পূর্ণ সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান করা তারই প্রমাণ। তারপর তা অক্ষরে অক্ষরে শুনে তিনি তা' অনুমোদন করেন, দু'আ দেন এবং স্বয়ং তাঁর নিজের ব্যাপারে একবার বলেন যে, 'প্রিয়! আমার জীবনীও তুমিই লিখবে।'

কিন্তু কুদরতের ফায়সালা ছিল অন্যরূপ। তাই আপন পীর ও শায়খের ইন্তিকালের তিন মাস পূর্বে তিনি নিজে ইন্তিকাল করেন। আপন শায়খের জীবনী লেখার সুযোগ তাঁর হয়ে উঠেনি সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজ এ গ্রন্থাকারে উপস্থাপিত কর্মটিতে তাঁর ভূমিকা ছিল মৌলিক ও বুনিয়াদী।

ব্যাপারটি একটু খুলেই বলা যাক। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর শায়খের ইঙ্গিত ও আদেশে "ইউসুফ-চরিত" রচনার কাজে ব্রতী হন-যা' হযরত শায়খের আলোচনা ব্যতিরেকে কোনক্রমেই পূর্ণ হবার ছিল না। তখন তাঁর সহজাত বিনয়ধর্মের তাগিদেই তিনি এ প্রসঙ্গটি আমাকেই লিখে দিবার জন্যে অনুরোধ করেন। হযরত শায়খের মতো কৃতী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বুযুর্গের পরিচিতি লিখতে তিনি ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত-বিশেষত তাঁর জীবদ্দশায় এবং যখন তিনি মুর্শিদ হিসাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর এ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও পেরেশানী লক্ষ্য করে এ মুশকিল কাজটি সম্পাদনের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি। এ প্রসঙ্গে "সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্দেলভী" বইয়ের ভূমিকায় যেভাবে সে কথাটি ব্যক্ত করেছিলাম, তা' হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ

> এটা আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমার বুযুর্গ ও সদয় মুরুব্বীগণ আমাকে এতই আপন করে নিয়েছেন যে, নির্দ্বিধায় আমি তাঁদেরকে যে কোনরূপ প্রশ্ন করতে পারি। অনেকবারই আমি তাঁদেরকে তাঁদের কাছে তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছি আর তাঁদের মুরুব্বীসুলভ স্নেহবাৎসল্য আমাকে নিরাশ করেনি। এমনকি হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর জীবনী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছি-অথচ এ ইতিহাস রচনার সাথে তাঁর সমকালীন বুযুর্গানের মধ্যে তাঁর রুচির মিলটি ছিল ন্যূনতম আর তিনি ছিলেন আপাদমস্তক দাওয়াত ও আমল। তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে যে কেবল আমার প্রশ্নগুলোর জবাবই দিলেন, তাই নয়, আমাকে তা' লিপিবদ্ধ করে নেয়ার সুযোগও দিলেন। তাঁর সম্পর্কে এ জানাশোনাই ছিল তাঁর জীবনী রচনার মূলভিত্তি।

আমি পত্র লিখে লিখে হযরত শায়খ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব সংগ্রহ করি। অনেক কথা মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করে তাঁর জবাব লিপিবদ্ধ করি। স্পষ্টত এটা ছিল তাঁর দিক থেকে একটা কষ্টকর সাধনা ও ত্যাগের ব্যাপার। কিন্তু এটাকে আমার সৌভাগ্যই বলুন, আর কর্মকুশলতাই বলুন অথবা তাঁর স্নেহবাৎসল্য ও অনুগ্রহই বলুন, আমি এভাবে অধিকাংশ তত্ত্বই হস্তগত করি। এভাবে সেসব তত্ত্বের সাহায্যেই তাঁর জীবনচরিতের একটা সংক্ষিপ্ত কাঠামো তৈরী হয়ে যায়।[২]

প্রকৃতপক্ষে এ জরুরী কাজটি যদি তখনই আল্লাহ্‌র মর্যীতে সম্পন্ন না হতো, তা'হলে আমার জন্যে এ জীবনী রচনার কাজটা হতো অত্যন্ত দুরূহ। আর যদি তা' সম্পন্ন হতোও, তবে বর্তমান পুস্তকের মতো তা ততোটা নির্ভরযোগ্য হতো না। হযরত শায়খ তাঁর সাত খণ্ডে সমাপ্ত স্বীয় আপবীতি বা আত্মচরিতের স্থানে স্থানে স্বীয় স্বভাবসুলভ বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন, ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনা ও কামালাতের পরিবর্তে সেসব দিককেই বেশী ফুটিয়ে তোলা দরকার যা ধর্মীয় জ্ঞানান্বেষী তালেবে-ইল্‌ম, উলামা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীদের জন্য শিক্ষণীয় ও পয়গামবহ। এতদসত্ত্বেও এ দীন লেখক 'আপবীতি' পূর্ণটাই সম্মুখে রেখে সেই ফাঁকগুলোও পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপবীতির সেসব বর্ণনা এখানে পূর্ণরূপে আত্মস্থ করা হয়েছে এবং এ জীবনীর মৌলিক উপাদান হচ্ছে সেই বিবরণগুলোই।

"সাওয়ানিহে ইউসুফ" থেকে গৃহীত ও উদ্ধৃত সেই প্রবন্ধটি ছাড়াও তাঁর জীবনকাহিনীর প্রধান উৎস হযরত শায়খের আপবীতি, তাঁর উর্দু রচনাবলী এবং হযরত শায়খের বিশিষ্ট মুরীদ ও পরম বিশ্বস্তজনদের লিখিত সফরসমূহের বিবরণ, বিশেষত সেসব হস্তলিখিত উপাদান যা তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড সফরকালে বিশিষ্ট খাদিমগণ ও সফরসঙ্গিগণ কর্তৃক লিখিত হয়। অন্তিম রোগভোগ ও ওফাত সংক্রান্ত বিবরণ লেখার সময়ও লেখকের সম্মুখ রয়েছে সেসব নির্ভরযোগ্য বিবরণ ও পত্রাদি যা মদীনা শরীফ থেকে একান্তই ঘনিষ্ঠ জনদের কাছে লিখিত হয়েছিল। পূর্বপুরুষগণের বংশ বর্ণনার ভিত্তি, এ লেখকেরই লিখিত "মাওলানা ইলিয়াস সাহেব আওর উনকী দীনী দাওয়াত"। কেননা, উক্ত দুই মনীষীর জীবনীর এ অংশটি, দুই-জনেরই একরূপ–দু'জনেই এ অংশের সমান অংশীদার। মাওলানা ইহতেশামুল হাসান কান্দেলভীর কিতাব "হালাতে মাশায়েখে কান্দেলা" ও সম্মুখে ছিল–যা কিছু কিছু ইতিহাস সংক্রান্ত ভুলচুক ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও (যা এ পুস্তকে চিহ্নিত করে দেয়া

---

২. হযরত শায়খের জীবনবৃত্তান্তের এ অংশটি সাওয়ানিহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্দেলভী"-এর ৭৫ থেকে ১৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশিত হয়।

হয়েছে) পূর্বপুরুষগণের বর্ণনার একটা উত্তম উপাদান। এ ব্যাপারে লেখক উক্ত বংশেরই এক যুবক আলিম ও গবেষক মৌলভী নূরুল হাসান রাশেদ সাহেবের সেই প্রবন্ধটি থেকে উপকৃত হয়েছেন-যা' তিনি হযরত শায়খের পূর্বপুরুষগণের সম্পর্ক সম্পর্কে মাসিক "আল-ফুরকানের" বিশেষ সংখ্যার জন্যে লিখেছিলেন এবং অনুগ্রহ করে এ লেখককেও তার একটি অনুলিপি দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি সংক্রান্ত বর্ণনার জন্যে আমি মাওলানা মুহাম্মদ শাহিদ মাযাহেরীর কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার এ সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের জবাব দিয়ে এবং হযরত শায়খের রচনাবলীর বিশাল ভাণ্ডার লেখককে সরবরাহ করেছেন। এ সংক্রান্ত পূর্ণ বর্ণনা তাঁরই স্বহস্ত লিখিত।

এ দীন লেখকের হযরত শায়খের সাথে সম্পর্ক উনিশ শ' চল্লিশ সালের শুরু থেকেই। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ও প্রসন্ন ছিলেন। খাকসারকে লিখিত তাঁর পত্রাবলীতে তিনি তাঁর এ স্নেহবাৎসল্য যেভাবে প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্কে কেবল এ পংক্তিটিই লিখতে পারি ঃ

بهر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر

جو بوقت ناز کی جنبش تیرے ابرو میں تھی

তাঁর কাছে আসা-যাওয়া ও পত্রালাপ চলে সুদীর্ঘ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর ধরে। তাঁর সুদীর্ঘ পত্রসমূহ থেকে নিয়ে চিরকুট পর্যন্ত সবই শতকরা একশ' ভাগ হিফাযত করতে পেরেছি বলা তো মুশকিল তবে তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহবাৎসল্য, মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ, জীবনীসংক্রান্ত তথ্যাদি, সর্বোপরি হৃদয়াবেগ ও তাঁর চিন্তাধারার অভিব্যক্তিসম্বলিত মূল্যবান পত্রাদির সংখ্যা সাড়ে তিন শ'র কম নয়। সেসব মূল্যবান পত্র থেকে এ পুস্তকের নবম অধ্যায় রচনায় যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

সর্বশেষে এটুকু বলে দেয়া জরুরী মনে করছি, এগ্রন্থে সেসব বিশদ বর্ণনা পেশ করা থেকে বিরত রয়েছি-যা' সাধারণত মকবূল বান্দাগণ ও আধ্যাত্মিক জগতের সমুচ্চ পর্যায়ে উন্নীত মহামানবগণের জীবনীর আসল বস্তু বলেই মনে করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাঁদের অলৌকিক কার্যাবলী, কারামত, স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত সুসংবাদসমূহকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হচ্ছে আওলিয়া-মাশায়েখগণের জীবনী রচয়িতাদের অতি পুরাতন অভ্যাস--যাঁর ফলে উক্ত মহাপুরুষগণের মানবীয় মহৎ গুণাবলী, তাঁদের জ্ঞানবত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব, শিক্ষা-শিক্ষকতা, রচনাবলী, সমসাময়িকদের সাথে তাঁদের আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন কার্যকলাপ, তাঁদের

মহানুভবতা, বাস্তবধর্মিতা, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তাঁদের দরদ প্রভৃতি ওসবের নীচে রীতিমত চাপা পড়ে যায়। ফলে তাঁদের যুগের ও পরবর্তীকালের তত্ত্বানুসন্ধানী ও আদর্শপিপাসু পাঠকগণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশ হতে হয়। আমার আশংকা হয়, কিছু পাঠক এতে অতৃপ্তিবোধ করবেন। এ জাতীয় উপাদান সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকগণকে আমরা সেসব পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি পাঠের পরামর্শ দেবো—যা শায়খের জীবদ্দশায় ও ইন্তিকালের পর সেই বিশেষ উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়েছে।[৩] এ গ্রন্থের দ্বারা সেসব পাঠককেও হযরত শায়খের কামালাত, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, আলিম ও লেখক হিসাবে তাঁর উচ্চ মর্যাদা, তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য, লেখকসুলভ ব্যস্ততা, ধর্মীয় তৎপরতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, সমাজ-চিন্তা ও সহমর্মিতা, ধর্মীয় শিক্ষা ও বিশুদ্ধ আকীদা প্রচারের পরম আগ্রহ, মুসলিম জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, আল্লাহ্র ধ্যানে তন্ময়তা, শরীআতের পাবন্দী ও সুন্নাতের দাওয়াত ও তজ্জন্য কঠোর সাধনা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার এবং এ গ্রন্থপাঠে যাতে তাঁদের মধ্যে ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি হয়, নিজেদের ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হতে পারেন, তাঁদের সাহস বৃদ্ধি পায়, অন্তর উদার ও দৃষ্টি প্রসারিত হয়, সময়ের মূল্য ও আয়ুর স্বল্পতা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত হয়, উপাদেয় আমল ও পুণ্য সঞ্চয়ের আগ্রহ-উৎসাহ বৃদ্ধি পায় সে চেষ্টাই করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ পাঠে যদি এ জীবনীগ্রন্থের প্রতিপাদ্য মহাপুরুষ ও জীবনীকারের মধ্যকার বিপুল ব্যবধান দেখে এ মহৎ জীবনালেখ্য লেখার জন্যে এ দীন লেখককে নির্বাচন করার দরুন নির্বাচনকারীদের প্রতি—যাঁদের মধ্যে হযরত শায়খের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী প্রিয় মওলভী তালহা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন—এবং তাঁদের নির্বাচনের বিশুদ্ধতার সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় তবে লেখক উরফীর এ পংক্তিটি পেশ করেই চুপ ঃ

امید هست که بیگا نیگیٔ عرفی را
به دوستیٔ سخنائے بخشیند

২৬ মুহাররম, ১৪০৩ হিঃ
১৩ নভেম্বর, ১৯৮২ইং

আবুল হাসান আলী
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ

---

৩. উদাহরণস্বরূপ সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হুশিয়ারপুরী রচিত মাহবুবুল 'আরিফীন, বাহজাতুল কুলুব প্রভৃতি পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষকতা ও পুস্তকাদি প্রণয়ন

চতুর্থ অধ্যায়

সাহারানপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস ঃ শিক্ষকতা ও গ্রন্থাদি রচনা

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

রোগ শোক ও ওফাত — ১৪৯

নবম অধ্যায়

আল্লাহ্প্রদত্ত কামালাত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী —১৭১

দশম অধ্যায়

রচনাবলী —২১১

একাদশ অধ্যায়

শায়খুল হাদীছের অমিয় বাণী —২২৫

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

বংশবৃত্তান্ত ঃ দাদা মাওলানা ইসমাঈল ও তাঁর সন্তানবর্গ
ঝিন্‌জানা ও কান্দেলার অভিজাতবর্গ

ঝিন্‌জানা ও কান্দেলার এই খান্দান-যাতে হযরত মুফতী ইলাহী বখশ ও তাঁর অধঃস্তন বংশধরগণ (মাওলানা আবুল হাসান, মাওলানা নূরুল হাসান ও মাওলানা মুজাফ্‌ফর হুসায়ন থেকে নিয়ে তাবলীগের বিশ্ব আমীর মাওলানা ইনামুল হাসান পর্যন্ত) এবং হেকীম করীম বখশ ও তাঁর অধঃস্তন বংশধরগণ (মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল ও তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ মাওলানা মুহাম্মদ, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ও শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (র.) ও মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব শামিল রয়েছেন) এ দোআবা অঞ্চলের মশহুর ও সর্বজনবরেণ্য সিদ্দীকী শায়খগণের খান্দান।[১] এ বংশে সর্বদাই অনেক আলিম, কামিল, পীর-মুর্শিদ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। মাওলানা ইহ্‌তেশামুল হাসান সাহেবের "হালাতে মাশায়েখ কান্দেলা" গ্রন্থের পূর্বকথায় এ দীন লেখক এই খান্দানের বিশিষ্ট মর্যাদা ও অনেক কৃতী সন্তানের অধিকারী হওয়া সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, এখানে তা' উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"ভারতবর্ষের যেসব খান্দান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইল্‌ম ও ফযল, প্রতিভা ও মনীষার আকররূপে বিরাজমান রয়েছে সিদ্দীকীদের এ খান্দানও তাঁর অন্যতম-যাঁদের আসল মাতৃভূমি হচ্ছে মুজাফ্‌ফরনগর জেলায় ঝিন্‌জানা এবং দ্বিতীয় মাতৃভূমি উক্ত জেলারই কান্দেলা। এই বংশটি সেইসব সৌভাগ্যবান খান্দানের অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে আল্লাহ্‌ কবুলিয়ত-ধন্য করেছেন। খান্দানটির ভিত্তি এমনি সত্যনিষ্ঠা ও ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এতে পর পর অনেক আলিম-ফাযিল ও কামিল বান্দাগণের জন্ম হয়েছে। উচ্চ প্রতিভা ও দুর্জয় সাহস এঁদের বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং এই দু'টি বৈশিষ্ট্য এই খান্দানকে এমনি মর্যাদা ও অনন্যতা দান করেছে যে, প্রত্যেক যামানায়

এই খান্দানে অনেক কৃতী ও কামিল পুরুষের জন্ম হয়েছে। উঁচু দরের প্রতিভা ও দুর্জয় সাহস এই খান্দানের লোকদের মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপকতা বরং সাগরসম বিস্তৃতি দান করেছে এবং তাঁরা নিজ নিজ যুগে প্রচলিত জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। এজন্যেই তাঁদের মধ্যে উঁচু দরের ফকীহ্ ও মুফতী, মা'কুল ও মান্কূলের উভয়বিধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ আলিম, উঁচুদরের কবি–সাহিত্যিক এবং দক্ষ চিকিৎসকের উদ্ভব হয়েছে।

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (র.) ও তাঁর খান্দানের শিষ্যত্বের বদৌলতে সুন্নতের পায়রবি, আমল ও আকীদার শুদ্ধি ও জ্ঞান বিস্তারের প্রবণতা তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা সোনার উপর সোহাগার কাজ করে এবং তাওহীদ ও সুন্নতের পায়রবির সাথে জিহাদ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা সংযোজিত হয়। হযরত মাওলানা মুজাফ্ফর হুসায়ন কান্দেলভীর অনন্যসাধারণ তাকওয়া–পরহেযগারী এবং তাঁর দুর্জয় সাহস ও অপূর্ব সাধনা পুরুষদের সাথে সাথে খান্দানের নারী মহলেও তাক্ওয়া পরহেযগারী, যিকির ও ইবাদতের মেজাজ সৃষ্টি করে।

উপরন্ত এই খান্দানের লোকদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণপনা কামালিয়ত এবং রূহানিয়ত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক যুগের অনুকরণীয় অনুসরণীয় জ্ঞানীগুণী ও কামেল পুরুষদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন ও তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণে কোনদিন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (র.) ও হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)–এর পরবর্তী যুগে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব সাহারাপুরী (র.), হযরত শাহ্ আবদুর রহীম রায়পুরী (র.) প্রমুখ সমসাময়িক বুযুর্গগণের সাথে এই খান্দানের জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ সর্বদাই সংশ্লিষ্ট রয়েছেন এবং আজো সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। এটা তাঁদের জ্ঞানপিপাসা ও হৃদয়ের মহত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

এই খান্দানের কবুলিয়ত এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহ্র সীমাহীন কৃপাদৃষ্টির জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এই খান্দানের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই জামানায় দাওয়াত ও ইসলাহ্ তথা ইসলাম প্রচার ও নৈতিকতার প্রসারের সেই আযীমুশান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, যার নযীর আজকের মুসলিমবিশ্বে দুর্লভ। বিশ্ববিধৃত তাবলীগী দাওয়াত আন্দোলনের উৎস হচ্ছে এই খান্দানটিই। এই

খান্দানেই জন্মগ্রহণ করেছেন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.)–এর মতো ব্যক্তিত্ব —যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এযুগে মুজাদ্দিদসুলভ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং যাঁর খুলুসিয়ত, দুর্জয় হিম্মত, উদার দৃষ্টি, কঠোর সাধনা ও ত্যাগের সুদূরপ্রসারী ফল ও বরকতসমূহ বিশ্বের এক বিরাট অংশ জুড়ে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব তাঁর প্রসার ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন।[২] তাঁর ইখলাস ও নিষ্ঠা, তাওয়াক্কুল, সংসর্গগুণ, উৎসাহ ও উদ্যম, মুজাহাদা ও সাধনা এক বাস্তব সত্য—যার জন্য কোন দলীল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের সত্তা পূর্বপুরুষগণের এবং তাঁদের কামালতসমূহের জীবন্ত স্মৃতিস্বরূপ এবং তাঁর খান্দানের মনীষিগণের দুর্জয় হিম্মত, মুজাহাদা, বহুমুখী প্রতিভা এবং উন্নত চরিত্রের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। পূর্ববর্তী যামানার বুযুর্গগণের জীবনে অবিশ্বাস্য ধরনের ঘটনাবলীর সত্যতার প্রমাণ তাঁর সত্তাতেই পাওয়া যায়।[৩]

উক্ত খান্দানের বুযুর্গগণের মধ্যে হাকীম মুহাম্মদ আশরাফ সাহেবের জীবনকথা পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের তুলনায় নিকট অতীতের। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতির জন্যও তাঁর জীবনকথা অপেক্ষাকৃত সমুজ্জ্বল ও সুসংরক্ষিত। তাই তাঁর জীবনকথা দিয়েই শুরু করা যাক।

মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফ (র.)

ইনি ছিলেন মুজাফ্ফরনগর জেলাধীন ঝিনজানার অধিবাসী সম্রাট শাহ্জাহানের আমলের একজন খ্যাতনামা বুযুর্গ। তাঁর জ্ঞানগরিমা, তাক্ওয়া–পরহেযগারী ও ধর্মনিষ্ঠার ব্যাপারে সমকালীন উলামা ও মাশায়েখ একমত ছিলেন। তাঁর কুলপঞ্জী শায়খ কুত্ব শাহ্ পর্যন্ত নিম্নরূপ ঃ

মওলভী মুহাম্মদ আশরাফ
ইব্ন শায়খ জামাল মুহাম্মদ শাহ্
ইব্ন শায়খ বাবন শাহ্
ইব্ন শায়খ বাহাউদ্দীন শাহ্
ইব্ন মওলভী শায়খ মুহাম্মদ
ইব্ন শায়খ মুহাম্মদ ফাযিল
ইব্ন শায়খ' কুত্ব শাহ্।[৪]

[আসল লিপি অনুসারে এভাবে লিখিত হলো। নতুবা বংশপঞ্জী লেখার বাংলা রীতি অনুসারে প্রথমে শায়খ কুত্ব শাহ্ সর্বশেষে মওলভী মুহাম্মদ আশরাফের নাম থাকার কথা। আরবী–উর্দু–ফার্সীতে আগে পুত্রের নাম এবং ইব্‌ন বলে পরে পিতার নাম লেখার রেওয়াজ রয়েছে।–অনুবাদক]

মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফের বংশধরদের মধ্যে প্রত্যেক যুগেই বহুসংখ্যক জ্ঞানীগুণী আলিম–উলামা, পীর–দরবেশ, ফকীহ্–মুফতী, মা'কুলাত–মন্‌কুলাতের আলিম, জবরদস্ত কবি ও বিজ্ঞ চিকিৎসকের জন্ম হয়েছে। তাঁর নিজের অবস্থা ছিল একজন উঁচুদরের কামিল ওলীর মতো। তাঁর অনেক অলৌকিক ঘটনার কথাও জানা যায়। সেসব রোমাঞ্চকর ঘটনা তাঁরই বংশের একজন হযরত মুফতী ইলাহী বখশ (র.) তাঁর হস্ত–লিখিত স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। নমুনাস্বরূপ তাঁরই একটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করছি–যাতে তাঁর নির্লোভ ও নির্লিপ্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়;

"সম্রাট শাহ্জাহান যখন মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফের কামালতের খ্যাতি শুন্‌তে পেলেন, তখন তিনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্যে আগ্রহী হলেন এবং তাঁকে নিয়ে আসার জন্যে পাল্‌কী এবং লোকজন পাঠালেন! তিনি অতি ভোরে ফজরের নামায পড়ে কোমরে দোপাট্টা বেঁধে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। দিল্লীর তোরণে বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে লোকজন নিয়োজিত ছিল। তাঁর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পেয়ে তাঁরা অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তিনি তাঁর পূর্ব–পরিচিত ও ভক্ত আমীরের মাধ্যমে বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বাদশাহ্ তাঁর উযীর সা'দুল্লাহ্ খান আল্লামীকে মওলভী সাহেবের পরীক্ষা নিতে বল্‌লেন। বিজ্ঞ উযীর বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন এবং প্রত্যেকটি শাস্ত্রেই তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বাদশাহ্‌র নিকট আরয করলেন ঃ "আমি লক্ষ্য করলাম, যে শায়খ এমনি এক সমুদ্র যার কোন কুল–কিনারা নেই।"

সম্রাট শাহ্জাহান তক্ষুণি ঝিনজানা এলাকার পূর্ণ ২০০০ বিঘা জমির একটি ফরমান তৈরী করিয়ে তাঁর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই বলে তা' প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমার জীবিকাদাতা স্বয়ং আল্লাহ্, বাদশাহ্ নয়, আর ধন–দৌলত বা জমি–জিরাতের লোভ আমার নেই আর না এ উদ্দেশ্যে আমি শাহী দরবারে এসেছি।[৫]

মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফের এক পুত্রের নাম ছিল হাকীম মুহাম্মদ শরীফ। তিনিও জ্ঞান-গরিমা ও ধর্মনিষ্ঠায় ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ শরীফের দুই পুত্র প্রথম মাওলানা হাকীম আবদুল কাদির যাঁর বংশধরদের মধ্যে কামিল-ফাযিল, জ্ঞানীগুণী প্রচুর আলিমের জন্ম হয়েছে। বিশেষতঃ মুফতী ইলাহী বখশ ও তাঁর স্বনামখ্যাত ভাতিজা মাওলানা মুজাফ্ফর হুসায়ন কান্দেলভী ছিলেন তাঁদের সমকালীন আলিম-উলামার মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েয ঝিনজানায়ই বাস করতেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল কান্দেলভী, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া কান্দেলভী ও তাঁর পুত্র শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্দেলভী, দা'ঈ ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্র পথে আহ্বাকারী) মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্দেলভী এবং তাঁর সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফের মতো কামিল বুযুর্গগণের জন্ম হয়েছে।

ঝিনজানা ও কান্দেলার উক্ত দু'টি শাখাই উর্ধ্বদিকে মাওলানা মুহাম্মদ শরীফের মধ্যে একত্রিত হয়েছে। তারপর ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে যুগ যুগ ধরে পল্লবিত ও প্রসারিত হয়েছে। বংশধারার এই ঐক্য ও বিচ্ছিন্নতা স্পষ্টরূপে অনুধাবনের জন্যে এখানে উক্ত উভয় শাখার শাজরা বা কুলপঞ্জী পেশ করা হচ্ছে, যা স্বয়ং হযরত শায়খুল হাদীছ স্বহস্তে প্রণয়ন করেছেন ঃ

বংশপঞ্জী

মওলাবী মোঃ শরীফ
আবদুল কাদির
মৌঃ মুহাম্মদ ফয়েয
কুত্‌বুদ্দীন
মৌঃ মুহাম্মদ সাজিদ
শায়খুল ইসলাম
হাকীম গোলাম মহীউদ্দীন
হাকীম করীম বখশ
মুফতী ইলাহী বখশ
মাহমুদ বখশ
মওলভী আবুল হাসান
মুজাফ্‌ফর হুসায়ন
গোলাম হাসান
গোলাম হুসায়ন
মাওঃ নূরুল হাসান
বিবি আখতুর রহমান
মোঃ মোঃ ইসমাঈল
বিবি সফিয়্যা
মৌঃ মোঃ ইলিয়াস
মৌঃ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া
মৌঃ মুহাম্মদ
মৌঃ মোঃ ইউসুফ
মুহাম্মদ যাকারিয়া
(শায়খুল হাদীছ)
মুহাঃ সুলায়মান
মুহাঃ আকবর
মুহাঃ ইবরাহীম
যিয়াউল হাসান
(মোঃ সাদেক)
আমাতুল করীম
আমেনা
সফিয়্যা
রউফুল হাসান
শামসুল হাসান
মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া
মুহাম্মদ ইলিয়াস
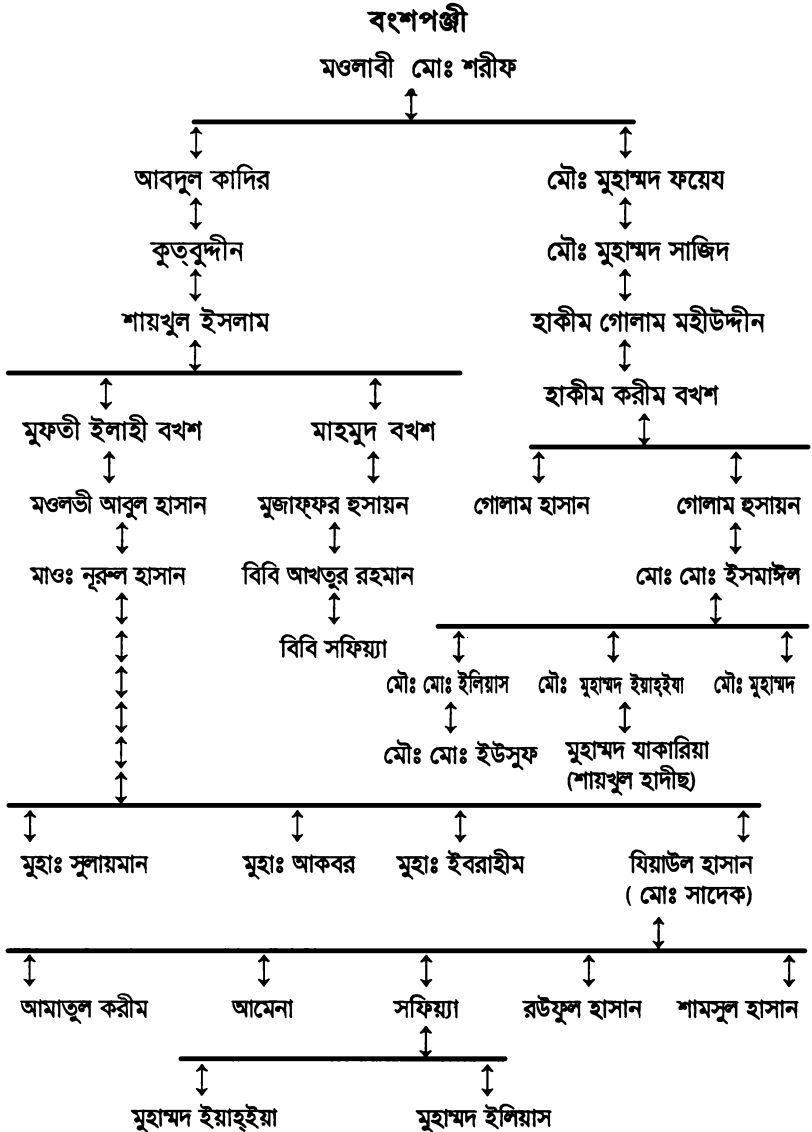
কান্দেলার[৬] সাথে সম্পর্ক

সুলতান আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ (ইব্ন ফিরূয) তুগলকের আমলে নিযুক্ত কান্দেলার কাযী ও খতীব কাযী শায়খ মুহাম্মদের বংশধরদের মধ্যে তাঁরই নামের এক জাদরেল আলিম শায়খ মুহাম্মদ মুদার্‌রিস ছিলেন একজন বিখ্যাত মুদার্‌রিস ও বুযুর্গ ব্যক্তি। তাঁরই কন্যা খান বিবির সাথে ঝিনজানার পূর্বোক্ত পরিবারের মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ শরীফের পুত্র এবং হাকীম মুহাম্মদ আশরাফের পৌত্র মাওলানা হাকীম আবদুল কাদিরের বিয়ে হয়। তাঁদের ঘরে দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাঁরা হচ্ছেন মাওলানা হাকীম কুত্‌বুদ্দীন ও মাওলানা হাকীম শারফুদ্দীন।

মাওলানা হাকীম কুত্‌বুদ্দীন ঝিনজানার অভিজাত শ্রেণীর একজন হিসাবে গণ্য হতেন। সমগ্র এলাকায় তাঁর বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। দীনী বুযুর্গীর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াবী মর্যাদাও দান করেছিলেন। তাঁর বিবাহও কান্দেলার ঠিক সেই পরিবারটিতে হয়, যে পরিবারে তাঁর পিতা মাওলানা হাকীম আবদুল কাদিরের বিবাহ হয়েছিল। তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ মুদার্‌রিসের পুত্র শায়খ যিয়াউল হকের কন্যা। তাঁদের ঘরে তিনজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

১. মাওলানা হাকীম শায়খুল ইসলাম

২. শায়খ মুহাম্মদ মাশায়েখ

৩. শায়খ সদরুদ্দীন

শেষোক্ত দুই জনই ঝিনজানায়ই বসবাস করতেন।

মাওলানা শায়খুল ইসলাম

মাওলানা শায়খুল ইসলাম ছিলেন জ্ঞানে গরিমায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বড় বড় আলিমও তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

মাওলানা শায়খুল ইসলামের ছিলেন চার পুত্র ঃ

১. মুফতী ইলাহী বখশ

২. শাহ্ কামালুদ্দীন

৩. মাওলানা ইমামুদ্দীন

৪. মওলভী মাহমুদ বখশ

জ্ঞান-গরিমায় তাঁরা চারজনই বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী এবং জনগণের আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

মওলভী ইমামুদ্দীন মুফতী ইলাহী বখশ থেকে বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন। মেধা ও মনীষা এবং জ্ঞান-গরিমায় তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। "মীর যাহেদ", "মোল্লা জালাল"-এর শরাহ, "হাঁশিয়া উমুরে আম্মা" "রিসালা নসবে আবরা'আ", "মুখতাসার কাফিয়া" এবং মানতিক ও দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থের হাশিয়া তিনি লিখে গেছেন। তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলেন মাওলানা হাকীম আশরাফ। ইনি পরবর্তীকালে মুফতী এলাহী বখশের জামাতা হন। জ্ঞানান্বেষণে সে যুগে তাঁর জুড়ি ছিল না। নাড়ী জ্ঞানেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর পুত্র মওলভী হাবীব মুহাম্মদ মুশাররফও তাঁর সমকালীন চিকিৎসকদের মধ্যে অত্যন্ত মশহুর ছিলেন।

মাওলানা শায়খুল ইসলামের দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা কামালুদ্দীন রিয়াযত ও মুজাহাদা তথা তাসাউফ চর্চায় অভ্যস্ত ছিলেন। তাক্ওয়া পরহেযগারীতেও তিনি ছিলেন অনন্য। মুফতী ইলাহী বখশ তাঁর জীবনের একটি ঘটনা লিখেছেন এভাবে ঃ

"তিনি ভীষণ শীতের রাতে মধ্যরাত্রিতে উঠে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে উযূ করে তাহাজ্জুদের নামাযে লিপ্ত হতেন। একদিন আমি তাঁকে বললাম, এমন শীতের রাতে ঘুম থেকে উঠা আবার শীতল পানিতে উযূ করা কতই না কষ্টকর ব্যাপার। কি করে দৈনিকই আপনি এই কষ্টসাধ্য কাজটি করেন? তখন তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক দিন উযূ সারতেই মনের মধ্যে শয়তানী ও নফসানী ওয়াসওয়াসার উদ্রেক হয় আর মনে মনে বলি, আগামীকাল আর এত শীতের মধ্যে উঠবো না, নফলের জন্যে এত কষ্ট করে কাজ নেই, কিন্তু যখন পরের রাত আসে এবং যাঁতাকলে আটা পেষণকারিণী মহিলাদের কোলাহল কানে আসে, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারি না। মনে মনে বলি, সুবাহানাল্লাহ্! ও বেচারীরা নিজেদের জীবিকার জন্যে এই মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত ভারী যাঁতাকল হাতে ঠেলে ঠেলে ঘুরাতে থাকবে আর আমি (যার জীবিকা প্রদানের ভার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে নিয়ে রেখেছেন এজন্যে আমাকে কোন কষ্টই করতে হয় না) থাক্বো আরামের বিছানায় শুয়ে, আমার রিযিকদাতা প্রভুর শোকর আদায় করবো না, তা' কেমন করে হতে পারে?

তাঁর জবাব শুনে আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, জাগ্রত হৃদয় লোকই বটে![৭]

এছাড়া তিনি দানশীলতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, চরিত্রবল, সেবাপরায়ণতা, অতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। গান-বাদ্য ও আমোদ-স্ফূর্তির অনুষ্ঠানাদি আজীবন পরিহার করে চলেছেন।

মুফতী ইলাহী বখশ

মাওলানা হাকীম শায়খুল ইসলামের এই খ্যাতনামা পুত্র সর্বজনমান্য বুযুর্গ আলিম ছিলেন। ১১৬২ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৫ হিজরীতে ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি শাহ্ আবদুল আযীয দেহ্লবীর অন্যতম শিষ্য ছিলেন, তিনি ফাতাওয়া, শিক্ষাদান ও গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ধর্মীয় ও সাধারণ উভয়বিধ জ্ঞানে তিনি অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। আরবী–ফার্সী–উর্দুতে কবিতা রচনায়ও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। তাঁর "শরহে বানাত সু'আদ" এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এতে তিনি সাহাবী হযরত কা'আব (রা.)–এর প্রতিটি আরবী পংক্তির পদ্যানুবাদ আরবী–ফার্সী ও উর্দু তিন ভাষায়ই করেছেন। উক্ত তিন ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ষাট। তার মধ্যে শিয়মুল হাবীব (شيم الحبيب) এবং "মসনবী রূমীর উপসংহার" সর্বাধিক বিখ্যাত।

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও তাঁর আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক

মুফতী সাহেব তাঁর বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত করেই হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (র.)–এর হাতে বয়আত হন। সায়্যিদ সাহেবের শুভাগমনে[৮] নিজ বার্ধক্য[৯] এবং সায়্যিদ সাহেব থেকে ৩৮/৩৯ বছর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হন এর অত্যন্ত ইখলাস ও আন্তরিকতাসহ নিঃসংকোচে তার নিকট থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েয আহরণে যত্নবান হন।[১০] হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা তাঁর নিজ মুখেই শুনুন ঃ

> "গায়েবী মদদ ও ললাট–নির্ধারিত সৌভাগ্যের বদৌলতে সায়্যিদ আহমদ হাসানী (যিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের সত্যিকারের অনুসারী এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে অত্যন্ত দৃঢ়পদ)–এর কামালাত ও এবং অন্যদেরকে কামালতির সুউচ্চ স্তরে উন্নীত করার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার খ্যাতি, তাঁর বাণী ও তাৎক্ষণিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার কথা অকস্মাৎ আমার কর্ণগোচর হলো এবং সাথে সাথে তা' হৃদয়মন জয় করে ফেললো। সেই ওলীকুল শিরোমণির সাক্ষাত ও সাহচর্য লাভের নেশায় এমনি মত্ত হয়ে উঠলাম যে, ধৈর্যের বাঁধ একেবারে টুটে গেল।"

সাথে সাথে তিনি হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের প্রশংসাসূচক অনেক কবিতা

রচনা করেন। দু'টি গজলের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ

یا رب احوال دل خستہ ندانم چہ شود * میر احمد نرسد گر بمددگاری ما

اے نشاط ار چہ ضعیفی طلب ہمت کن * ازو سید برحق کہ کند یاری ما

—o—

جناب سید احمد کہ باشد فیض ربانی * بساں مہر انواری کند ہر ذرہ نورانی

مجدد الف ثانی شد جناب احمد اول * مجدد ساسہ ثالث را جناب احمد ثانی

بخلق احمدی کامل بنور ایزدی واصل * نمود اندر رضائے حق رضائے خویش را فانی

মুফতী সাহেব সায়্যিদ সাহেবের যিকির-আযকারের পদ্ধতি সংক্রান্ত একখানা পুস্তকও রচনা করেন, পুস্তকটির নাম "মুলহিমাতে আহমদীয়া"—যাকে "সিরাতুল মুস্তাকীম"-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলাই সঠিক হবে।[১১]

মুফতী ইলাহী বখশের পুত্রদ্বয় মাওলানা আবদুল হাসান ও মাওলানা আবুল কাসিম সায়্যিদ সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁরা তার অত্যন্ত ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন। মাওলানা আবুল হাসান সাহেব হযরত সায়্যিদ সাহেবের এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, সায়্যিদ সাহেবের হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে এমনি একটি কসীদা রচনা করেন যার প্রতিটি অক্ষর প্রেম-প্রীতি অনুরাগে সিক্ত।[১২] সেই সুদীর্ঘ কাসীদার কয়েকটি পংক্তি নমুনা- স্বরূপ উদ্ধৃত করছি। কাফেলাওয়ালাদের (সায়্যিদ সাহেবের জামাআতের) দীনী ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেন ঃ

جس طرف دیکھئے تعمیر مساجد ہے لگی * ہر ایك شخص کی تحقیق مسائل پہ نظر

آتی ہرسمت سے ہے بانگ موذن کی صدا * جس کو سنئے یہی کہتا ہے اللہ اکبر

اس قدر عصر میں تیرے ہوئی افراط نماز * لاکھوں تیار ہوئے ملك میں پھوٹے منبر

قطع بدعات ہوئی فیض سے تیرے ایسی * ہند سے رسمیں بری اٹھ گئی ساری یکسر

دیکھئے جس کو سو کرتا ہے کلام اللہ یاد * باندھی ہرشخص نے تہذیب وہدایت پہ کمر

যেদিকে তাকাই চোখে পড়ে শুধু মসজিদ নির্মাণ,
প্রতিটি ব্যক্তি ঢুঁড়িতেছে শুধু মাসআলার সমাধান
চারদিক থেকে ভেসে আসে কানে মুয়াজ্জিনের স্বর,
সকলেই যেন ধ্বনিছে সতত আল্লাহু আকবর!

তোমার যুগেতে চর্চা বেড়েছে নামাযের বিস্তর,
রাতারাতি দেশে উঠেছে গড়িয়া লাখ লাখ মিম্বর।
তোমারই পরশে দূর হলো যত সমাজের বিদআত,
কুসংস্কার ও কুপ্রথা যত হলো তার উৎখাত।
যে দিকে তাকাই চোখে পড়ে শুধু কুরআন পাঠেতে মন,
হিদায়েত আর সভ্যতা লাগি সবাই করেছে পণ।

মুফতী সাহেবের দুই দৌহিত্র–মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা ঝিনজানভী এবং মাওলানা মুহাম্মদ সাবের ঝানজানী যাঁরা তাঁর শাগরেদ এবং তাঁরই হাতে গড়া ছিলেন–সায়্যিদ সাহেবের কেবল অনুরক্তই ছিলেন না, রীতিমত তাঁর সাথে জিহা-দেও গমন করেন। মাওলানা মুস্তাফা তো জিহাদে শাহাদাতই বরণ করেন।[১৩] মাওলানা সাবির প্রাণে রক্ষা পেয়ে ফিরে আসেন এবং আজীবন সে সাধনায়ই জীবন অতিবাহিত করেন। মাওলানা হায়রতের ভাষায় ঃ

همه عمر در سربراهی و امداد واعانت قافله میر سید احمد شهید مرحوم گزر انید

"সারা জীবন তিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদ মরহুমের কাফেলার নেতৃত্ব ও তার সাহায্য সহযোগিতায় অতিবাহিত করেন।" (সফিনায়ে রহমানী)

এরই প্রভাবে কান্দেলা ও ঝিনজানার গোটা খানদান হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ এবং জিহাদী আন্দোলনের নামে পাগলপারা ছিল। উক্ত খান্দানের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই এ আন্দোলনের এবং সায়্যিদ আহমদ শহীদের আলোচনা শুনা যেতো।

মাওলানা মুহাম্মদ সাজিদ ঝিনজানভী

মাওলানা মুহাম্মদ শরীফের বংশধরদের অপর শাখাটি মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েযের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে–যাঁর সন্তান ছিলেন মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ সাজিদ ঝিনজানভী। তিনি ১১২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত জাঁদরেল আলিম, উঁচুদরের গুণী এবং প্রোথিতযশা চিকিৎসাবিশারদ ছিলেন। মুফতী ইলাহী বখশ কান্দেলভী তাঁর অনেক ফাতাওয়াই উদ্ধৃত করেছেন। সম্রাট শাহজাহান যে দুই হাজার বিঘা নিষ্কর জমির ফরমান তাঁর পূর্বপুরুষ মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরফের নামে জারী করেছিলেন—যা' গ্রহণে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাই পুনর্বার হাকীম মুহাম্মদ সাজিদকে প্রদান করা হয়- যা' তিনি গ্রহণও করেন।[১৪]

এভাবে তিনি দীনী কামালতের সাথে সাথে পার্থিব মর্যাদা ও আভিজাত্যেরও অধিকারী হন। তিনি "আজায়েবুল গারায়েব" নামক একখানা গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি কবিতাও রচনা করতে পারতেন। তাঁর হাকীম গোলাম মহীউদ্দীন নামক একটি পুত্র সন্তানও ছিল। তাঁরও একজন সন্তান ছিলেন হাকীম করীম বখশ। হাকীম করীম বখশের দু'জন সন্তান ছিলেনঃ (১) শায়খ গোলাম হাসান (২) শায়খ গোলাম হুসায়ন।

মাওলানা মুহাম্মদ সাবের ও মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা শহীদ ও তাঁদের বংশধরগণ

শায়খ গোলাম হাসানের বিয়ে হয় হযরত মুফতী ইলাহী বখশের কন্যার সাথে। তাঁদের ঘরে দুই সন্তানের জন্ম হয়ঃ (১) মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ সাবের ও (২) মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ মুস্তফা শহীদ।

মাওলানা সাবের ছিলেন অত্যন্ত সুফী প্রকৃতির দরবেশসুলভ চরিত্রের সংসারের প্রতি নিরাসক্ত এক আবিদ বুযুর্গ। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে জিহাদে শরীক হন এবং যুদ্ধ শেষে ফেরত এসে সারা জীবন এ কাফেলাকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে অতিবাহিত করেন। তাঁর একটি মাত্র সন্তান ছিল হাফিজ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্। তাক্ওয়া–পরহেযগারীতে তিনি ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। অন্তরে ছিল জিহাদের জোশ। শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। সর্বদাই তাঁর মুখে একটি বাক্য শোনা যেতোঃ "কেউ আমাকে একটি বন্দুক দাও, আমি জিহাদে যাচ্ছি।"[১৫]

তাঁর ছিলেন দুই সন্তান ঃ (১) হাফিজ মুহাম্মদ ইউসুফ ও (২) হাফিজ মুহাম্মদ ইউনুস। এঁদের দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও সাধু সজ্জন। "হালাতে মাশায়েখে কান্দেলায়" তাঁদের বিবরণ রয়েছে এভাবে ঃ

> "এদের দু'জনেরই প্রথম জীবন চাকুরী ব্যপদেশে বাইরে কাটে। কিন্তু শেষ জীবনে এঁরা ছিলেন কান্দেলার ভূষণ এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রকৃষ্ট নমুনা। জ্যোতির্ময় চেহারা, ঈমানী কথাবার্তা, ইসলামী আচার আচরণ ও বেশ ভূষা, বন্ধুবাৎসল্য, মিশুক স্বভাব, সকলের ব্যথায় ব্যথী, সকলের মঙ্গলকামী, সকলের প্রতি সহমর্মিতা ছিল তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। উভয়েই মুত্তাকী পরহেযগার তাহাজ্জুদগোজার বুযুর্গ ছিলেন।[১৬]

হাফিয মুহাম্মদ ইউসুফের প্রথম বিবির গর্ভে তিন কন্যার জন্ম হয়। এঁদের প্রথম দু'জনের পরপর মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্দেলভীর সাথে বিয়ে হয়। ঐ দ্বিতীয় বিবির গর্ভেই শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের জন্ম হয়।[১৭]

দাদা মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল ও তাঁর পুত্রগণ

হযরত শায়খুল হাদীছের দাদা মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (ইব্‌ন মাওলানা গোলাম হুসায়ন সাহেব) দিল্লীর বাইরে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মাযারের নিকটে "চৌষট্টি খাম্বা" নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রাসাদের লোহিত ফটকের একটি ইমারতে বসবাস করতেন।

তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল মুজাফ্ফার নগর জিলার ঝিনজানায়–যা' পূর্বেই উক্ত হয়েছে। প্রথম স্ত্রীর ইন্তিকালের পর তিনি মুফতী ইলাহী বখশ কান্দেলভীর খান্দানে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এজন্যে সর্বদা তাঁর কান্দেলায় আসা যাওয়া ছিল। এ নিয়মিত যাতায়াতে কান্দেলাও তাঁর নিজবাড়ির মত হয়ে যায়।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বাহাদুর শাহ্র ভায়রাভাই মীর্যা ইলাহী বখশের (মীর্যা হিদায়েত আফযা বাহাদুরের) ছেলেমেয়েদের শিক্ষকতা করতেন। ফটকের উপরের ফ্লাটে তিনি থাকতেন। পাশেই একটা ছোট মসজিদ ছিল। তার পাশেই ছিল মীর্যা ইলাহী বখশের বৈঠকখানা। এজন্যে এ মসজিদকে বলা হতো বাংলাওয়ালী মসজিদ। মাওলানা তাঁর জীবন কাটালেন এমনি নির্জনতা ও লোকচক্ষুর অন্তরালে ইবাদত–বন্দেগীর মধ্যে। স্বয়ং মীর্যা ইলাহী বখশও ঘূণাক্ষরেও তাঁর প্রকৃত অবস্থা জানতেন না, তিনি জানলেন তখন যখন স্বচক্ষে তাঁর দু'আ কবুল হওয়ার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করলেন।

যিকির ও ইবাদত, আগন্তুকদের সেবাযত্ন, মুসাফিরদের আতিথেয়তা, কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় শিক্ষাদান এই ছিল তাঁর দিবারাত্রির ব্যস্ততা। সেবাপরায়ণতা ও বিনয়ের অবস্থা ছিল এই যে, কোন ক্লান্ত–শ্রান্ত মুটে–মজুর হাঁফাতে হাঁফাতে আস্‌তে দেখলে নিজহাতে তাঁর বোঝা নামিয়ে নিজে বালতি দিয়ে পানি উঠিয়ে হাত মুখ ধু'তে ও পানি পান করতে দিতেন। তারপর উযূ করে দু'রাকআত শোকরানা নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতেন, প্রভো! তুমিই আমাকে তোমার বান্দার এ খেদমতটুকু করার তওফিক দান করেছ, নতুবা আমি তো তার যোগ্য ছিলাম না। লোকের ভিড়ের দিনসমূহে পানি ও লোটার ব্যবস্থার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল

রাখতেন যেন লোকের কষ্ট না হয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের জন্যে তিনি এভাবে মানুষের সেবাযত্নে সর্বদা লেগে থাকতেন।[১৮]

মাওলানা সবসময় যিকিরের সাথে থাকতেন। বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় যেসব দু'আ পড়বার কথা হাদীছে বিবৃত আছে তিনি সেগুলোর উপর সর্বদা আমল করতেন। এভাবে তিনি 'ইহ্সানের' দর্জায় উন্নীত ছিলেন।[১৯]

একবার তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট সুলুকের তরীকা হাসিল করার আগ্রহ প্রকাশ করলে মাওলানা বলেছিলেন ঃ আপনার এর প্রয়োজন নেই। এই তরীকা ও তার যিকির–আযকারের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ফল আপনি এমনিতেই পাচ্ছেন; এর উদাহরণ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদ পড়া সমাপ্ত করে বলে যে, আমি তো কায়েদা--বোগদাদী পড়ি নাই, তাও পড়ে নিই।"[২০]

কুরআন তিলাওত ও জপ করা মওলানার অতি প্রিয় অভ্যাস ছিল। তাঁর পুরানা আকাঙ্ক্ষা ছিল ছাগল–ভেড়া চরাতে চরাতে কুরআন তিলাওত করবেন। রাত্রে পরিবারের কাউকে না কাউকে অবশ্যই জাগ্রত ইবাদত রত রাখবার ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখতেন। ১২টা ১টা পর্যন্ত মেজো সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব অধ্যয়নরত থাকতেন। এ সময় মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব জেগে উঠতেন এবং মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব শুয়ে পড়তেন। রাত্রের শেষের প্রহরে বড় সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদ সাহেবকে জাগিয়ে দিতেন।[২১]

তিনি এতই নির্ঝন্ঝাট চরিত্রের লোক ছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে কারো কোনরূপ অভিযোগ ছিল না। তাঁর আল্লাহ্গতপ্রাণ ও নিঃস্বার্থতা এতই সুস্পষ্ট ছিল যে, দিল্লীর সেকালের পরস্পরবিরোধী ও বিদ্বেষরত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক—যারা একে অপরের পিছনে নামায পড়াকেও দুরস্ত মনে করতো না—তাদের নেতারাও তাঁর প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।২১

মেওয়াতের সাথে সম্পর্কও তাঁরই জীবদ্দশায় শুরু হয়। সে ইতিহাস এরূপ ঃ একবার তিনি অধীর প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলেন যে, কোন মুসলমান পথচারী পেলে তাকে মসজিদে নিয়ে এসে তার সাথে জামাআতে নামায আদায় করবেন। এমন সময় কয়েকজন মুসলমানকে দেখতে পেয়ে তিনি তাদের গন্তব্যস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললো, আমরা মজুরীর সন্ধানে চলেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মজুরীর হার কি? তারা তা' বললে তিনি আবার বললেন, এ পরিমাণ মজুরী যদি এখানে মসজিদে বসে বসেই লাভ করা যায়, তবে

তাতে আপত্তি আছে? তারা বললো, বাহ্ ঃ রে! তাতে আবার আপত্তি কিসের? আর যায় কোথায়? মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে তিনি তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসলেন এবং নামায শিক্ষা ও কুরআন শিক্ষায় লাগিয়ে দিলেন। দিনের শেষে দৈনিক মজুরী তিনি তাদেরকে পরিশোধ করে দিলেন। এভাবে অনেক দিন চললো। তারা দিনভর পড়ে, দিনের শেষে মজুরী নিয়ে ঘরে ফিরে। কিছু দিন এভাবে চলতে চলতে তারা নামাযে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো এবং মজুরী ছুটে গেল। এভাবেই বাংলাওয়ালী মসজিদের মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হলো। আর সেসব মজুররাই ছিল তার আদি তালেবে-ইলম। তারপর ১০/১২ জন মেওয়াতী ছাত্র সর্বদাই মাদ্রাসায় অবস্থান করতো। তাদের খাবার আসতো মীর্যা ইলাহী বখশের বাড়ি থেকে।[২২]

৪ঠা শাওয়াল, ১৩১৫ হিজরী (মুতাবেক ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮খ্রীঃ) তারিখে মাওলানা ইসমাঈল সাহেব ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ غُفرلہ[২৩] শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তিনি দিল্লী শহরের বাহ্‌রাম তে-রাস্তার খেজুর ওয়ালী মসজিদে ইন্তিকাল করেন। তিনি যে কতটুকু জনপ্রিয় ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন তার প্রমাণ মিলে তাঁর শবাধারের সাথে অনুগমনকারীদের ভিড় থেকে। তাঁর শবাধারের দুই দিকে দীর্ঘ বাঁট লাগিয়ে দেয়া সত্ত্বেও দিল্লী যেতে নিযামুদ্দীন পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে তিন মাইল রাস্তা অতিক্রমকালে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই শবাধারে কাঁধ দেবার সুযোগ পাননি।

তাঁর জানাজায় বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের প্রচুর সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাসের লোকের এরূপ একত্র সমাবেশের ঘটনা খুবই বিরল ব্যাপার ছিল। মাওলানার মেজো সাহেবজাদা মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া সাহেব বল্‌তেন, আমার বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব যেহেতু অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্রমেজাজ বুযুর্গ ছিলেন, তাই আমার মনে তখন আশঙ্কা হচ্ছিল যে, তিনি কাকে না কাকে আবার জানাযার ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে দেন আর তাঁর বিরোধী মতের লোকেরা তাঁর পিছনে নামায পড়বে না বলে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়ে যায়। তাই আমি আগে ভাগেই বলে ফেললাম, জানাযার ইমামতি আমি করবো। সকলেই নিঃসঙ্কোচে আমার পিছনে জানাযা আদায় করলেন। এভাবে ভালোয় ভালোয় একটা ফাঁড়া কেটে গেল। কোন মতবিরোধের অবকাশ রইলো না।[২৪]

জানাযায় এত ভিড় ছিল যে, বেশ কয়েকবার জানাযা পড়া হলো। ফলে দাফনে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়। এমন সময় জনৈক সাহেবে-কাশফ বুযুর্গ দেখতে পান যে,

মাওলানা ইসমাঈল সাহেব বলছেন ঃ আমাকে শীগগীর বিদায় করো। আমি অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করছি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাগণসহ আমার জন্য প্রতীক্ষারত রয়েছেন।[২৫]

মাওলানার পুত্রগণ

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের তিন পুত্র ছিলেন। প্রথম বিবির গর্ভে মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ এবং পিতার স্থলাভিষিক্ত। দ্বিতীয় বিবি–যিনি মাওলানা মুজাফফর হুসায়ন সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন এবং প্রথম বিবির ইন্তিকালের পর তাঁকে তিনি বিবাহ করেছিলেন–তাঁর গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হয় (১) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব ও (২) মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহিম।

মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব

মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব ছিলেন একজন ফেরেশতা চরিত্রের লোক–সহিষ্ণুতা, বিনয়, দয়াপরায়ণতা, আল্লাহ্ভীতি ও তন্ময়তার বাস্তব প্রতিমূর্তি। কুরআনের আয়াত عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا এর বাস্তব নমুনা। স্বল্পভাষী, নিরীহ, নির্জনতাপ্রিয় এবং নিজের কাজে ও সাধনায় ব্যস্ত পুরুষ ছিলেন তিনি। তিনি আল্লাহ্–নির্ভর ও নির্লিপ্ত জীবন যাপন করতেন। নিযামুদ্দীনের বাংলাওয়ালী মসজিদে তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাথমিক মাদ্রাসা সেখানে ছিল–যেখানে প্রধানতঃ মেওয়াত এলাকার ছেলেরাই পড়তো। তাওয়াক্কুল ও স্বল্পেতুষ্টির ভিত্তিতে মাদ্রাসাটি চলতো। দিল্লী ও মেওয়াত এলাকায় তাঁর অনেক ভক্ত ছিলেন। উভয় স্থানের লোকেরাই তাঁর ফয়েয লাভে ধন্য হয়েছেন।[২৬ ও ২৭] মাওলানা মুহাম্মদ সাহেবের চেহারায় তাক্ওয়ার শিক্ষা পাওয়া যেতো।তাঁর চেহারায় জ্যোতির প্রাচুর্য ছিল। প্রায় সময়ই ওয়ায–নসীহত করতেন, কিন্তু বসা অবস্থায়–অনেকটা ঘরোয়া আলাপের মতো করে। বিরামহীন ওয়ায তিনি করতেন না; বরং চারিত্রিক শিক্ষা ও দুনিয়া সম্পর্কে নির্লিপ্ততা সংক্রান্ত হাদীছ শুনাতেন এবং তার সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন।

এক সময় তাঁর চোখের ধারে ফোঁড়া হয়েছিল–যাতে একে একে সাতটি মুখ দেখা দেয়। চিকিৎসকগণ ক্লোরফর্ম নেওয়া অপরিহার্য বলে জানালেন, কিন্তু তিনি

কোনমতেই সম্মত হলেন না বরং চুপ করে শুয়ে রইলেন। চিকিৎসকগণ অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাঁরা জানান যে, এরূপ সহনশীল রোগী তাঁরা জীবনেও দেখেননি।

মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব যিকির–আযকার ও ইবাদত–বন্দেগীতে সময়ের সদা সদ্ব্যবহারকারী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হাদীছ পড়েন মাওলানা গাঙ্গুহীর কাছে। জীব–নের অন্তিম ষোল বছরের মধ্যে কোনদিনই তাঁর তাহাজ্জুদ বাদ যায়নি। জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত জামাআতেই নামায আদায় করেন। 'ইশার নামাযের পর বিতরে সিজদাররত অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব (র.)

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের কনিষ্ঠপুত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের জীবনকাহিনীও এবং তাঁর কামালাতের ও দাওয়াতের বর্ণনা এই পুস্তকের ছোট কলেবরে সম্ভবপর নয়। কবির ভাষায় ঃ

سفینہ چاہئے اس بحر بیکراں کے لئے

এ অকূল পাথারেতে চাই যে জাহাজ
ভেলায় কি হয় সেই কাজ?

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে এ দীন লেখকের স্বতন্ত্র পুস্তক "হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র) আওর উন্ কি দ্বীনী দাওয়াত' পাঠে পাঠক উপকৃত হবেন।

হযরত শায়খের পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব

ইনি ছিলেন মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের মেজো পুত্র। তাঁর মা বিবি সফিয়্যা[২৮] ছিলেন মাওলানা মুজাফফর হুসায়ন কান্দেলভীর দৌহিত্রী এবং বিবি আমাতুর রহমানের[২৯] কন্যা। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারিণী, ইবাদতগোজার এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত মনের অধিকারিণী ছিলেন এই পুণ্যাত্মা মহিলা। সর্বদা যিকির আযকারেই তাঁর সময় কাটতো। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব ১লা মুহার্‌রম ১২৮৮ হিঃ (মুতাবিক ২৩ শে মার্চ ১৮৭১ ইং) রোজ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। স্বভাবজাতভাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও রসিকমনা ছিলেন। সাত বছর বয়সে কুরআন শরীফ হিফ্য সমাপ্ত করেন। তারপর পিতা বলতেন, 'দৈনিক এক খতম পড়, তারপর সারাদিন ছুটি।" মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব বলতেনঃ আমি ফজরের নামায পড়েই নানীর ছাদে গিয়ে উঠতাম এবং খতম না করা পর্যন্ত রুটিও

খেতাম না। কুরআন শরীফ খতম করে তারপরও তিনি বিশ্রাম নিতেন না বরং জ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক তাঁকে অন্যান্য কিতাব পাঠে উদ্বুদ্ধ করতো এবং উৎসাহ্ উদ্দীপনা ভরে তিনি পুস্তকাদি পাঠ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি বলতেন ঃ

"সাধারণতঃ যুহরের আগেই আমি কুরআন শরীফ খতম করে ফেলতাম। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে ছুটির সময় নিজের উৎসাহেই ফার্সী পড়তাম।"

তাঁর পিতা মাওলানা ইসমাঈল সাহেব যেহেতু নিশি জাগরণকারী ও সর্বদা তাহাজ্জুদগোযার বুযুর্গ ছিলেন, এজন্য তাঁকে এবং তাঁর অগ্রজ মাওলানা মুহাম্মদ সাহেবকে শেষরাত্রিতে অতি ভোরেই উঠিয়ে দিতেন-যেন শুরু থেকেই অভ্যাস গড়ে উঠে। মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব তো উঠে দীর্ঘ নফল নামায পড়তেন, কিন্তু মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব সংক্ষেপে নফল পড়ে কিতাব পাঠে মনোযোগ দিতেন। কেননা, তাঁর ঝোঁক এদিকেই বেশি ছিল।

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব নিজে বলতেন, আব্বাজানের উযূর দু'আ-দুরূদের খুব খেয়াল থাকতো এবং আমাদেরকেও এব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবার তাগিদ দিতেন। কিন্তু আমার ধ্যান থাকতো জ্ঞানান্বেষণের, তাই উযূর সময়ও আরবী-ফার্সী অভিধান মুখস্থ করতাম। আব্বাজান আমার অভিধান জপের শব্দ শুনে ভর্ৎসনার সুরে বলতেন ঃ "খুব তো উযূর দু'আ পড়া হচ্ছে ঃ এটা বড় লজ্জার কথা!"[৩১]

আরবী সাহিত্য সম্পর্কে মাওলানা নিজে বলতেন ঃ

"গোটা আরবী সাহিত্যের মধ্যে আমি কেবল "মাকামাতে-হারীরীর" নয় মাকামা পড়েছিলাম। তাও এমনিভাবে যে, উস্তাদ সাহেব বলতেন, 'আমার বাড়ি আসা যাওয়ার পথে রাস্তায় পড়ে নেবে।" এজন্যে আমি তাঁর সাথে যেতাম এবং রাস্তায় চলতে চলতে পড়ে নিতাম। তারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উস্তাদ বলতেন, ঐ শব্দটির অর্থ আমার মনে নেই বাপু, নিজেই দেখে নিবে খন।"[৩১]

তাঁর ইলমী যোগ্যতা এবং উলুমে-নকলিয়ার সাথে সাথে ফুনুনে-আকলিয়ার তথা কুরআন-হাদীছের জ্ঞানের সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তাঁর দখল ও পারদর্শিতা তাঁর কিশোর বয়সেই এমনি স্বীকৃত ও বিখ্যাত ছিল যে, সে যুগের জাঁদরেল আলিমগণ পর্যন্ত তাতে চমৎকৃত হতেন। বড়রাও তাঁর সাথে ইল্‌মী আলোচনায় গর্ববোধ করতেন।[৩২] আরবী সাহিত্যে তাঁর এমনি দখল ছিল যে, গদ্য ও পদ্যে অনবদ্য রচনা তিনি অনায়াসেই লিখতে পারতেন।

১৩১১ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহীর খেদমতে হাদীছ পড়তে যান। তাঁর অগ্রজ মাওলানা মুহাম্মদ সাহেবও যেহেতু হাদীছ শরীফ হযরত গাঙ্গুহীর কাছেই পড়েছিলেন এবং মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া সাহেবও তাঁর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, এজন্যে হাদীছ পড়বার জন্যে তিনি তাঁরই কাছে যান। কিন্তু তখন তাঁর পানি–নামার অসুখ হয়ে গেছে। এজন্য হাদীছের দরস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া সাহেব সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী সাহেবের অনুরোধে দাওরায়ে হাদীছ পুনরায় চালু হয়। এটা ছিল হযরত গাঙ্গুহীর জীবনের শেষ দরস। আর তাঁর সৌন্দর্য ও প্রাণকেন্দ্র ছিলেন এই মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া সাহেবই। তিনি যখন বাইরে থাকতেন, তখন দরস বন্ধ থাকতো। তিনি হযরত গাঙ্গুহীর এতই আস্থা অর্জনে সক্ষম হন এবং তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে এমনিভাবে স্থান করে নেন যে, মুহূর্তের জন্যে তিনি একটু বাইরে গেলেই তিনি অস্থির হয়ে বলতেন ঃ মওলভী ইয়াহ্‌ইয়া হচ্ছেন অন্ধের যষ্টি।[৩৩]

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া দরস চলাকালে মাওলানা গাঙ্গুহী হাদীছের উপর যে তাকরীর করতেন, দরসের পর তা' লিপিবদ্ধ করে হাদীছের প্রত্যেক কিতাবের (অধ্যায়ের) এমন এক দুর্লভ পরিচিতি ও উপাদেয় ব্যাখ্যা তৈরী করেন যা' একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের রূপ পরিগ্রহ করে।[৩৪ ও ৩৫] পূর্ণ বারটি বছর তিনি গাঙ্গুহী সাহেবের খেদমতে তাঁর স্নেহছায়াতলে অবস্থান করেন এবং বিদায় হন তখন, যখন হযরত গাঙ্গুহী পরপারে যাত্রা করে তাঁর মহাপ্রভুর সন্নিধানে চলে যান। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী যেহেতু মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া সাহেবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধা সম্পর্কে তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই সম্যক অবহিত ছিলেন, তাই তিনি সর্বান্তকরণেই কামনা করতেন যেন মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া সাহেব মাদ্রাসা মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরে হাদীছের অধ্যাপনার জন্যে চলে আসেন। তিনি তাঁকে প্রথমে কিছুদিনের জন্যে মাযাহিরুল উলুমে আসার জন্যে আহ্বান জানান এবং তৃতীয় বছর তাঁকে স্থায়ীভাবে তথায় অবস্থানের জোর অনুরোধ জানান, সে অনুসারে ১৩২৮ হিজরী জুমাদাল উলা মাসে তিনি স্থায়ীভাবে মাযাহিরুল উলুমে চলে আসেন এবং দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে হাদীছের অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকেন অথচ এজন্যে কোনদিন পারিশ্রমিক বা বেতন গ্রহণ করেননি।

জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি ব্যবসায়-ভিত্তিক পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করে

রেখেছিলেন। নিজ হাতে এ পুস্তকালয়ের কাজকর্ম তিনি করতেন। অপূর্ব হাস্য-লাস্যময় মেজাজের তিনি অধিকারী ছিলেন। আরবীতে যাকে বলে بَكَّاءٌ بِاللَّيْلِ بَشَّامٌ بِالنَّهَارِ "রাতের বেলা অতি রোদনকারী, দিনের বেলা ঠোঁটে মুচকি হাসি" তিনি ছিলেন ঠিক তাই। আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি অথচ মানুষের সাথে দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত হাসিখুশী স্বভাব, যেন মুখে সবসময়ই ফুল ফুটছে। হৃদয়ের দাহন ও রাত্রের রহস্যময়তা লোকে খুব কমই জানতো। অন্য দশটা সাধারণ মানুষের মতোই তিনি অনেকটা গা ঢাকা দিয়ে থাকতেন।

কুরআন শরীফের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। মাওলানা 'আশিক ইলাহী সাহেব মিরাটী তাঁর "তাযকিরাতুল খলীল" পুস্তকে লিখেন ঃ

"একবার আমার অনুরোধে তিনি রমযান মাসে কুরআন শরীফ শুনানোর জন্যে মীরাট আসেন। তখন লক্ষ্য করি যে দিনে চলাফেরার মধ্যেই তিনি কুরআন শরীফের এক খতম সমাপ্ত করে ফেলতেন। ইফতারের সময় তাঁর মুখে "কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস" শুনা যেতো।প্রথম দিন তিনি যখন রেল থেকে অবতরণ করলেন তখন 'ইশার ওয়াক্ত হয়ে গেছে। সবসময় উযূ অবস্থায় থাকতেন। তাই মসজিদে ঢুকেই সোজা ইমামের মুসাল্লায় চলে গেলেন। তারপর তিন ঘন্টায় দশ পারা কুরআন শরীফ এমনি পরিষ্কার উচ্চারণে এক নাগাড়ে পড়ে গেলেন যে, কোথাও একটু থামলেন না, বা সন্দেহও করলেন না। যেন কুরআন শরীফ তাঁর সম্মুখে খোলাই রয়েছে। আর তিনি তা' পূর্ণ আস্থার সাথে নিশ্চিন্তেই তিলাওত করে যাচ্ছেন! তৃতীয় দিন খতম করে তিনি চলে গেলেন। দাওর বা সাহায্যকারী কিছুরই একটু ধারও ধারলেন না।[৩৬]

মাওলানা এহ্‌তেশামুল হাসান কান্দেলভী "হালাতে মাশায়েখে কান্দেলা" পুস্তকে লিখেন ঃ

"হযরত মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া সাহেবের চিরাচরিত অভ্যাস ছিল এই যে, প্রতি রমযানে তাঁর আম্মাজান ও নানী আম্মাকে কুরআন শরীফ শুনানোর জন্যে কান্দেলায় চলে আসতেন এবং তিন রাত্রিতে কুরআন খতম করে আবার কর্মস্থলে চলে যেতেন। যে বছর যুলকাদা মাসে তাঁর ইন্তিকাল হয়, সে বছর একই রাত্রিতে পূর্ণ কুরআন শরীফ শুনান এবং পরদিনই চলে যান।[৩৭]

কুরআনপ্রীতি ও দরসে-হাদীছ ছাড়াও সমাজ-সেবা ও পরোপকার ছিল তাঁর জীবনব্রত। বিধবা, ইয়াতীম, অনাথ শিক্ষার্থীদের উপকার তিনি আজীবন করে

গেছেন। এত গোপনীয়তার সাথে তিনি তা' করতেন যে, কেউ ঘুণাক্ষরেও তা টের পেতো না। নিজের ব্যাপারে এতই নির্বিকার ছিলেন যে, কেবল পাঁচ টাকার খাদ্য শস্যও একত্রে ঘরের জন্যে কিনেছেন কিনা সন্দেহ। অপর দিকে দান খয়রাতে তাঁর ব্যয়ের অবস্থা এরূপ ছিল যে, মৃত্যুকালে তাঁর দেনার পরিমাণ ছিল আট হাজার টাকা। অথচ কেউ ঘূণাক্ষরেও জানতো না যে, এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কোন্ খাতে ব্যয়িত হলো।[৩৮]

১৩৩৪ হিজরীর ১০ই যুল'কাদা তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৬ বছর। (বলতে গেলে যৌবনেই তিনি ইন্তেকাল করেন।) সাহারানপুরের বিখ্যাত গোরস্থান হাজী শাহে বিখ্যাত মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ মাযহার প্রমুখ মনীষীর পার্শ্বেই তাঁকে কবর দেয়া হয়।

মাওলানা মুহম্মদ ইলিয়াস সাহেব তাঁর মরহুম ভাইয়ের কথা আলোচনাকালে এতই অভিভূত হয়ে পড়তেন, যেন সবকিছুই তিনি ভুলে যেতেন। তাঁর গুণাবলী ও কামালাতের কথা দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করে তৃপ্তিলাভ করতেন। বিশেষতঃ তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, কলহ মুক্ত মেজাজ, মেজাজের ভারসাম্যতা, পরস্পর বিরোধী ব্যক্তিদেরকে একত্রে মিলিয়ে রাখার আল্লাহপ্রদত্ত অপূর্ব ক্ষমতা, অসাধারণ প্রতিভা এবং নির্ভুল-চিন্তাবুদ্ধির ঘটনাবলী অত্যন্ত আন্তরিকতা ও আগ্রহভরে বর্ণনা করতেন। তাঁর কোন কোন গবেষকসুলভ উক্তি ও রচনার উদ্ধৃতি দিতেও তিনি ভুলতেন না।[৩৯]

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ হযরত শায়খুল হাদীছের প্রমুখাৎ

মীর্যা ইলাহী বখশের পুত্র মীর্যা সুরাইয়াজাহ্ মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং ভালবাসতেন। তিনি বহুবার তাঁর কন্যা কায়সার জাহান বেগমকে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের কাছে বিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব ছিলেন অত্যন্ত দরবেশ-স্বভাব ভোগবিমুখ প্রকৃতির বুযুর্গ। শাহী খান্দানের সাথে আত্মীয়তা কি আর তাঁর পসন্দ হয়? তবুও মীর্যা সাহেবের পুনঃপুনঃ অনুরোধে তিনি তাঁর যুবক ছেলের কাছে কথাটি পাড়েন। কিন্তু তিনি তাতে এই বলে অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, শাহজাদীর সাথে বিয়ের পর কাঁথার বিছানার স্বাদ তো আর ভাগ্যে জুটবে না।[৪০] মীর্যা-দুহিতা এজন্যে মর্মাহত ছিলেন।

শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া সর্বদা জোর দিতেন বাইরের সাথে সম্পর্কহীনতার উপর। তিনি বলতেন ঃ একটা শিক্ষার্থী যতই মেধাহীন হোক না কেন, আড্ডাখোরীর ব্যাধি যদি তার না থাকে, তবে এক সময় না এক সময় সে যোগ্যতা অর্জন করবেই। পক্ষান্তরে, শিক্ষার্থী যতই মেধাবী ও বিদ্যুৎসাহী হোক না কেন, বন্ধু-প্রিয় ও আড্ডাখোর হলে সে তার যোগ্যতা হারাতে বাধ্য।[৪১]

তিনি আরো বলতেন ঃ "সাহেবজাদা হওয়ার অভিমানমুক্ত হতে বেশ সময় লাগে।" হযরত শায়খ বর্ণনা করেন, গাঙ্গুহে অবস্থান ও চাচাজান মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের নফল নামাযের প্রভাবে আমার মনেও নফল-প্রীতির উদ্রেক হয়। একদা মাগরিবের নামাযের পর গাঙ্গুহী (র.)-এর হুজরার সম্মুখে দীর্ঘ নফলের নিয়্যাত করেছি আর অমনি কোথা থেকে আব্বাজান এসে কষে লাগালেন এক থাপ্পড় আর মুখে বল্‌লেন ঃ শুনি, সবক শেখা হয় না?'[৪২]

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া সাহেবের এখানে শিক্ষায় নতুনত্ব ছিল। সেখানে দরসে-নিযামীর বাধ্যবাধকতা ছিল না। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুসারে পাঠ্য নির্ধারিত হতো। "আলফিয়া ইব্‌ন মালিক"-এর পাঠ দৈনিক মুখস্থ শুন্‌তেন।[৪৩] তাঁর এখানে ব্যাকরণের নিয়মাবলী প্রথমে মুখস্থ করানো হতো। তারপর তার অনুশীলন ব্লাকবোর্ড বা রাফ কাগজে করানো হতো। রমযানে বন্ধের রীতি ছিল না। অবশ্য, রমযানে পঠনীয় কিতাবগুলো আলাদা করে দেয়া হতো। আরবী সাহিত্যের উপর খুব জোর দেয়া হতো। "নহুমীরের" সাথে সাথে আরবী থেকে উর্দু ও উর্দু থেকে আরবী অনুবাদ করার অভ্যাস করানো হতো। সাহিত্য হিসাবে "চেহেল-হাদীছ" (চল্লিশ হাদীছ) পড়ানোর রীতি ছিল। আরবী সাহিত্য পুস্তকের মধ্যে হাশিয়াযুক্ত কিতাব পড়ানোর তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৪৪]

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া সাহেব প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বল্‌তেন, এতে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না। এতে মুদাররিস তো সারারাত জেগে কিতাবপত্র অধ্যয়ন করে দিনে ক্লাসে এসে তা উজাড় করে শুনিয়ে দেন। শিক্ষার্থী মহাশয়গণ দয়া করে তা শুনেন বা এদিক ওদিক মনঃসংযোগ করেন। তাঁর ওখানে সমস্ত দায়দায়িত্ব হতো শিক্ষার্থীদের। তাঁরাই কিতাব অধ্যয়ন করবে, পাঠ্য বিষয়ের উপর তাকরীর করবে। তিনি বলতেনঃ উস্তাদের কাজ হচ্ছে শুধু 'হুঁ' বা 'উহু,' বলা।[৪৫,৪৬ ও ৪৭]

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া সাহেব একদিনেরও কম সময় মৃত্যু শয্যায় শায়িত

ছিলেন। ৯ই যি-কাদা শুক্রবার সকাল থেকে একটু অস্বস্থিবোধ করছিলেন। ছাত্রাবাসের মসজিদে জুমুআর নামায সুস্থ স্বাভাবিকভাবেই পড়ান। জুমুআর পর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েন। তখন থেকে সামান্য দাস্ত শুরু হয়। 'ইশা পর্যন্ত তা' বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'ইশার পর এডভোকেট আবদুল্লাহ্ জানের কুঠীতে একটি সুপারিশ করার জন্যে যেতে মনস্থ করেন। লোক-জনের বাধায় তিনি বিরত হন, তখন দাস্ত বন্ধ হয়ে যায়। সাথে সাথে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। পরদিন ১০ই যি-কাদা (১৩৩৪ হিঃ) প্রত্যুষে তিনি তাঁর মহান স্রষ্টার সন্নিধানে চলে যান। অন্তিম সময়ে রসনায় অনুচ্চ কণ্ঠে পুনঃপুনঃ আল্লাহ্ আল্লাহ্ (ইস্‌মে যাতের) যিকির চালু ছিল। এ অবস্থায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন) হাজীশাহ্ গোরস্থানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। ইন্তিকাল হয় আটটায়, দশটায় দাফন কাফন সম্পন্ন হয়ে যায়। ঐদিনই দুপুরে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেবের জাহাজ বোম্বেতে অবতরণ করে।

মাওলানার জীবন ছিল বড়ই সাধাসিদা। তাঁর লেবাস-পোশাক বা জীবনযাত্রা দেখে কেউ তাঁকে মৌলভী বলেও ধারণা করতে পারতো না। অধিকাংশ সময় খাকী বর্ণের কাপড় পরতেন।

হযরত শায়খুল হাদীছ বলেন ঃ আমাদের মুরুব্বীদের মধ্যে অধীরভাবে কান্নাকাটির অভ্যাস হযরত মদনী (র.) ও আব্বাজানের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করতাম। সর্বদা কুরআন তিলাওতের তাঁর অভ্যাস ছিল। অবসর পেলেই মুখস্ত-তিলাওত করতেন। শেষ রাত্রে এ তিলাওত হতো সশব্দে ও কান্নাসহ।

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব বলতেন ঃ আমার অগ্রজ মওলভী মুহাম্মদ সাহেব যেহেতু হাদীছ পড়েছিলেন গাঙ্গুহ্‌তে তাই হযরত গাঙ্গুহীর প্রতি আমার মনে ভক্তির সঞ্চার হয় এবং মনে মনে পণ করে নেই যে, হাদীছ যদি পড়তেই হয় তবে হযরত গাঙ্গুহীর কাছেই পড়বো, নতুবা পড়বোই না। এদিকে আ'লা হযরত গাঙ্গুহী কয়েক বছর নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি ও স্বাস্থ্যগত অসুবিধার জন্যে হাদীছের দরস বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব মাদ্রাসায়ে হুসায়ন বখ্‌শে অনুষ্ঠিত হাদীছের পরীক্ষায় মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার লিখিত পেপার দেখেছিলেন। মাওলানা অত্যন্ত পড়াশুনা ও পরিশ্রম করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।[৪৮ ও ৪৯] পরীক্ষার খাতায় লিখিত জবাব পড়ে তিনি হযরত গাঙ্গুহীকে বলেছিলেন ঃ হযরত! সারাজীবনের জন্যে তো আপনি হাদীছের দরস বন্ধ করে

দিয়েছেন। আমার দরখাস্ত, আর একটি বছর কষ্ট করে হাদীছের একটি দাওরা করিয়ে দিন! মাওলানা সৈয়দ কান্দেলভী দেহ্লভীর পুত্র মওলভী ইয়াহ্ইয়া হাদীছের পরীক্ষা আমি নিয়েছিলাম। এমন একটি প্রতিভাশালী ছাত্র খুবই দুর্লভ। হযরত সাহারানপুরীর সে আবেদন ব্যর্থ যায়নি। হযরত গাঙ্গুহী ১লা যি-কাদা ১৩১১ হিজরী থেকে পুনরায় তিরমিযী শরীফের দরস শুরু করে দেন। তার কিছু দিন পর বুখারী শরীফও শুরু করে দেন।

হযরত সাহারানপুরী যেদিন মদীনার প্রবাসজীবন কাটিয়ে বোম্বাই পৌছলেন, ঐদিনই মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের ইন্তিকাল হয়। তাঁর মৃত্যুর তারবার্তা পেয়ে হযরত যেন মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে সরলো না। ৩/৪ দিন পূর্বে এডেন থেকে হযরতের আগমনের তারিখ সম্বলিত তারবার্তা এসেছিল। সে বার্তা জানিয়ে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব রায়পুরে যে পত্র লিখেছিলেন, তার প্রারাম্ভেই তিনি এ পংক্তিটি উদ্ধৃত করেছিলেন ঃ

مژده اے دل که دگر باد صبا باز آمد
هدهد خوش خبر از شهر سبا باز آمد

টীকা ঃ

১. শায়খুল হাদীছের পত্র

২. এ ছত্রগুলো লিখার সময় হযরত মাওলানা ইউসূফ জীবিত ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অসীম রহমত বর্ষণ করুন!

৩. হালাতে মাশায়েখে কান্দেলা-মাওলানা ইহতেশামুল হাসান সাহেব প্রণীত কিতাবের পূর্বকথারূপে আমার কলমে লিখিত, পৃ. ৫-৬।

৪. হযরত শায়খুল হাদীছের লিখিত পাণ্ডুলিপি (বংশের লোকজনের কাছে রক্ষিত কুলপঞ্জীতে কেবল কুত্ব শাহ্ পর্যন্তই রক্ষিত আছে-হালাতে মাশায়েখে কান্দেলা, পৃ. ৯। এ বংশের জনৈক গবেষক যুবক নূরুল হাসানের মতে উক্ত কুলপঞ্জীতে বর্ণিত শেষোক্ত নাম দু'টি-শায়খ মুহম্মদ ফাযিল ও শায়খ কত্বশাহ্র আসলে এ বংশের সাথে কোনই সম্পর্ক ছিল না। এ নামগুলো পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয়ে গেছে। তাঁর মতে মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ ঝিনজানবী কাজী যিয়াউদ্দীন সুন্নামীর বংশধর। মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ থেকে বংশপঞ্জী এরূপ হবে ঃ

মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মাওলানা করীমুদ্দীন মুযাক্কির ইবন ইমাম তাজ মুযাক্কির ইবন ইমাম হাজ ইবন কাজী যিয়াউদ্দীন সুন্নামী।

৫. হালাতে মাশায়েখে কান্দেলা, পৃঃ ১৫-১৬ ব-হাওয়ালা "গারায়েবুল হিন্দ"-

৬. কান্দেলায় জনবসতি স্থাপনের উপলক্ষ্য ছিল এই যে, ৭৯৩ হিজরীর ২২শে রজব তারিখে সুলতান মুহাম্মদ শাহ্ ইব্‌ন ফিরূযশাহ্ তুগলক শিকারের উদ্দেশ্যে বর্তমান কান্দেলার নিকট আগমন করলে জুমুআর দিন এসে যায়। সুলতান তখন কান্দেলায় বসতি স্থাপন ও জামে মসজিদ নির্মাণের আদেশ জারী করলেন। যথা শীগগীর সে আদেশ পালিত হলো। জুমুআতে স্বয়ং বাদশাহ্ অংশগ্রহণ করলেন এবং সমসাময়িক একজন ফাযিল আলিম কাযী শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাওলানা কারীম উদ্দীন (যিনি কাযী যিয়াউদ্দীন সুন্নামীর বংশধর ছিলেন)-এর নামে যথেষ্ট জমি প্রদান পূর্বক তাঁকে কাযী, ইমাম, খতীব এবং নিকাহ্ পড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাথে সাথে তাঁকে উক্ত কসবার শাসনভারও অর্পণ করেন। তারপর তাঁর বংশধরগণ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। (হালাতে মাশাখে কান্দেলা (সংশোধিত), পৃঃ ১৮)

৭. হালাতে মাশায়েখে কান্দেলা, পৃঃ ২৩

৮. সাইয়্যিদ সাহেবের কান্দেলা উপস্থিতির তারিখটি হলো ১৭ রবিউল আউয়াল ১২৩৪ হিঃ

৯. "হালাতে মাশায়েখে কান্দেলার" বর্ণনানুসারে ঐ সময় মুফতী সাহেবের বয়স ৭১ বছর অতিক্রম করে গিয়েছিল। মুফতী সাহেব ১১৬২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন আর সাইয়্যিদ সাহেব কান্দেলা আগমন করেন ১২৩৪ হিজরীতে।

১০. নিজের শায়খে কামিল থাকা সত্ত্বেও তাঁর ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক শিষ্যদের নিকট থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও ফয়েয হাসলের ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে তাসাওউফের ইমাম ও মাশায়েদের জীবনে। অনেক সময় মুর্শিদ নিজেই তাঁর কোন শিষ্য থেকে অন্য শিষ্যকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও ফায়েয হাসিল করার কথা বলে দিয়ে থাকেন। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো মাওলানা কিরামত আলী জৌনপুরী লিখিত "নূরুন আলা নূর" এর বর্ণনাটি যাতে তিনি লিখেছেনঃ মাওলানা আবদুল হাই সাহেব বুড্ডানভী বলেছেন ঃ আমি 'সুলুক ইলাল্লাহ্ "মুশাহাদা" হাসিল করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম। আমি মাওলানা শাহ আবদুল আযীয সাহেবের কাছে (যিনি একাধারে তার উস্তাদ, ফুফা এবং শ্বশুর ছিলেন) আরয করলাম যে, আমাকে "সুলুক ইলাল্লাহ্"-এর তা'লীম দিতে মর্যী হয়। আমি ইতিপূর্বে অনেক ভারতীয় ও বিদেশী মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহ্ নিয়েও এব্যাপারে সফলকাম হতে পারিনি। হযরত মাওলানা জবাবে বললেন ঃ বৎস, আমি এখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি। অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকতে আমি অক্ষম। তোমার এ আকাঙক্ষা মীর আহমদ সাহেবের দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। আমি এবং হযরত মিঞা সাহেব (সায়্যিদ সাহেব) এবং মিঞা মুহাম্মদ ইসমাঈল মাদ্রাসার একই ঘরে সহাবস্থান করতাম। এক রাত্রে আমি মিয়া সাহেবের নিকট আরয করলাম ঃ হযরত! সাহাবায়ে কিরাম যেভাবে নামায আদায় করতেন তেমন দু'রাকআত নামায আমি পড়তে চাই। (তারপর মাওলানা সায়্যিদ সাহেবের তাওয়াজ্জুহ্ দ্বারা হাসিলকৃত তাঁর নামাযে মনোনিবেশ, আল্লাহ্‌কে হাযিরজ্ঞানে নামায আদায় ও বাতিনী বিশেষ অবস্থাদির কথা সবিস্তরে বর্ণনা করেন।) তিনি বলেন ঃ দিনের বেলা আমি হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয সাহেবের খেদমতে হাযির হয়ে রাত্রের ঘটনা আগাগোড়া বর্ণনা করে তাঁর কাছে বয়আত হওয়ার কথা ব্যক্ত করলে তিনি খুশী হয়ে বললেন ঃ বা-রাকাল্লাহ্! বা-রাকাল্লাহ্!! বেশ করেছ।" আমি আরয করলাম ঃ হযরত! এটা কোন্ তরীকা? জবাবে তিনি বললেন ঃ "মিঞা, এমন ব্যক্তিগণের কোন তরীকার প্রয়োজন হয় না; এরা মুখে যা বলে দেন, তা-ই তরীকা।" (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ", পৃ ১৪৫-৪৯)

১১. পুস্তকটির পুরো নাম হচ্ছে "মুলহিমাতে আহমদীয়া ফীত–তারীকাতিল মুহাম্মদীয়া"। পুস্তকটি ১২৯৯ হিজরীতে টুংকের ওয়ালী মুহাম্মদ আলীখানের উযীর ইয়ামানুদ্দৌলার ফরমায়েশ অনুসারে মুফীদে আম প্রেস, আগ্রা থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি মধ্যম সাইজের ৪৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পুস্তকটিতে সায়্যিদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর কান্দেলার আগমনের তারিখ লিখিত আছে ১৭ই রবিউল আউয়াল ১২৩৪ হিঃ, পৃঃ ৩।

১২. হালাতে মাশায়েখে কান্দেলা, পৃঃ ২০৭।

১৩. ঐ

১৪. বংশ পরিচিতির অধিকাংশই ভাগিনা মরহুম মওলভী মুহাম্মদ ছানী–এর লিখিত "সাওয়ানিহে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ" থেকে ঈষৎ ভাষাগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ নেয়া।

১৫. মাওলানা ইলিয়াস (র.)–এর বর্ণনা

১৬. আরওয়াহে ছালাছা

১৭. মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের বর্ণনা। কোন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, তিনি মাওলানা মুযাফ্ফর হুসায়ন কান্দেলবীর হাতে বয়আত এবং সম্ভবতঃ ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের রোয়েদাদ (১৩১৩ হিঃ)–এ তাঁকে মওলানার খলীফা বলে লিখিত আছে। (মাওলানা রাশিদ আহমদ কান্দেলভীর সৌজন্যে)

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের বর্ণনা।

২০. বর্ণনা মাওলানা ইহ্তেশামুল হাসান সাহেব কান্দেলভী

২১. হযরাতে নিযামুদ্দীন দ্রঃ

২২. বর্ণনা ঃ শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেব

২৩. বর্ণনা ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব (র.) (মাওলানা ইলিয়াস আওর উন্ কি দ্বীনী দাওয়াত, পৃঃ ৩৩–৩৯ থেকে উদ্ধৃত)

২৪. বর্ণনা ঃ হাজী আবদুর রহমান সাহেব প্রমুখ মাওলানা মুহাম্মদ সাহেবের শিষ্যগণ।

২৫. এ পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণ ভারত ও পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী ও আরবীতে এর অনুবাদও হয়েছে। (বাংলাতেও তা' প্রকাশিত হয়েছে–অনুবাদক)

২৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের আম্মাজানের অসাধারণ জীবনকথা, তাঁর দু'আ–দুরূদ যিকির–আযকার সম্পর্কে জানবার জন্যে পড়ুন ' মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আওর উন্ কি দীনী দাওয়াত, পৃঃ ৪১–৪২

২৭. এর জীবনবৃত্তান্ত পাবেন প্রাগুক্ত পুস্তকের ৪০–৪১ পৃষ্ঠায়।

২৮. তাযকিরাতুল খলীল, পৃঃ ২০০ (১৯৭৫ ইং. মুদ্রণ)

২৯. ঐ, পৃঃ ২০১

৩০. ঐ, পৃঃ ২০০–২০১

৩১. তাযকিরাতুল খলীল, পৃঃ ২০২–২০৪

৩২. ঐ, পৃঃ ২০৬

৩৩. ঐ, পৃঃ ২০৭

৩৪. তাযকিরাতুল খলীল, পৃঃ ২০৭
৩৫. হালাতে মাশায়েখে কান্দেলা
৩৬. তাযকিরাতুল খলীল, পৃঃ ২০৫
৩৭. হযরত মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কি দীনী দাওয়াত, পৃঃ ৬২
৩৮. আপবীতি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১-২২
৩৯. ঐ, পৃঃ ১৩
৪০. আপবীতি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭
৪১. ঐ, পৃঃ ১৯-২০
৪২. ঐ, পৃঃ ১৯
৪৩. ঐ
৪৪. আপবীতি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭
৪৫. ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০৬-১১২
৪৬. ঐ, ষষ্ঠখণ্ড, পৃঃ ৩০৪
৪৭. ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩৬
৪৮. আপবীতি, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫-৪৬
৪৯. ঐ , পৃঃ ১৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম ও ছাত্র জীবন

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের বিয়ে হয় হাফিজ ইউসুফ সাহেবের কন্যার সাথে। হযরত শায়খুল হাদীছ কান্দেলায় এ দম্পতির ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন ১৩১৫ হিজরীর ১১ই রমযান রাত এগারটায়। তাঁর জন্মের সুসংবাদ যখন প্রচারিত হলো, তখন তাঁদের খান্দানের অভিজাত বুযুর্গগণ ও মহল্লাবাসীরা তারাবীর নামায সবে মাত্র শেষ করেছেন। তাঁদের আর সরাসরি ঘরে ফেরা হলো না। সকলেই দল বেঁধে ছুটে এলেন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের ঘরে। তাঁরা এ নবজাত শিশুর শুভ জন্মের জন্য পিতামাতাকে মুবারকবাদ জানিয়েই তবে যার যার ঘরে ফিরলেন।

দাদা হযরত মাওলানা ইসমাঈল সাহেব তখন দিল্লীর নিযামুদ্দীনস্থ তাঁর কর্মস্থলে ছিলেন। পৌত্রের জন্মসংবাদ শুনামাত্র তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো "আমার বিকল্প এসে গেছে।" এ যেন ছিল তাঁর বিদায়ের ইঙ্গিতবহ। সত্যি সত্যি ঐ বছরই শাওয়াল মাসে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

সপ্তম দিন নবজাতকের পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব কান্দেলায় আসেন। ঘরে পৌঁছেই তিনি তাঁর সন্তানকে দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেকালে পুরনো বনেদী খান্দানগুলোতে লাজলজ্জা অনেক বেশি ছিল। বড়দের সম্মুখে আপন সন্তানদেরকে আদরসোহাগ করা অত্যন্ত লজ্জাকর বলে বিবেচিত হতো। তাই নিজ শিশু সন্তানকে ডাকিয়ে এনে দেখার রেওয়াজ ছিল না। ওদিকে ঘরে আকীকার জন্য অল্পবিস্তর কিছু না কিছু হওয়া জরুরী বিবেচিত হতো। সম্পর্কে এক নানী নাতির জন্যে আকীকার এক বিরাট পরিকল্পনা করেই রেখেছিলেন। তাঁর মনের সাধ পূর্ণ হয়েছে দেখে তাঁর খুশীর সীমা ছিল না। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের এভাবে আকস্মিক আগমন ও সন্তানকে দেখার আগ্রহ প্রকাশে নারীমহলে কিছুটা বিস্ময় এবং

খুশীরও উদ্রেক হয়। কেউ কেউ এও বললেন, শেষ পর্যন্ত বাপ তো! একান্ত দেখবার যদি মনে চায়ই, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? মাওলানা নাপিত সাথেই নিয়ে এসেছিলেন। শিশুকে সম্মুখে আনতেই নাপিতকে ইঙ্গিত করলেন। সাথে সাথে মাথা মুণ্ডন করা হলো। মাওলানা চুল শিশুর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বল্লেন, আমি চুল মুড়িয়ে দিয়েছি, এবার আপনি বকরী জবাই করিয়ে দিন এবং চুলের সম ওজনের রূপা সাদ্কা করে দিন!

শিশুর নাম রাখা হলো দু' দু'টি–মুহাম্মদ মূসা ও মুহাম্মদ যাকারিয়া। এই শেষোক্ত নামই খ্যাতি লাভ করে। এ নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন।

ঐ দিনগুলোতে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া স্থায়ীভাবে গাঙ্গুহে হযরত গাঙ্গুহীর খিদমতে অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনে সময় সময় কান্দেলা ও দিল্লীতে যাতায়াত করতেন। শায়খুল হাদীছের আড়াই বছর বয়সকালে মায়ের সাথে সাথে তিনিও গাঙ্গুহে চলে আসেন। হযরত মাওলানা গাঙ্গুহীর যে পৃষ্ঠপোষক ও মুরুব্বীসুলভ তথা পিতৃসুলভ সম্পর্ক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের সাথে ছিল, সেহেতু তাঁর সে ভাগ্যবান শিশুসন্তানটির (কালে যার হযরতের বাতিনী কামালাতের ধারক–বাহক ও তাঁর যাহেরী উলুমের প্রসারকারী ও ব্যাখ্যাতা হওয়াটা নির্ধারিত ছিল) হযরতের স্নেহমমতা ও দু'আ লাভের যে সুযোগ হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। শায়খ বলেন ঃ "আমি তখন আড়াই বছরের শিশুমাত্র। হযরত শিমূল গাছের নীচে আসন গেঁড়ে বসতেন। আমি হযরতের পদদ্বয়ের উপর দাঁড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতাম।" তিনি আরও বলেন ঃ আরও যখন কিছু বড় হলাম, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে হযরতের আগমনের অপেক্ষা করতাম আর তাঁকে দেখামাত্র উচ্চকণ্ঠে কিরাআতের মতো করে বলতাম 'আস্‌সালামু 'আলায়কুম।' হযরতও স্নেহভরে ঠিক তেমনি আওয়াজে জবাব দিতেন–'ওয়া আলায়কুমুস সালাম।' হযরত শায়খ আরও বলেন ঃ হযরত গাঙ্গুহীর কোলে খেলা করা, তাঁর হাঁটুদ্বয়ের উপর পা রেখে ও তাঁর ঘাড়ে হাত রেখে দাঁড়ানো, দুই ঈদের নামাযে তাঁর সাথে পাল্কীতে চড়ে ঈদগাহে যাতায়াত–যে পাল্কীর বাহক হতেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম–উলামা ও পীর–মাশায়েখ–প্রায়ই হযরতের সাথে একত্রে আহার করা এবং হযরতের থালার উচ্ছিষ্টের একাকী মালিক হয়ে যাওয়া এখনো চোখে লেগে আছে।[১]

সে সময় গাঙ্গুহ ছিল উলামা ও পুণ্যবানদের তীর্থকেন্দ্রস্বরূপ। হযরতের বাতিনী প্রশিক্ষণ এবং সুবিখ্যাত দরসে হাদীছের আকর্ষণে দূর–দূরান্ত থেকে উলামায়ে

কামেলীন ও তালিবীনে-সাদিকীন তথা কামিল আলিম ও সত্যিকারের জ্ঞানান্বেষিগণ এ অজগাঁয়ে ছুটে আসতেন। সেখানে তখন এমনি এক ইলমী ও রূহানী পরিবেশ গড়ে উঠেছিল যে, সে যুগে বহু দূরদেশ পর্যন্ত তার জুড়ি মেলা ভার ছিল।[২] হযরত শায়খের শৈশব কেটেছে এমনি এক বরকতময় পরিবেশে যে শৈশবকালে পরিবেশের ভালমন্দ প্রভাব শিশুমনে পড়ে একান্তই তার মনের অজান্তে। বার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর গাঙ্গুহ্ অবস্থানকালে অধিকাংশ সময়ই তাঁর গাঙ্গুহেই কাটতো। কখনও কোন উৎসবাদিতে যোগদান উপলক্ষে তাঁর আম্মাজানের সাময়িকভাবে কান্দেলা যেতে হলে তিনিও সাথে যেতেন। তারপর আবার নির্দিষ্ট সময়শেষে গাঙ্গুহেই ফিরে আসতেন। ওদিকে তাঁর পিত্রালয় কান্দেলাও ছিল একটি ধর্মীয় কেন্দ্র ও জ্ঞানপীঠস্বরূপ। কান্দেলার ঘরে বাইরে ছিল ইবাদতের পরিবেশ, নফল নামাযাদি ও তিলাওয়াতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। আল্লাহ্ওয়ালাদের সংশ্রব, জ্ঞানচর্চায় মত্ততা ও ব্যস্ততা, আদব-লেহায, শিষ্টতা-সদাচার, রিয়াযত ও সাধনার চর্চা ছিল ঘরে ঘরে। সচেতন শিশুমনে তার প্রভাব পড়তো অনিবার্যভাবেই। গাঙ্গুহ থেকে কান্দেলার পথে পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন খান্দানের কত আত্মীয়স্বজন, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, সতীর্থসহাধ্যায়ী সমবয়সী। কয়েকদিন করে বেড়ানো হতো এক এক বাড়িতে। কখনো বা তাঁরা কান্দেলা যেতেন বড়দুলি হয়ে। সে পথেও ছিলেন বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমমনা লোক। এ পথেও বেশ কয়েকদিন করে কেটে যেতো এক একখানে। বেশ মনে রাখবার মতো পরিবেশ গড়ে উঠতো তাঁদের আগমনকে কেন্দ্র করে। মজলিস-মহ্ফিলের বন্ধুবান্ধবরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত দিলখোলা ও আন্তরিকতাপূর্ণ। প্রত্যেকেই জ্ঞানী গুণী শরীফ সজ্জন। কখনো কখনো এ মধ্যবর্তী স্থানগুলোতে তাঁদের চার পাঁচদিনও কেটে যেতো। হযরত শায়খ পরবর্তীকালে গাঙ্গুহ্, কান্দেলা ও মধ্যবর্তী মনযিলগুলোতে তাঁদের আদর-আপ্যায়ন অভ্যর্থনার ঘটনাবহুল বিবরণ শুনাতেন বেশ মজা করে করে। তাতেই বোঝা যায় যে, স্মরণশক্তির সাথে সাথে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও কত তীক্ষ্ণ ছিল এবং সেসব দেখাশোনা ও সঙ্গসাহচর্য তাঁর নিজ জীবন ও রুচি গঠনে কতটুকু সহায়ক হয়েছিল।'[৩]

হযরত শায়খের বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন ১৩২৩ হিজরীর ২৩শে জুমাদাল উলা তারিখে হযরত গাঙ্গুহী (র.) ইন্তিকাল করেন। গাঙ্গুহ্ভূমিকে ইল্ম ও

হিদায়েতের যে দিবাকর সুদীর্ঘ কাল আলোকিত করে রেখেছিল এবং দিক-দিগন্ত থেকে অসংখ্য আলোর পিপাসু জ্ঞানান্বেষীকে সেই অজগাঁয়ে এনে জড়ো করেছিল, সে হিদায়েত-সূর্যের অস্ত যাওয়ার পর পরই তাঁরা আবার যার যার পথে চলে গেলেন। কিন্তু যে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আপন পিতামাতার উপরও হযরতকে আর তাঁর মাতৃভূমি কান্দেলার উপর গাঙ্গুহকেই প্রাধান্য দিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর পক্ষে সহসা গাঙ্গুহ ত্যাগ সম্ভবপর হলো না। তিনি সেখানেই তাঁর পীর ও উস্তাদের মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলেন।

শিক্ষাশুরু

সে যুগে প্রায় বনেদী ঘরেই রেওয়াজ ছিল, ৪/৫ বছর বয়সেই শিশুদেরকে মক্তবে পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং তার নামকরণ করা হয়ে যেত। শায়খের পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের অবস্থা ছিল আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্বয়ং শায়খের ভাষায়, মায়ের স্তন ছাড়তে না ছাড়তেই তিনি পোয়া পারা কুরআন হিফ্য করেছিলেন আর সাত বছর বয়সে তাঁর কুরআন হিফ্য সমাপ্ত করে তিনি পূর্ণ হাফিযে-কুরআন হয়ে যান। কিন্তু হযরত শায়খের সাত বছর বয়স পর্যন্ত বিসমিল্লাহ্ও হয়নি। শিশুর দৈহিক বাড় ভালই ছিল। গায়ে-গতরে বেশ নাদুস-নুদুস ছিলেন। এ বয়সেও লেখাপড়া শুরু না করায় খান্দানের বড়দের আশ্চর্যের সীমা ছিল না। দাদী সাহেবা (যিনি নিজেও হাফিযা ছিলেন) একদিন তাঁর সুযোগ্য সন্তানকে লক্ষ্য করে বললেনঃ ইয়াহ্ইয়া! সন্তানের মায়ায় এত অন্ধ হলে চলবে কেন? তুই তো সাত বছর বয়সে হাফিয হয়েছিলে আর এ ষাঁড়টা এত বড় হয়ে চরে বেড়াচ্ছে! শুনি, ছেলেটাকে কি শেষ পর্যন্ত জুতা সেলাইর কাজ শিখাবি, নাকি, আর কিছু? জবাবে মাওলানা তাঁর মাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "যতদিন খেলতে চায় ওকে খেলতে দিন মা, যেদিন কলুতে জুতে দেয়া হবে, তারপর একেবারে কবরে গিয়েই তবে ছাড়া পাবে।"

অবশেষে সেই শুভমুহূর্ত উপস্থিত হলো। গাঙ্গুহ্তে যথারীতি শিশু যাকারিয়ার লেখাপড়ার 'বিসমিল্লাহ্' করানো হলো। সে সময় ডাক্তার আবদুর রহমান নামক মুযাফফর নগরের জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি গাঙ্গুহ্তে অবস্থান করতেন। তাঁর সেখানে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হযরত গাঙ্গুহীর খিদমত করা। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ উঠাবসা ছিল। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব তাঁর কাছেই

শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ি দিলেন। শায়খ 'কায়েদায়ে বাগদাদীর' পাঠ তাঁর কাছেই সমাপ্ত করেন।

কুরআন শরীফ হিফ্য করা ছিল এ খান্দানের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের শিশু সন্তানদের শিক্ষার প্রথম আবশ্যিক স্তর। সে অনুসারে হিফ্য শুরু করানো হলো। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের শিক্ষাদানপদ্ধতি ছিল অভিনব। তিনি প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা সবক দিয়ে বলতেন ঃ এ পৃষ্ঠা একশ' বার পড়ে নাও, ব্যস, বাকী দিন ছুটি। শিশু যতই মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী হোক না কেন, মানব-প্রকৃতি ও বয়সের চাহিদা থেকে কোন শিশুই মুক্ত থাকতে পারে না। শায়খ বলেন, আমার ধারণাও ছিল না যে, এক শ' বার এক পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করতে কী পরিমাণ সময় লাগতে পারে। তাড়াতাড়ি করে কিছুক্ষণ পড়েই এসে বলতাম, আব্বাজান, এক শ' বার পড়া হয়ে গেছে। আব্বা ও তা' নিয়ে বেশি সওয়াল জওয়াব করতেন না। পরের দিন আবার বলতাম, কাল তো প্রায় এতটুকুই পড়েছিলাম, আজ ঠিক ঠিক এক শ' বারই পড়েছি।" আব্বাজান বলতেন, আজকের সত্য সত্যের তাৎপর্য কাল ঠিকই টের পাবে। সাহারানপুর আসা ও আরবী পড়া শুরু হওয়ার পরও হুকুম ছিল, এক পারা এত বার পড়ে নাও। মাগরিবের পর জনৈক মৌলবী সাহেব তা শুনতেন। তাতে অনেক ভুলই ধরা পড়তো। তা' লক্ষ্য করে এ পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি সাহারানপুরের বিখ্যাত উকীল মৌলভী আবদুল্লাহ্ জান মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবকে একদিন অনুযোগ করে বললেন, যাকারিয়ার কুরআন স্মরণ নাই দেখছি। মাওলানা বললেন ঃ একেবারেই স্মরণ নেই। তখন ভদ্রলোক পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ ব্যাপার কী? জবাবে তিনি বললেনঃ সারাজীবন তার কাজ আর কী? কুরআনই পড়তে হবে সারা জীবন ধরে, তখন স্মরণ না হয়ে আর যাবে কোথায়?

১৩২৮ হিজরী পর্যন্ত ১২/১৩ বছর বয়স পর্যন্ত গাঙ্গুহেই অবস্থান করেন ভাবীকালের শায়খুল হাদীছ। এ সময়কালের মধ্যে তিনি বেহেশতী জেওর প্রভৃতি উর্দূ ধর্মীয় পুস্তক এবং ফার্সীর প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েন। এর অধিকাংশই পড়েন স্নেহার্দহৃদয় বুযুর্গ চাচা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের কাছে।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের কাছে সবকের ব্যাপার সম্পূর্ণ নির্ভর করতো শিক্ষার্থীদের নিজেদের পড়াশুনার উপর। শিক্ষার্থী কিতাবের পাঠ পড়তে গিয়ে কোথাও মারাত্মক ভুল করে ফেললে তিনি কিতাব বন্ধ করিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, যাকারিয়া, তুই যদি হপ্তা ছয়েক চুপ করে থাকতে পারিস্ আমি তোকে

ওলী বানিয়ে দিতে পারি। জবাবে তিনি বলতেন, হপ্তা ছয়েক দূরের কথা দিন ছয়েক চুপ থাকাও তো আমার জন্য ভারী মুশকিল।

সাহারানপুরে অবস্থান ও আরবী শিক্ষার সূচনা

আরবী শিক্ষার যথারীতি সূচনা সাহারানপুর এসে ১৩২৮ হিজরীতে হয়। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে মুজতাহিদসুলভ মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি, তার পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্য কিতাবসমূহের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ তরতীবের বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব একটি পাঠক্রম তৈরী করেছিলেন, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবও তা অনুসরণ করতেন। শায়খকে শিক্ষা প্রদানকালে সে অভিজ্ঞতা ও নির্বাচনকে কাজে লাগানো হয়। তাঁর নিয়ম ছিল, কোন পুস্তকের সাহায্য ছাড়াই মুখে মুখে আরবী ব্যাকরণের নিয়মাবলী লেখাতেন। তারপর দু'চারটি হরফ বাতলিয়ে মিছাল, আজওয়াফ, নাকিস, মুযাআফ কায়েদা চতুষ্ঠয় অনুসারে অনেক সিগা বানিয়ে তা' শিক্ষার্থীদেরকে জপ করাতেন। শায়খ বলেন, এভাবে 'সরফে–মীর', ও 'পাঞ্জেগঞ্জ' দশ বার দিনের মধ্যেই শুনিয়ে দেই। অবশ্য 'ফুসূলে আকবরী'তে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। এভাবে আরবী ব্যাকরণের (সরফ ও নহর–এর) বহুল প্রচলিত পাঠ্য কিতাবসমূহ এক বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন পরিবর্ধনসহ তিনি পড়েন। 'কাফিয়ার' সাথে 'মজমুআয়ে আরবাঈন' এবং 'নফহাতুল ইয়ামনের' পরিবর্তে (যা' মাওলানার অপসন্দনীয় ছিল)[৪] আমপারার তরজমা পড়ান। নফহাতুল ইয়ামনের তৃতীয় অধ্যায়ের কসীদাগুলোই কেবল পড়েন। তারপর 'কসীদায়ে বুর্দা' 'বানাত সুআ'দ,' 'কসীদায়ে হামযিয়া', মাকামাতের পূর্বেই পড়ে নেন।

হযরত গাঙ্গুহীর ওফাতের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব প্রায় প্রতি বছরেই হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেবের আমন্ত্রণক্রমে সাহারানপুর তশরীফ নিয়ে যেতেন। কিন্তু মাওলানার পুনঃ পুনঃ বলায় ১৩২৮ হিজরীতে গাঙ্গুহ্ ত্যাগ করে স্থায়ীভাবেই তিনি সাহারানপুর চলে যান এবং যথারীতি মাদ্রাসার শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। মাদ্রাসার সাথে তাঁর এ সম্পর্কটা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। এভাবে শায়খের শিক্ষাক্ষেত্র সাহারানপুরে স্থানান্তরিত হলো। এখানে তিনি বাকী পাঠ্য কিতাবগুলোর পড়াশুনা শেষ করেন। মনতিক মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসার জাঁদরেল

মা'কুলাত বিশারদ শিক্ষক মাওলানা আবদুল ওহীদ সম্ভলীর নিকট এবং অবশিষ্ট কিতাবসমূহের অধিকাংশই উক্ত মাদ্রাসার নাযিম মাওলানা আবদুল লতীফ সাহেবের কাছেই তিনি পড়েছিলেন।

শিক্ষা সমাপন

শায়খ তাঁর শিক্ষাজীবনের শেষ কিতাবগুলো স্বয়ং তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের কাছে খতম করেন। মাওলানার শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল তাঁর একান্তই নিজস্ব। এখানে উস্তাদের তাক্রীর করার এবং সকল সমস্যা নিজেই সমাধান করে দেয়ার বিধান ছিল না যেমনটি রয়েছে বর্তমান জামানার বড় বড় মাদ্রাসাগুলোতে সাধারণভাবে। এগুলোতে উস্তাদ বিশদভাবে তাকরীর বা ভাষণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করে থাকেন। কঠিন কঠিন শব্দের বা জটিল বাক্যের অর্থ উদ্ধার সমস্যা সমাধানের সকল দায়দায়িত্ব বর্তায় উস্তাদের উপর। শিক্ষার্থিগণ নিছক শ্রোতা ও দর্শকরূপে বিরাজমান থাকেন। মাওলানার ওখানে ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিতাব পড়ে মর্ম উদ্ধার করে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী হয়ে আসা ছিল শিক্ষার্থীদের কাজ। একান্তই কোথাও যদি শিক্ষার্থী অপারগ হয়ে যান হাশিয়া[৫] ব্যাখ্যা পড়েও কিছু বুঝে উঠতে সমর্থ না হন তবেই কেবল উস্তাদ তাকে সাহায্য করবেন। এ জন্যে তাঁর এখানে কিতাব আক্ষরিকভাবে খতম করার পরিবর্তে তার প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান প্রদানে এবং কিতাব অধ্যয়নের যোগ্যতা সৃষ্টির উপরই বেশি জোর ছিল। আর যখন তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যেতেন যে, শিক্ষার্থী এখন নিজে নিজে অধ্যয়ন করেই মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ এবং বিষয়গুলো বুঝে নিতে সক্ষম তখন আর সে কিতাবের বিসমিল্লাহ্ থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত পড়ানোকে তিনি জরুরী বিবেচনা করতেন না, বরং নতুন আর একটি কিতাব শুরু করিয়ে দিতেন।

ঐ যুগে মা'কুলাতের[৬] শিক্ষক হিসাবে মাওলানা মাজিদ আলী সাহেবের খুবই খ্যাতি ছিল। তিনি মা'কুলাতের শিক্ষা পেয়েছিলেন খায়রাবাদের বিখ্যাত মা'কুলাত বিশেষজ্ঞ উস্তাদদের কাছে অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করে। তাঁর সাধনাই ছিল মা'কুলাতের শিক্ষাদান। দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা মানতিক ও দর্শনের উচ্চ পর্যায়ের কিতাবাদি তাঁর কাছে পড়বার জন্যে আলীগড় জেলার মিণ্ডু প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সমবেত হতো। মাওলানা মাজিদ আলী সাহেব হাদীছ পড়েছিলেন হযরত

গাঙ্গুহীর কাছে। হাদীছের সে দরসে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া তাঁর সমপাঠী ছিলেন। তাঁদের দু'জনের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সুবাদে এবং শায়খের অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতা লক্ষ্য করে তিনি মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবকে বলেছিলেন, "যাকারিয়াকে এক বছরের জন্যে আমার কাছে দিয়ে দিন, আমি মা'কুলাতের সমস্ত কিতাব সম্পন্ন করিয়ে দেবো।" তিনি আরও বলেছিলেন ঃ "আমি আশা করি, বুখারী শরীফও সে আমার কাছে পড়তে চাইবে।" কিন্তু সে সুযোগ আর আসেনি। বিদ্যাভ্যাসের জন্য শায়খকে সাহারানপুর ছেড়ে আর কোথাও যেতে হয়নি।

শিক্ষায় মনোযোগ

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব তা'লীম থেকে তারবিয়াতের তথা শিক্ষা থেকে দীক্ষা ও চরিত্র গঠনের জোর দিতেন বেশী।[৭] তাঁর এখানে পড়াশুনা ও পরিশ্রমের দিকে ততটুকু লক্ষ্য না রেখে লক্ষ্য রাখা হতো যেন শায়খ কোন ছেলেপিলে সহাধ্যায়ী বা কোন কিশোর বা যুবকের সাথে খুব বেশী মেলামেশা না করেন এবং অন্তরঙ্গ হয়ে না উঠেন। এ ব্যাপারে তাঁর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হতো যেন তিনি কারো সাথে হাসিখুশী গালগল্প না করেন বা কোন সমপাঠী বা পাড়ার কোন ছেলের সাথে খায়খাতির জমিয়ে না তোলেন। পথ চলার সময় কেউ যদি তাঁকে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সালাম করতো বা একাধিক নামাযের জামাআতে কোন সমবয়স্ক বা কিশোর তাঁর পাশাপাশি দাঁড়াতো, তবে তার জন্যেও তাঁকে জবাবদিহি করতে হতো এবং সতর্ক করে দেয়া হতো। সে জন্যে শায়খও সে ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং একান্তই নিরিবিলি নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের সতর্কতা এত বেশী ছিল যে, তাঁর নিজের বা মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সঙ্গে ছাড়া একাকী মাদ্রাসার বাইরে যাওয়ার বা কোন মজলিসে অংশগ্রহণের অনুমতি পর্যন্ত ছিল না। ফলে, কোনদিন তাঁর মনে বাইরে বেড়ানোর আগ্রহই সৃষ্টি হয়নি এবং এভাবে থাকাটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সাহারানপুরে কত বড় বড় উৎসব হতো, কিন্তু পিতার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তিনি সেগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন না। এই নির্জনপ্রিয়তা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, একবার পুরাতন মাদ্রাসাভবন থেকে ছয় মাসের মধ্যেও তার বাইরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয়নি।[৮]

হাদীছ শিক্ষার সূচনা

অবশেষে সেই মুবারক দিন, সেই শুভ মুহূর্তটি উপস্থিত হলো যখন সেই ইল্‌ম শিক্ষার শুভ উদ্বোধন হলো–যার সাথে সারাটি জীবন গ্রথিত ছিল এবং যে ইলমের খেদমতই ছিল তাঁর ললাটলিপি–যার সাথে সম্বন্ধযুক্ত পরিচিতি তাঁর আসল নামকেও ছাপিয়ে দেয় এবং "শায়খুল হাদীছ" নামই তাঁর স্ব–নামের বিকল্প বরং ততোধিক বিখ্যাত হয়ে যায়। সেদিন হাদীছ শাস্ত্রের সেবকবৃন্দ, তার ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকগণের নামের তালিকায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছিলো। হয়তো বা এ নবাগতের শুভাগমনে এ শাস্ত্রের নিঃস্বার্থ ত্যাগী সেবকগণের আত্মা সেদিন বেহেশতপুরীতে 'স্বাগতম' ধ্বনিও তুলেছিল।

অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সূচনা করা হয় তাঁর হাদীছ শিক্ষার। ৭ই মুহার্‌রম ১৩৩২ হিজরীর যুহরের নামাযান্তে মিশ্‌কাত শরীফ শুরু করা হয়। প্রথমে মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া সাহেব গোসল করলেন। তারপর মিশকাত শরীফের বিসমিল্লাহ্ বা শুভ উদ্বোধন করলেন। গুরুগম্ভীর খুতবা পড়লেন। তারপর কেবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'আ করতে থাকলেন। শায়খ বলেন, আব্বাজান কি কি দু'আ করেছিলেন, তা'তো জানি না, তবে আমার দু'আ ছিল একটি আর তা' হলো, হাদীছ শুরু করতে বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আল্লাহ্ না করুন, কখনো যেন এ আর হাতছাড়া না হয়।[৯]

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া সাহেব হযরত গাঙ্গুহীর এমনি এক শাগরিদ ছিলেন যে, উস্তাদ ও তাঁর জন্যে গর্ব করতেন। তাঁর গভীর অধ্যয়ন, সুতীক্ষ্ণ বোধশক্তি এবং বিশেষ বিশেষ ইল্‌মী তাহ্‌কীক–গবেষণা ছাড়াও যা' তিনি লিপিবদ্ধও করেছেন এবং তার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ ও করেছেন[১০] তিনি তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত ইল্‌মী যোগ্যতা, প্রখর মেধা, হাদীছের প্রতি ঝোঁক এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীল মনমস্তিষ্ক ও সুরুচির জন্যে–হাদীছ শিক্ষাদানের (এবং ফিক্‌হ ও হাদীছের সাযুজ্য বিধানে) বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর শাগরিদগণ তাঁর কাছে হাদীছ অধ্যয়নের পর অন্য কারো হাদীছ শিক্ষাদানের প্রতি খুব কমই আকৃষ্ট হতেন।

দাওরায়ে হাদীছ

১৩৩৩ হিজরীতে দাওরায়ে হাদীছ শুরু হয়। ঐ বছরই হযরত সাহারানপুরী দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটানোর উদ্দেশ্যে হিজায যাত্রা করেন। শায়খ মনে করতেন,

আমি তো কোন চাকুরীবাকুরীও করবো না, আমার তেমন কোন তাড়াও নেই, এক বছরের মধ্যেই দাওরায়ে হাদীছ শেষ করবার কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। তাই আপন পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের কাছে আবূ দাউদ শরীফ পড়তে শুরু করে দেন। তিরমিযী শরীফ হযরত সাহারানপুরীর প্রত্যাগমন পর্যন্ত মুলতবী রেখেছিলেন, কিন্তু অনিবার্য কারণে তিরমিযী, বুখারী এবং (ইব্ন মাজা ছাড়া) সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্যান্য কিতাব পিতার কাছেই সমাপ্ত করে নেন। সে বছরটি ছিল অত্যন্ত পরিশ্রম এ ব্যস্ততার। হাদীছের কোন রিওয়ায়েতই যাতে উযূবিহীন অবস্থায় পড়া না হয়, সেদিকেও বিশেষ খেয়াল থাকতো। পাঁচ ছয় ঘন্টা সবক চলতো। তাতে সপ্তাহ্ দশদিনের মধ্যে কচিৎই সবক চলাকালে উযূর প্রয়োজন হতো। তখন সমপাঠীরা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন যেন, তাঁর পাঠাভ্যাস থেকে কোন অংশ বাদ না পড়ে যায়। তখন তাঁরা সবক অগ্রসর হতে দিতেন না।

হযরত সাহারানপুরীর হাতে বায়আত

১৩৩৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব দীর্ঘ প্রবাস জীবন হিজাযে কাটানোর উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর কাছে বায়'আতের ধুম পড়ে যায়। শায়খ বলেন, শিশুদের মতো দেখাদেখি আমার মধ্যেও বয়'আতের আগ্রহ সৃষ্টি হলো। হযরতের কাছে তা ব্যক্ত করলে তিনি বললেনঃ মাগরিবের নামাযান্তে নফল থেকে ফারেগ হওয়ার পর এসে যেয়ো। মাওলানা আবদুল্লাহ্ গাঙ্গুহী সাহেব ইতিপূর্বেই হযরতের খিলাফত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বায়আত নবায়নের জন্য আগ্রহী ছিলেন। হযরত যথাসময়ে আমাদের দু'জনকে নিকটে ডাকলেন এবং তাঁর পবিত্র হাত দু'খানা আমাদের দু'জনের হাত দ্বারা ধরিয়ে বায়আতের কথাগুলো বলতে শুরু করলেন। মাওলানা আবদুল্লাহ্ সাহেব এ সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। হযরত তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর গলাও ধরে গেল। এ সময় মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব ও হযরত মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী ছাদের উপর বসা ছিলেন। আওয়াজ শুনে তাঁরা ছাদের কিনারে এসে ঘরের দিকে উঁকি মারলেন। শায়খ বায়আত হচ্ছেন দেখে মাওলানা বিস্ময়বোধ করলেন। পিতাকে ঘূণাক্ষরেও না জানিয়ে এতবড় একটা সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে নিলেন? হযরত রায়পুরী কিন্তু এ দুঃসাহসের প্রশংসাই করলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও করলেন।

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের ওফাত ঃ শায়খের ধৈর্য

সন্তানবৎসল কামালিয়াতধন্য পিতার ইন্তিকালের মহাবিপদ শায়খ তাঁর বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও ধৈর্যস্থৈর্য ও ঈমানী শক্তির দ্বারা কেবল যে সহ্যই করলেন, তাই নয়, বরং শোকাভিভূত খান্দান ও ঘরবাসীদের জন্য সান্ত্বনার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালেন। মৃত্যুকালে মাওলানার ঋণের পরিমাণ ছিল আট হাজার টাকা। এব্যাপারেও শায়খ বিপুল সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। পাওনাদারদেরকে চিঠি লিখিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, মরহুমের ঋণের দায়দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। সে সময় শায়খের বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। সাধারণভাবে পাওনাদারদের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁদের পাওনা বুঝি আর কোনদিনই তারা ফিরে পাবেন না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা তাদের পাওনা জোরে সোরেই তলব করতে লাগলেন। শায়খ একজনের কাছ থেকে কর্জ নিয়ে অপরের পাওনা শোধ করতেন। এ বছরটি ছিল অত্যন্ত অভাব অনটনের। মাওলানার দেনা তো দুই তিন মাসের মধ্যেই শোধ হয়ে গেল, কিন্তু শায়খ সে দেনার জালে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। '৪৪ হিজরী পর্যন্ত তাঁর উপর এ দেনার এক হাজার টাকা বাকী ছিল। উক্ত সালে শায়খ তাঁর হজ্জযাত্রার প্রাক্কালে তাঁর লাইব্রেরীর ম্যানেজার মওলবী নসীরুদ্দীনের উপর সে দেনার ভার অর্পণ করে যান।

বিদ্যার্থী হলেন বিদ্যনিষ্ট

১৩৩৪ হিজরীর যিলকাদ মাসে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের ইন্তিকালে মুহ্যমান যোগ্য সন্তান মাওলানা যাকারিয়া আবার বুখারী ও তিরমিযী শরীফ পড়বার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেই আদেশ করলেন, গড়িমসি করা চলবে না, তিরমিযী ও বুখারী শরীফ পুনরায় পড়তে হবে। শায়খ বলেন, মন চাচ্ছিল না মোটেই, কিন্তু পাশ কাটানোরও কোন উপায় ছিল না। ঠিক ঐ সময়টাতেই স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত শায়খুল হিন্দ [মওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)] বলছেন, আমার কাছে বুখারী শরীফ পড়ে নাও। দীর্ঘক্ষণ ধরে ভাবলাম, হযরত তো সুদূর মাল্টায় বন্দীজীবন যাপন করছেন। তাঁর কাছে পড়তে কোথায় যাবো? হযরত সাহারানপুরী স্বপ্ন শুনে বললেন, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, তুমি পুনরায় আমার কাছে বুখারী শরীফ পড়বে।

অবশেষে সত্যি সত্যি হযরতের কাছেই বুখারী শরীফ পড়া পুনরায় শুরু হলো। এ বছরটি ছিল চরম ব্যস্ততার। শায়খ বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, দিনরাত্রি

২৪ ঘন্টার মধ্যে দুই আড়াই ঘন্টার বেশী শোয়ার সময় হতো না। সারারাত ধরে হাদীছের ব্যাখ্যাদি পড়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পরদিন ক্লাসে গিয়ে হাযির হতাম। এ পরিশ্রম ও উদ্যম হযরতের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। তার ফলশ্রুতিতে তিনি লাভ করলেন শায়খে কামেলের ঘনিষ্টতম সান্নিধ্য ও পূর্ণ আস্থা। ফলে শায়খের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো–যাতে তাঁর পরবর্তী জীবনের সাফল্য এবং সমসাময়িকদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার আসল রহস্যটি নিহিত ছিল।

'বযলুল মজহূদ' রচনায় সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণ

হাদীছের দরস শুরু হওয়ার পর দু'মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এমন সময় একদিন সবক পড়িয়ে হযরত ছাত্রাবাস থেকে পুরাতন মাদ্রাসাভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী শায়খ তাঁর অনুগমন করছিলেন। হঠাৎ এক স্থানে দাঁড়িয়ে গিয়ে তিনি বললেন ঃ

> "আবূ দাউদের উপর কিছু লেখার আগ্রহ বহুদিনের। তিন তিন বার কাজ শুরুও করেছি, কিন্তু চরম ব্যস্ততার জন্যে অগ্রসর হতে পারিনি। হযরত গাঙ্গুহী (র.)–এর জীবদ্দশায় বারবার শুরু করেছি। মন চাইতো যে, কাজটি শেষ করি, কোথাও বাধাগ্রস্ত হলে বা জটিলতা অনুভব করলে হযরতের কাছে জেনে নিয়ে সমস্যার সমাধাম করা যাবে। তাঁর ইন্তিকালের পর সে আগ্রহে ভাটা পড়ে যায়। তারপর ভাবলাম আমাদের মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব তো আছেন। তাঁর সাথে আলোচনা করে অগ্রসর হওয়া যাবে কিন্তু তিনিও যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন সে ইচ্ছা একেবারেই ছেড়ে দেই। এখন আমি ভাবছি, তোমরা দু'জনে[১১] সাহায্য করলে তো বোধ হয়, আমার লেখার কাজটি হয়ে যেতেই পারে।"

স্বতঃস্ফূর্তভাবে শায়খ জবাব দিলেন ঃ "হযরত, কাজ শুরু করে দিন! এটা আমারই দু'আর ফল।" হযরত সাহারানপুরী তখন বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দু'আ? শায়খ বললেন, 'মিশকাত শরীফ শুরু করার দিনই আমি দু'আ করেছিলাম, হাদীছ বড় দেরীতে শুরু করলাম, হে আল্লাহ্! আর যেন জীবনে তা' হাতছাড়া না হয়।" কিন্তু এ দু'আ কবুলের কোন সম্ভাবনাই আর চোখে পড়ছিল না। কেননা, আমি ভাবছিলাম, যদি পড়াশুনা শেষ করে আমি শিক্ষকতা গ্রহণও করি

হাদীছ শরীফের শিক্ষাদানের পালা আসতে অনেক দেরী হবে। কেননা দীর্ঘকাল ধরে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের অনেকেও তো এখনো হাদীছের ক্লাস পাননি। এবার তার বাস্তব নমুনা সম্মুখে এসেছে। হযরতের শরাহ্ লেখার সময় এ দীনকে এ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। আর যখন এ কাজের পালা শেষ হয়ে যাবে তখন পর্যন্ত হয়তো আল্লাহ্‌র ফযলে হাদীছের ক্লাসই পেয়ে যাবো। এটা হচ্ছে ১৩৩৫ হিজরীর রবিউল আউয়ালের ঘটনা। এটাই কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ "বযলুল মজহূদের" রচনা শুরুর ইতিহাস।

হযরত তাৎক্ষণিকভাবে হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থের এক দীর্ঘ তালিকা আমার হাতে তুলে দিয়ে কুতুবখানা থেকে সেগুলো সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ

১. ফাযায়েলে যবানে আরবী, পৃ: ৩-৪

২. গাঙ্গুহের তখনকার বিস্তারিত অবস্থা তাযকিরাতুর রশীদ এবং "হযরত মাওলানা ইলিয়াস কে সাওয়ানেহ্" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৩. সে যুগে বুযুর্গগণ শিশুকিশোরদের চরিত্রগঠনে এমন কিছু পন্থা অবলম্বন করতেন যা' আজকের মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণের কাছে অদ্ভুত ঠেকবে-যাঁরা শিশুদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতাদান ও তাদের প্রত্যেকটি আবদার পূর্ণ করার পক্ষপাতী। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব এ ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। হযরত শায়খুল হাদীছ বলেন, আমার তের বছর বয়সকালে একদা আব্বা আমাকে কান্দেলা পাঠাবার আশ্বাস দিলে আমি এতই আনন্দিত উচ্ছ্বসিত হলাম যে, ঈদের চাঁদের অপেক্ষার মতো সেদিনের অপেক্ষায় দিন গুণতে শুরু করলাম। তা' দেখে আব্বা আমার সে সফর মুতলবী করে দিয়ে বললেন যে, কোন ব্যাপারে এতটা খুশী ও নেশাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।-আপবীতী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০

৪. তিনি বলতেন, জনৈক বিকৃত আকীদার লোক জনৈক ইংরেজের ফরমাইশে এ কিতাবটি প্রণয়ন করে। জানিনা, কেন যে আমাদের বুযুর্গগণ এমন একটি বইয়ের এত সমাদর করে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয়, (আরবী ভাষায় এত উপাদেয় ও শিক্ষণীয় কিতাবাদি থাকতেও) আমাদের আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আজো এ বইটি পাঠ্যভুক্ত রয়েছে।

৫. প্রাচীনযুগের উস্তাদগণের শিক্ষাদানের নিয়মও ছিল তাই। এ যাবৎকালের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদর্শন অনুসারে এটাই হচ্ছে শিক্ষাদানের সেরা পদ্ধতি।

৬. মাওলানা মাজিদ আলী সাহেব জৌনপুর জেলাধীন মানিকালার অধিবাসী ছিলেন। মা'কুলাত তিনি মাওলানা আবদুল হক খয়রাবাদীর কাছে এবং হাদীস গাঙ্গুহতে পড়েন। মিণ্ডু, গলাউটী এবং কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষকতা করেন। মানতিক ও উলুমে আক্‌লীয়া পড়ার জন্য শিক্ষার্থীরা দূর দূর থেকে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ঈদুল ফিতরের দিন ইন্তিকাল করেন এবং স্বগ্রামে সমাহিত হন।

৭. হযরত মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের পদ্ধতি এবং তাঁর নিজের অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নির্ভুল চিন্তাশক্তির প্রমাণসহ অনেক ঘটনা আছে। এখানে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি। শায়খের ফিকাহ্ পাঠ শুরু উপলক্ষে তিনি তাঁকে কুড়িটি টাকা দিয়ে বললেন ঃ বলতো, এ টাকা তুমি কোন্ কাজে লাগাবে? শায়খ বললেন, আমার মন চায় দেওবন্দ, সাহারানপুর, রায়পুর ও থানাভবনের মুরুব্বী চতুষ্টয়ের জন্য পাঁচ পাঁচ টাকার মিষ্টির ব্যবস্থা করি। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব খুশী মনে তা' অনুমোদন করলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ধরনের মিষ্টির কথা তুমি ভাবছো? শায়খ রকমারি মিষ্টির নাম করলেন। বললেন, লা-হাওলা। ঐ মুরুব্বীদের মধ্যে কে খাবেন তোমার এত মিষ্টি? তোমার খাতিরে সামান্য একটু মুখে দিতে পারেন, বাকী অন্যরাই খাবে। তার চাইতে বরং তুমি মিশ্রীর ব্যবস্থা করো। সারা মাস ধরে তোমার মিশ্রীর চা পান করতে করতে তাঁরা তোমাকে দু'আ দেবেন। তাই করা হলো। সাহারানপুরে মিশ্রী অন্য তিন বুযুর্গকে নগদ টাকা পাঠিয়ে দেয়া হলো। বুযুর্গগণ খুশী মনে তা কবূল ও দু'আ করেন।

৮. পুরাতন মাদ্রাসা ভবনে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই-মাদ্রাসা, লাইব্রেরী, মসজিদ, গোসলখানা, প্রশ্রাবখানা, পায়খানা সবই ছিল। পায়খানা- প্রশ্রাবখানার সম্মুখে পুরনো ছেড়া জুতাস্যাণ্ডেলও কিছু পড়ে থাকতো। এভাবে কোন কোন সময় শায়খের নিজের জুতা পরবার বা নতুন জুতা কিনার প্রয়োজনই হতো না।

হযরত শায়খ বলেন, 'একবার আমার নতুন জুতা মাদ্রাসা থেকেই কে যেন নিয়ে গেল। প্রায় ছ'মাস পর্যন্ত তারপর আর আমার জুতা ক্রয়ের কোন প্রয়োজনই দেখা দেয়নি। কেননা, ঐ সময়কালের মধ্যে আমার মাদ্রাসার বাইরে যাওয়ার দরকারই হয়নি। মাদ্রাসার মসজিদেই জুমুআ হতো এবং মাদ্রাসার বাথরুমেই পুরনো জুতা স্যাণ্ডেল দুই এক জোড়া পড়ে থাকতো। নিজেদের পুরনো জুতো স্যাণ্ডেল ওখানে দিয়ে রাখার সেই প্রথা এখনো চালু আছ। সে জন্যে কোন প্রয়োজনেই মাদ্রাসার বাইরে যেহেতু যেতে হয়নি, তাই জুতাও আর দরকার হয়নি। আল-ই'তেদাল ফী মারাতিবির রিজাল, পৃ: ৩১-৩২

৯. এ দু'আর কবুলিয়াত এতই সুস্পষ্ট যে, তা বলাই বাহুল্য ।

১০. দেখুন তিরমিযীর দরস ও তালীম সম্বলিত "আল-কাওকাবুদ দুররী এবং বুখারী শরীফের নোট "লামেউদ দেরারী"।

১১. দু'জন বলতে এখানে শায়খুল হাদীছ এবং তাঁর সহপাঠী মওলবী হাসান আহমদ মরহুমের কথা বোঝানো হয়েছে। ইনি মহল্লা খালপার, সাহারানপুরের অধিবাসী ছিলেন। অত্যন্ত মৌন প্রকৃতির, স্থির-ধীর এবং বিনয়ী ছিলেন। যৌবনেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষকতা ও পুস্তকাদি প্রণয়ন
কয়েকটি নাজুক পরীক্ষা ঃ ইজাযত ও কামালতপ্রাপ্তি

১৩৩৫ হিজরীর ১লা মুহাররম তারিখে হযরত শায়খ মাদ্রাসা মাযাহিরুল উলুমে শিক্ষকরূপে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁর বেতন নির্ধারিত হয় মাসিক পনের টাকা।[১]

প্রথম দিকে উসূলুশ শাশী (যা' ইতিপূর্বে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব পড়াতেন) এবং 'ইলমুস-সেগা' (যা' পড়াতেন মাওলানা জাফর আহমদ উছমানী) পড়ানোর দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। এ ছাড়া চার পাঁচ সবক নহু, মানতিক, ফিকাহ্ ও আরবীরও তাঁর পড়াতে হতো। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। মাদ্রাসার প্রচলিত নিয়মানুসারে বিবেচনা করলে "উসূলুশ শাশী" কিতাবটির অধ্যাপনার বয়স তখন তাঁর হয়নি। কিন্তু আপন মেধা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি নিজেকে যোগ্য শিক্ষকরূপেই প্রতিপন্ন করেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর অধ্যাপনায় এতই মুগ্ধ হয় যে ইতিপূর্বে পড়া সবকগুলিও তাঁরা পুনর্বার তাঁরা কাছে পড়বার আগ্রহ প্রকাশ করে।

শাওয়াল ১৩৩৫ হিজরীতে যে নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা হয়, তাতে তাঁর উপর আরও উচ্চতর পাঠ্য পুস্তকাদি পড়ানোর দায়িত্ব আরোপিত হয়। ১৩৩৬ সালে তৃতীয় বর্ষে তাঁর উপর "মাকামাতে হারীরী" ও "সাব'আ মু'আল্লাকা" পড়ানোর দায়িত্বও অর্পিত হয়। সাব'আ মু'আল্লাকা তাঁর উপর ছাড়তে কর্তৃপক্ষ অনেকটা সন্দিগ্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সেই জামাআতে এমন কিছু শিক্ষার্থীও ছিলেন যাঁরা হাদীছের কোন কোন ক্লাসে তাঁর সমপাঠী ছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই কর্তৃপক্ষ তাঁদের সন্দেহ যে অমূলক ছিল, তা' টের পেলেন। মাদ্রাসার সম্মানিত ও নিষ্ঠাবান নাযিম মাওলানা ইনায়েত ইলাহী সাহেব শায়খের সাফল্যের স্বীকারোক্তি করলেন এভাবে ঃ "মওলভী যাকারিয়া, তুমি আমার মাথা নত করে দিয়েছ।" (মূল উর্দুতে আছে ঃ আঁখে নীচী কর দি)। ১৩৩৭ সালে হিদায়া আউয়ালায়ন, হামাসা প্রভৃতি এবং ১৩৪১ হিজরীতে

যখন বুখারী শরীফের ৩ পারাও হযরত সাহারানপুরীর পুনঃপৌনিক আদেশে তাঁর উপর অর্পিত হয় এবং তাঁর অধ্যাপনায় তাঁর অনন্যসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় ও প্রমাণ বিধৃত হলো, তখন মিশকাত শরীফও তাঁর দায়িত্বে দিয়ে দেয়া হলো। ১৩৪৪ হিজরী পর্যন্ত মিশকাত শরীফ তাঁরই হাতে থাকে।

বযলুল মজহূদ রচনায় ব্যস্ততা ও হযরত সাহারানপুরীর স্নেহানুকূল্য ও আস্থা

কামিল শায়খদের নিকট থেকে উপকৃত হওয়ার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের ব্যাপারে শায়খ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন এবং তাঁর প্রিয় হবির ব্যাপারে তাঁকে প্রাণপণে সাহায্য করার বিরাট প্রভাব থাকে। বিদ্বজনরা মনে করেন, শায়খের (পীরের) আস্থা অর্জন ও প্রীতিভাজন হওয়ার এবং দ্রুত বাতিনী অগ্রগতি লাভের ব্যাপারে এর কোন বিকল্প নেই। অন্যপথে অনেক পরিশ্রম করেও এতটুকু সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ঐ সময় হযরত মাওলানা সাহারানপুরী (র) “বযলুল মজহুদ” রচনায় পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেন। তখন সে কাজটি সমাপ্ত করার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ফিকিরই তাঁকে সর্বাধিক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শায়খের সৌভাগ্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়কই বলতে হবে যে, তিনি সবকিছু ভুলে কায়মনবাক্যে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এতে তাঁর পূর্ণশক্তি নিয়োগ করেন। কিতাব রচনার পন্থাটি ছিল এরূপ-হযরত সাহারানপুরী প্রথমে হাদীছের উৎস এবং তাঁর ব্যাখ্যা কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে, তা' বলে দিতেন। শায়খ অত্যন্ত পরিশ্রম করে সেগুলো খুঁজে বের করতেন এবং হযরতের সম্মুখে উপস্থাপিত করতেন। হযরত নিজ ভাষায় নিরপেক্ষভাবে তা' লিখতেন। মুসাবিদা ও চূড়ান্ত কপি লেখার দায়িত্ব শায়খ পালন করতেন। ফলশ্রুতিতে দিন দিন উস্তাদের সাথে তাঁর নৈকট্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মানবীয় দুর্বলতা বশে তাঁর এ নৈকট্য তাঁর সেসব সমবয়সী সহকর্মী ও নবীন আলিম এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করলো যারা হযরত সাহারানপুরীর নৈকট্য কামনা করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলেন, শায়খের এ গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যস্ততা তাঁর শিক্ষকতার কাজকে বিঘ্নিত করছে, সুতরাং শিক্ষকতার দায়িত্ব যাঁর নেই বা মাদ্রাসার চাকুরী যিনি করেন না এমন কাউকে দায়িত্বটা দেয়া যেতে পারে। তাঁদের প্রস্তাবানুসারে এমন এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হলো, কিন্তু তাঁর ঘন ঘন বাড়ি যাওয়াতে এ কাজটি বিঘ্নিত হওয়ায় হযরতের খুব

কষ্ট হতো। শায়খ পুনরায় নিজেকে এ খিদমতের জন্যে পেশ করলে হযরতের কাছে তা' সাদরেই গৃহীত হলো। আর একবার অপেক্ষাকৃত সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী আর একজনকে নিয়োগ করা হয়, কিন্তু কপিকার জানালেন, শায়খের হস্তাক্ষর নকল করাই তাঁর কাছে সহজতর, কেননা, নোক্‌তা প্রভৃতির সবিশেষ খেয়াল রাখায় শায়খের হস্তলিপিই অধিকতর সহজবোধ্য ও নির্ভুল থাকে। এভাবে এ খিদমত পুনরায় ঘুরে ফিরে তাঁরই উপর অর্পিত হয়।

শায়খ পুস্তক প্রণয়নের এ দীর্ঘ কালটা অপরিহার্য কোন ওযর ছাড়া বাইরে যাতায়াত বা কাজের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যাবতীয় ব্যস্ততা পরিহার করে চলেন। সফর বা বাইরে যাতায়াতের তেমন অভ্যাস তাঁর পূর্বেও খুবই কম ছিল, এবার যেন তিনি একেবারে পায়ে জিঞ্জিরাবদ্ধ হয়ে গেলেন। কোন এক সময় কোন কোন বুযুর্গের পুনঃপৌণিক অনুরোধে সফরে হযরতের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে পড়লেও সুযোগ পেলেই তিনি হযরতকে সফরের দ্বারা "বযলুল মজহূদের" কাজ বিঘ্নিত হবে এই ওযরের কথা বলে হযরতের অনুমতি নিয়ে পথের কোন ষ্টেশন থেকেই ফিরে চলে আসলেন। হযরতও সানন্দে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

"বযলুল মজহূদ" মুদ্রণের পর্ব যখন শুরু হলো, তখন প্রথমে মীরাটে তা' ছাপার কাজ শুরু করা হয়। তারপর থানাভবনে মাওলানা শিব্বীর আলী সাহেবের প্রেসে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন শায়খ প্রতি বৃহস্পতিবার থানাভবন চলে যেতেন এবং শনিবার সকালে ফিরে আসতেন। এ সফর প্রতি সপ্তাহে অথবা পনের দিনে একবার হতো। তার মধ্যেও যখন রোববারে প্রেস ছুটি না থাকতো তখন সেখানে আরও এক আধ দিন বেশী থাকতে হতো। দীর্ঘকাল ধরে এভাবে চলে। তারপর ১৩৪২ থেকে ১৩৪৪ হিজরী পর্যন্ত দিল্লীর হিন্দুস্থানী প্রেসে মুদ্রণ কাজ চলতে থাকে। সে সময় অধিকাংশ সময় সাপ্তাহিক একবার আবার কখনো কখনো পাক্ষিক একবার তাঁকে দিল্লী যেতে হতো। শুক্রবার রাত বারটার গাড়িতে রওয়ানা হতেন। রাত বারটা পর্যন্তই তিনি তাঁর কাজে নিমগ্ন থাকতেন, তারপর একাকী পায়ে হেঁটে ষ্টেশনের দিকে ছুটতেন। বযলুল মজহূদের পাণ্ডুলিপি বুকে চেপে শুয়ে পড়তেন। দিল্লী ষ্টেশনে গাড়ি পৌছতেই সোজা গিয়ে প্রেসে উঠতেন। সন্ধ্যায় প্রেস বন্ধ হয়ে গেলে শায়খ রশীদ আহমদ মরহুমের বাসায় গিয়ে উঠতেন এবং পরদিন রোববার রাত্রে দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে একটা বাজে সাহারানপুরে গিয়ে পৌছতেন। দু' তিন বছর পর্যন্ত তাঁর এভাবে কাটে। শায়খ বলেন ঃ সাধারণতঃ রোববারে প্রেস

ছুটি থাকতো। কিন্তু হিন্দুস্থানী প্রেসের স্বত্বাধিকারী হিন্দু ভদ্রলোকটি এ অধমকে আশাতিরিক্ত খাতির করতেন। কখনো কখনো আমার কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি দু'তিনটি মেশিনে অভারটাইম করিয়ে প্রেস চালু রাখতেন। তখন রোববারের পরিবর্তে মঙ্গলবারে ফিরতে হতো। শামায়েলে তিরমিযীর অনুবাদ "খাসায়েলে নববী" এ সময়ই দিল্লীতে বসে লেখা হয়। যখন দিল্লী যেতাম তখন প্রেসের নিকটবর্তী হাজী মুহাম্মদ উছমান মরহুমের দোকান থেকে এই পাতাগুলি উঠিয়ে নিতাম এবং প্রুফ দেখে যে সময়টা বাঁচতো এক আধ পৃষ্ঠা তরজমা করে তার দোকানেই রেখে দিয়ে আসতাম। অন্যকথায় বলা যায়, এ পুরোটা কাজ সফরের অবস্থায়ই করা হয়েছে। অবশ্য ছাপার সময় কিছুটা পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়।

শুভ বিবাহ

পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের ইন্তিকালের অব্যবহিত পরে শায়খের আম্মাজানের জ্বর শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা' টাইফয়েডে রূপান্তরিত হয়। তিনি তাঁর স্বামীর ইন্তিকালের পর থেকেই শায়খের বিয়ের জন্য খুব তাগিদ দিচ্ছিলেন। তিনি বল্তেন "আমি খুব শীগগির বিদায় হতে যাচ্ছি, আমার মনটা চায় যে, তোমার ঘরটা যেন তালাবদ্ধ না থাকে। শায়খের প্রস্তাব ছিল মাওলানা রউফুল হাসানের কন্যা বিবি আমাতুল মতীনের জন্য। তিনি তাঁর সে আগ্রহের কথা হযরত সাহারানপুরীর কাছে ব্যক্ত করেন। তিনি কান্দেলায় লিখে পাঠান যে, আমার মতে প্রিয় মাওলানা যাকারিয়ার বিবাহ অবিলম্বে হয়ে যাওয়া উচিত।[২] জবাবে কনে পক্ষ থেকে লেখা হলো, "আমরা প্রস্তুত, যখন ইচ্ছা আপনারা তাশরীফ নিয়ে আসুন!" আর কালবিলম্ব না করেই হযরত কয়েকজন সাথীসহ কান্দেলায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর শায়খ তাঁর অভিমত জানিয়ে দিলেন, কান্দেলা তো আমার মাতৃভূমিই। রুখসতী করিয়ে কনে উঠিয়ে নেবার কোনই প্রয়োজন নেই। আমি দু'তিন দিন কান্দেলায় যাপন করে চলে আসবো। কনে পক্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাতেই খুশীই হয়েছিলেন। কিন্তু হযরতের কানে এ কথা পৌছতেই বললেন ঃ সে নিয়ে যাবার কে? পিতা হয়ে তো আমি এসেছি।[৩] কনেকে আগামীকালই আমার সাথে চলে যেতে হবে। সে অনুসারে পরদিনই রুখসতী করে দিতে হলো। তাঁরা সকলে সাহারানপুরে ফিরে এলেন। ২৭ রমযান, ১৩৩৫

হিজরীতে শায়খের স্নেহময়ী আম্মা ইন্তিকাল করলেন। হযরত সাহারানপুরী তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন।

দ্বিতীয় বিবাহ

শায়খের প্রথমা সহধর্মিণী ১৩৫৫ হিজরীর ৫ই যিলহাজ্জ মুতাবিক ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ ইং তারিখে ইন্তিকাল করলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি অত্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েন। মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আর বিবাহ-শাদী করবেন না।[৪, ৫ ও ৬] ইল্‌মে দীনের খেদমত ও কিতাবাদি রচনায়ই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু ভাতিজাবৎসল চাচা-যিনি তখন তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন-কোনমতেই তাঁর একাকী জীবন যাপন পসন্দ করলেন না। অন্যান্য মুরুব্বীও এ ব্যাপারে তাঁর চাচার মতের সমর্থক ছিলেন। শায়খের ঘর পুনরায় আবাদ হোক, এটাই ছিল সকলের মনের আকাঙ্ক্ষা। তাই চার মাস অতিবাহিত হতে না হতেই হযরত শায়খের দ্বিতীয় বিবাহ হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের কন্যা (মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের বোন) আতিয়া বেগমের সাথে ৮ই রবিউস সানী ১৩৫৬ হিজরী মুতাবিক ১৮ই জুন ১৯৩৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হলো। এ বিবাহ দিল্লীর নিজামুদ্দীনে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা আবদুল কাদির সাহেব রায়পুরীও এ বিবাহ অনুষ্ঠানে শরীক হন। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) যখন সাহারানপুর ষ্টেশন থেকে এ বিবাহ অনুষ্ঠানের খবর পেলেন, তখন লোক মারফত বলে পাঠালেন যে, আমিই বিবাহ পড়াবো। সে অনুসারে তিনি দিল্লী পৌঁছলেন এবং জুমু'আর নামাযান্তে যথারীতি বিবাহ পড়িয়ে দিলেন।

প্রথম হজ্জ

১৩৩৮ হিজরীতে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী পুনরায় হজ্জ করতে মনস্থ করেন। শায়খের এখন স্মরণ নেই যে, ঐ সময় তাঁর নিজের উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল কিনা, তবে বায়তুল্লাহ্ শরীফে উপস্থিতির প্রবল আগ্রহ এবং আপন পীর ও মুর্শিদের সাহচর্য লাভের উদ্দেশ্যে তিনিও তার সঙ্গী হলেন। এটা ছিল শায়খের প্রথম হজ্জ। ১৩৩৮ হিজরীর শাবান মাসের এক শুভ দিনে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। হযরত বোম্বাইতে ঘোষণা করিয়ে দেন যে, হজ্জের সফরে যার যার সাথে সুবিধা হয় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে নেবেন। শায়খুল হাদীছ সাহেব হযরতের

ম্যানেজার মওলবী মকবুল সাহেবের অনুমতি নিয়ে হযরতের সাথেই তাঁর নিজের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রাখলেন। হযরতও সানন্দে তার অনুমতি দান করলেন। শায়খ কোন প্রকার হিসাব নিকাশ ব্যতিরেকেই তাঁর খরচের সম্পূর্ণ টাকা মওলবী মকবুল সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। তাঁদের জাহাজে অবস্থানকালেই রমযান মাস শুরু হয়ে গেল। তারাবীর ব্যবস্থা করা হলো। হযরত এবং শায়খ উভয়েই তারাবীতে কুরআন শরীফ শুনাতেন অর্থাৎ তারাবীর নামাযের ইমামতি করতেন। তাঁরা মক্কা শরীফে গিয়ে পৌছতেই মাওলানা মুহিব্বুদ্দীন সাহেব[৭] শীঘ্রই তাঁদেরকে হিন্দুস্তান ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বললেন ঃ এখানে শ্রীঘ্রই প্রলয়কাণ্ড সংঘটিত হতে যাচ্ছে।[৮]

রমযানুল মুবারকে শায়খের অভ্যাস ছিল এই যে, তারাবীর নামাযের পর প্রতিদিন ইহ্‌রামের চাদরগুলি নিয়ে কয়েকজন সঙ্গীসহ পায়ে হেঁটে তানঈম চলে যেতেন। এভাবে সারারাত তিনি উমরা করে কাটিয়ে দিতেন। সে সময় হিজাযে ভীষণ অশান্তি বিরাজ করছিল। কাফেলা লুট হয়ে যেতো। হাজীরা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে মদীনা তাইয়্যেবায় পৌছতেন। শাওয়াল মাস উপস্থিত হলে হযরত ফরমালেন, আমি তো বেশ কয়েকবার মদীনা তাইয়্যেবায় হাযিরা দিয়েছি, জানি না পরে আর তোমরা তথায় হাযির হতে পারবে কিনা! সুতরাং মদীনা তাইয়্যেবার যিয়ারত করে আস! শায়খকে "আল আইম্মাতু মিনাল কুরায়শ" বলে কাফেলার আমীর বানিয়ে দিলেন। আল্লাহ্‌র ফযল ও করমে নির্বিঘ্নে পথ অতিক্রম করে তাঁরা মদীনা শরীফ গিয়ে উপনীত হন। সফরসাথীগণ ও আরব উট চালকগণ শায়খের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ও প্রীত ছিলেন। তাঁরা অনেক খেদমত করেন। মদীনা তাইয়্যেবায় তাঁদের কেবল তিন দিনই অবস্থানের কথা ছিল। কিন্তু অদৃশ্য কারণে তাঁদের দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত তথায় অবস্থান করতে হয়। সেকালে নির্দিষ্ট মেয়াদের বাড়তি মদীনায় অবস্থানের জন্য দৈনিক এক গিনি হিসাবে কর দিতে হতো। কিন্তু তাঁদের অবস্থান কেবল করমুক্তই ছিল না বরং মদীনার আমীরের এজন্য ওযরখাহীও করতে হয়। এ সফরে আরো অনেক গায়েবী মদদ ও অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল–যা' শায়খ পরবর্তীকালে অত্যন্ত আবেগের সাথে বর্ণনা করতেন।

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"

ঐ সময়েই ('৩৮–'৩৯ হিঃ) হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব

"আলীজান" লাইব্রেরীতে "মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক"-এর একখানা হস্তলিখিত কপি দেখে মাদ্রাসা মাযাহিরুল উলূমের জন্য তা' কিনতে আগ্রহী হন। তারা দাম হাঁকলো পূর্ণ একশ' গিনি। অগত্যা হযরতকে তা' কেনার আশা পরিত্যাগ করতে হয়। শায়খ বলেন, আমি আরয করলাম, হযরত! ওরা যদি অনুমতি দেয়, তবে আমরা তা' কপি করে নিতে পারি। হযরত বললেন, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদেরকে দেশের পথে পাড়ি জমাতে হবে, এত কম সময়ে কি তা' সম্ভবপর? আমি বললামঃ ইনশাআল্লাহ্ তা' সম্ভব হবে। আপনি কেবল অনুমতি নিয়ে দিন! হযরত তাঁদের কাছে তা' কপি করবার অনুমতি চাইলে তারা এত অল্প সময়ে এতবড় কিতাবের অনুলিপি তৈরী করা অসম্ভব বিবেচনা করে আনন্দেই সে অনুমতি দিয়ে দিল। আর যায় কোথায়? শায়খ কিতাবখানা নিয়ে এসে প্রথমেই তার সেলাই কেটে ফেললেন এবং নিজের জন্য বেশীর ভাগ রেখে বাকীটুকু সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে সবাই মিলে একত্রে তার অনুলিপি প্রস্তুত করার কাজে লেগে গেলেন। সকাল থেকে শুরু করে যুহরের সময় পর্যন্ত তাঁদের এ কাজ অব্যাহত গতিতে চলতো। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত হযরত ও শায়খ কপি মিলিয়ে নিতেন।[৯] দশ পনের দিনের মধ্যেই অনুলিপি প্রস্তুত করে দেশে ফিরবার পূর্ব দিন তা' বাঁধাই করিয়ে মালিককে ফিরিয়ে দিলেন।

হযরত শায়খের সৎসাহস, সহিষ্ণুতা এবং আপন পীর ও মুর্শিদের মনোবাঞ্ছা পূরণের স্বার্থে নিজের আরামকে বিসর্জন দেয়া তথা নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার কাছে পূর্ণ বিলীন করে দেয়ার এ দৃশ্য দর্শনে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব যে কতটুকু প্রীত হয়েছিলেন এবং তাঁর অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে এমন শাগরদের জন্য কত দু'আ করেছিলেন তা' বলাই বাহুল্য।

১৩৩৯ হিজরীর মুহার্‌রম মাসে তাঁরা সাহারানপুরে ফিরে আসেন।

কয়েকটি নাজুক পরীক্ষা

জীবনের প্রারম্ভ থেকেই শায়খ উপর্যুপরি এমন কিছু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন যাতে ভাল ভাল লোকদেরও পা টলে যায় এবং পাহাড়ও স্থানচ্যুত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শায়খকে সেসব পরীক্ষায়ও পাহাড়ের মতো অটল রেখেছেন। এসব মহাপরীক্ষা এবং আল্লাহ্‌প্রদত্ত তাঁর অটলতা কোন কোন সময় গোটা ভবিষ্যতের ফায়সালা করে দিতো। কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত এ বিশ্বে একটি ছোট্ট ঘটনা

অনেক সময় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং অনেক উন্নতি ও বিজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের ইন্তিকালের তৃতীয় দিনই হযরত শাহ্ মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী যিনি মরহুম মাওলানার ঋণভার ও তাঁর লাইব্রেরীর অচলাবস্থা এবং মা ও বোনের জীবিকানির্বাহের ভার এ তরুণ মাওলানার উপর বর্তায় বলে খুব ভাল করেই জানতেন–তিনি বললেনঃ এগুলো খুবই চিন্তাভাবনার ব্যাপার। তুমি এখনো তরুণ, ব্যবসায়ের কোন অভিজ্ঞতা নেই, মাওলানা আশিক এলাহী মিরাটীর ব্যবসায়ের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আছে, তুমি তোমার পৈত্রিক লাইব্রেরীটি নিয়ে মীরাটে স্থানান্তরিত করে যাও এবং মাওলানার ব্যবস্থাপনাধীনে[১০] লাইব্রেরীটি চালাও, তাতে ঋণও ইন্শাল্লাহ্ শোধ হয়ে যাবে এবং পোষ্যদের জীবি-কাও অনায়াসে নির্বাহ করা যাবে।" শায়খ বলেন, আমার খুব ভাল করেই স্মরণ আছে, তখন আমার পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। অশ্রুসজল কণ্ঠে আরয করলামঃ হযরত! এ যদি আপনার নির্দেশ হয়, তবে তা' আমার শিরোধার্য, আর যদি পরামর্শ হয়, তবে আমার কিছু বলবার আছে। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা, হযরত সাহারানপুরীর জীবদ্দশায়, আমি আর অন্য কোথাও যাবো না।[১১] জবাব শুনে হযরত রায়পুরী বললেন ঃ থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। আমার আকাঙ্ক্ষাও ঠিক তাই ছিল। কিন্তু মাওলানা আশিক এলাহী সাহেব বলেছিলেন, আমার বলায় তো কিছু হবে না, হযরত নির্দেশ দিলে হয়তো কাজ হতে পারে। জবাব শুনে হযরত রায়পুরী তাঁর জন্য অনেক দু'আ করেন।[১২]

২. শায়খের খান্দানের পুরনো ও গভীর সম্পর্ক ছিল মাদ্রাসাতুল উলূম আলীগড়ের সাথে (যা পরবর্তীকালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাতি লাভ করে।) আলীগড় আন্দোলনের পুরোধা স্যার সাইয়েদ আহ্মদ ছিলেন মাওলানা নূরুল হাসান সাহেব কান্দেলভীর শাগরিদ। তিনি তাঁর এ শাগরিদীর কথা আজীবন শ্রদ্ধা-ভরে স্মরণও করেছেন। ফলে এ খান্দানের কৃতী ছাত্ররা সর্বদাই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিংশ শতকের প্রথম দিকে মওলবী বদরুল হাসান (যিনি সাবজজ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন) ও মওলবী আলাউল হাসান(যিনি ডেপুটী ক্যালেকটরের পদে সমাসীন ছিলেন), বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও খ্যাত। শায়খের বয়সের তাঁর খান্দানের অধিকাংশ যুবকই আলীগড়ে শিক্ষালাভ করেন। মওলবী বদরুল হাসান কেবল আলীগড়ের পুরাতন ছাত্রই (old

boy) ছিলেন না, কলেজের ট্রাস্টি এবং পরিচালক বোর্ডেরও বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। শায়খের বেতন ছিল মাসিক পনের টাকা মাত্র। ভবিষ্যতে প্রমোশন যে কী হতে পারে, তাও বোধগম্যই ছিল। পিতা ইন্তিকাল করেছেন। জমিদারী ও উচ্চ সরকারী চাকুরী প্রভৃতি কারণে খান্দানের জীবনমানও বেশ উঁচু ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে মওলবী বদরুল হাসান সাহেব তাঁর মঙ্গলকামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঠিক করেছিলেন, শায়খের মেধা ও আরবী সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ দখলের কথা খান্দানের লোকদের মধ্যে সর্বজনবিদিত ছিল, এমতাবস্থায় তিনি প্রাইভেটভাবে প্রাচ্যবিদ্যার এবং তারপর তাঁর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়ে দেবেন। তারপর কলেজের তিনশ' টাকা মাসিক বেতনের চাকুরী আর ঠেকায় কে? পরিবারের মুরুব্বীদের এব্যাপারে কেবল সম্মতিই যে ছিল তা-ই নয়, বরং তাঁদের পক্ষ থেকে এর তাগিদও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু শায়খ তাঁদের সম্ভ্রম রক্ষা করে শক্তভাবে তার বিরোধিতা করেন। কেউ কেউ এতে অসন্তুষ্টও হন। কিন্তু শায়খ সেদিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে বলেন ঃ রিযিক তো আল্লাহ্‌র হাতে। তার স্বল্পতা বা প্রাচুর্য্য সম্পূর্ণ তাকদীরের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ যদি প্রশস্ত রিযিক দিতেই চান তবে এখানে বসিয়ে বসিয়েই তা তিনি দান করতে পারেন, অন্যথায় হাজার প্রয়াসের পরও তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। শায়খের এ জবাব শুনে শায়খকে বুঝানোর জন্য আগত বংশের একজন অভিভাবক মাওলানা শামসুল হাসান অত্যন্ত প্রীত হন এবং শায়খকে তাঁর এ স্থির বিশ্বাসের জন্য সাধুবাদ জানান।[১৩]

তার চেয়েও কঠিন পরীক্ষা এলো আরও কয়েকদিন পর। কর্নালে নবাব আযমত আলী খান মুযেফফর জংগ ওয়াক্‌ফ স্টেটের পক্ষ থেকে একটা বড় তাবলীগী দারুল উলুম (মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের প্রচার প্রসার এবং তার সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সর্বোপরি আধুনিক মানসে ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্ট ধুম্রজাল ছিন্ন করা এবং বিরুদ্ধবাদীদের জবাব দেবার জন্য এমন কিছু জ্ঞানীগুণী সৃষ্টি করা যারা একাধারে আরবী ও ইংরেজী ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী হবেন। এ জন্যে তাঁরা পরিকল্পনা নেন যে, স্বীকৃত আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাশ করা আলিমগণকে ইংরেজী এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ মেধাবী ছাত্রদেরকে আরবী শিখাতে হবে। মাওলানা স্যার রহীম বখশ সাহেব মরহুম-যিনি ভাওয়ালপুর রাজ্যের সদর কাউন্সিল এবং রিজেন্ট ছিলেন —এ আন্দোলনের একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। গাঙ্গুহ্, রায়পুর ও সাহারানপুরের

সাথে তাঁর ভক্তসুলভ আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। আবার মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসারও তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হাদীছের প্রাথমিক শিক্ষকরূপে তিনি শায়খকে মনে মনে নির্বাচিত করেন এবং এ উদ্দেশ্যে স্বয়ং সাহারানপুর আগমন করেন।[১৪] সাধারণভাবে দেয় বেতন তিন শ' টাকা ছাড়াও তিনি সম্ভাব্য অপর সকল সুবিধা প্রদানেরও আশ্বাস দিলেন। যেমন রমযানের ছুটি হযরতের খিদমতে অবস্থানের জন্য বার্ষিক তিন মাস বেতনসহ ছুটি, ভোগ্য দ্রব্যাদি সহজে প্রাপ্তি ইত্যাদি। তবে এ সবের উপরে একটি শর্তও ছিল যে, তিনিই যে এ প্রস্তাব নিজে দিয়েছেন তা যেন হযরতের কাছে ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ করা না হয় ; কেননা, মাযাহিরুল উলুমের এক-জন পৃষ্ঠপোষকের পক্ষে একই মাদ্রাসার কোন শিক্ষককে অন্যত্র যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করা কোনমতেই শোভনীয় বিবেচিত হতো না। তিনি শায়খকে একথাও শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সরাসরি মাদ্রাসা থেকে বিদায় না চেয়ে দু'এক বছরের দীর্ঘ ছুটি নিয়ে নাও এবং ওযরস্বরূপ বল যে, ঋণের ভারী বোঝা রয়েছে, বিবাহ শাদীও করেছি, সন্তানাদিও আছে, এমতাবস্থায় মাদ্রাসার এ স্বল্প বেতনে কোনমতেই চলছে না।

ঐ সময় শায়খের বেতন কুড়ি টাকায় উন্নীত হয়েছিল। মাওলানা স্যার রহীম বখশ সাহেবের সাথে সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাঁর অভিভাবক ও মুরুব্বীসুলভ দাবী, তাঁর আন্তরিকতা, ঋণের বোঝা, মাদ্রাসার বেতনের স্বল্পতা এবং পদোন্নতির সম্ভাবনার অনুপস্থিতি এ সবই যথার্থ ছিল—যার প্রেক্ষিতে যাঁরা এ সম্ভাবনাময় লোভনীয় চাকুরীটি গ্রহণের জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করছিলেন, তাঁরা তাঁদের পক্ষে শরঈ, ইল্‌মী এবং নৈতিক যুক্তিপ্রমাণও তাঁর সম্মুখে তুলে ধরছিলেন।

মেধামণ্ডিত, হাদীছ ও আরবী সাহিত্যে দক্ষতার জন্য খ্যাতিমান একজন নবীন আলিমের জন্য এ ছিল এক মহা অগ্নিপরীক্ষা। শায়খ তখন প্রকৃতপক্ষে উভয় সংকটে ভুগছিলেন। তিনি যদি তখন সেসব যুক্তিতে সাড়া দিয়ে সে লোভনীয় চাকুরীটি গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তবে তাঁর জীবনের চিত্র হতো অন্যরূপ, হয় তো বা আজ তাঁর এ জীবনী গ্রন্থ লেখার কোনই প্রয়োজন হতো না। দীর্ঘকাল পূর্বেই সে স্কীম ব্যর্থ হয়ে যায়। মাদ্রাসার নামানিশানাটুকুও আজ আর অবশিষ্ট নেই। তার সুযোগ্য শিক্ষকগণের অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন, অন্যরা কে কোথায় কিভাবে জীবনের অন্তিম দিনগুলো অতিবাহিত করছেন, তা' সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

বাহ্যিক কার্যকারণ চিন্তা করলে শায়খের অবস্থাও যে তার চাইতে ভিন্নতর হতো, তা' মনে করবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সে কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক দান করেছিলেন। "শায়খুল হাদীছ" নামে কালে সর্বজনমান্য হওয়া, ইল্‌মে হাদীছের খিদমত, ইল্‌মে দ্বীনের পিপাসু শিক্ষার্থীদের তরবিয়ত, এক বিশ্বব্যাপী দ্বীনী আন্দোলনের (তাবলীগের) পৃষ্ঠপোষকতা এবং যুগবিখ্যাত পীর-মাশায়েখের স্থলাভিষিক্তরূপে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ খিদমত যাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল, তাঁর পক্ষে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কী করে সম্ভবপর হতো? স্বয়ং শায়খের ভাষায় শুনুন! তিনি বলেন ঃ

"এ অধম তখন মাওলানা মরহুমকে বিনীতভাবে বললো ঃ আমার প্রতি আপনার অসামান্য দান ও অনুগ্রহ রয়েছে। সেগুলোর কথা চিন্তা করলে আপনার কোন প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে ওযরখাহী করা অত্যন্ত অশোভনীয়। এতসব সত্ত্বেও আপনি নিজেই তো বলছেন, আমি যেন হযরতের নিকট থেকে অনুমতি নেই। কিন্তু আপনার সরাসরি বলায় যদি স্বয়ং হযরতও আমাকে এ প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আদেশ করেন, তবুও আমি সোজা বল্‌বো, হযরত মাফ করবেন, এ আদেশ পালনে আমি সম্পূর্ণ অপারগ।"

তাঁর সেদিনের সে জবাব শুনে মাওলানা রহীম বখশ মরহুম এতটুকুও মনঃক্ষুণ্ন হননি। বরং তিনি তাঁর এ জবাবের উপযুক্ত সম্মান করেছিলেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন ঃ তোমার প্রতি আমার উঁচু ধারণা তো পূর্বেই ছিল, আজ এ জবাব শুনে তা' আরো পাকাপোক্ত হলো।

৪. ১৩৪৬ হিজরীতে শায়খ যখন দাওরায়ে হাদীছের ক্লাসসমূহে পাঠদানরত, বিশেষতঃ কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে আবু দাউদ শরীফের দরস দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত দায়েরাতুল মাআরিফ (বিশ্বকোষ)-এর সংশোধনী বিভাগে কর্মরত তাঁর এক শাগরিদ মওলবী আদিল কুদ্দুসী গাঙ্গুহীর এক দীর্ঘ পত্র এলো। তাতে সে শাগরিদটি লিখেছিলেন, উক্ত বিশ্বকোষ প্রকল্পের পক্ষ থেকে বায়হাকী শরীফের আসমাউর রিজাল (মুহাদ্দিসীন পরিচিতি) স্বতন্ত্রভাবে রচনার একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। সে বোর্ডের নযর এজন্যে দু'জন কৃতী আলিমের উপর পড়েছে। তাঁর একজন হচ্ছেন মাওলানা আন্‌ওর শাহ্ সাহেব আর অপর জন আপনি। কাজটি যেহেতু পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং দীর্ঘ দিন ধরে করতে

হবে এজন্যে বেশ পরিশ্রমী এবং শক্তসমর্থ নবীন আলিমই এ জন্যে অগ্রাধিকার লাভের অধিকারী। এ জন্যে দায়েরাতুল মা'আরিফ কর্তৃপক্ষের ঝোঁক আপনার দিকেই বেশী। মাসিক বেতন আটশ' টাকা। সরকারী গাড়ি দেয়া হবে। বাসস্থানও দেয়া হবে। কাজ কেবল দৈনিক চার ঘন্টা করতে হবে। দিনের অবশিষ্ট সময় আপনি স্বাধীনভাবে কাটাতে পারবেন। বিখ্যাত "কুতুবখানা আসাফিয়ায়" পড়াশুনা করার দুর্লভ সুযোগটি পাবেন। (উল্লেখ্য, শায়খ তখন তাঁর বিখ্যাত "আওজাযুল মাসালিক" গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁর জন্যে কোন বড় পাঠাগারের সাহায্য লাভ একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল) এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে একাধিক নৈতিক, অর্থনৈতিক ও ইল্‌মী প্রলোভন ছিল–প্রত্যেকটার পিছনে মস্ত বড় যুক্তি ছিল, এতদসত্ত্বেও শায়খ বিষয়টিকে বিবেচনা যোগ্য বলেও গ্রাহ্য করেননি। বরং জবাবে সাথে সাথেই একটা কার্ড লিখলেন, যাতে কেবল এ পংক্তিটি ছিল ঃ

مجھ کو جینا ہی نہیں بندہ احسان ہو کر

অর্থাৎ "কারো দয়ার দাস নিয়ে যে
চাহিনা বাঁচিতে এই ভুবনে।"

নীচে তাঁর স্বাক্ষর ছিল।[১৫]

৫. তার চাইতেও বড় পরীক্ষা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। চট্টগ্রাম অথবা ঢাকার[১৬] মাদ্রাসা আলীয়া থেকে "শায়খুল হাদীছ" পদের জন্য তাঁর নামে প্রস্তাব আস্‌লো। বেতন ছিল মাসিক বার শ' টাকা। পড়াতে হবে কেবল তিরমিযী শরীফ ও বুখারী শরীফ। প্রথমে চিঠি আসলো। তারপর জরুরী তারবার্তা। তারবার্তায় জানানো হলো ঃ পত্রের জবাবের অধীর প্রতীক্ষায় সময় কাটছে। শীগগির জবাব দিন।" শায়খ বলেন ঃ তারবার্তার জবাবে কেবল অক্ষমতার কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম। পত্রের জবাবে বিস্তারিত লিখলাম ঃ যে বন্ধুবান্ধবগণ, আপনার কাছে আমার নাম প্রস্তাব করেছেন, তাঁরা কেবল সুধারণার ভিত্তিতে আপনাকে ভুল সংবাদ দিয়েছেন। এ অকর্মন্য আসলে এ পদের যোগ্য নয়।[১৭]

তারপর সম্ভবতঃ তাঁর জীবনে এমন কোন পরীক্ষা আর আসেনি। শায়খের উচ্চচিন্তাধারা, জীবনযাপন পদ্ধতি, আল্লাহ্‌প্রদত্ত জনপ্রিয়তা, তাঁর প্রতি বর্ষিত খোদায়ী মদদ পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছেই এমন সুবিদিত ছিল যে, তারপর তাঁকে আর এমন প্রস্তাব দানের কথা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। যৌবনে ও কর্ম–

জীবনের শুরুতেই তাঁর সুউচ্চ চিন্তাধারা ও মানসিকতা এমন সকলকে নিরাশ ও হতাশ করে দিয়েছিল এই বলে ঃ

برد ایں دام بر مرغ دگر نہ
کہ عنقا را بلند است آشیانہ

এই মোহ্‌জাল অন্য মোরগের তরে–
আন্‌কা পাখীর নীড় অনেক উপরে।

তারপর আল্লাহ্ ত'আলার সাহায্য ও স্বয়ং কুদরতী হাতে তাঁর প্রতিপালনের ব্যবস্থার আরো যখন অভিজ্ঞতা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করলেন এবং তাঁর মহব্বত ও রেযামন্দীর দ্বারা তাঁকে ধন্য করলেন, তখনকার অবস্থা আমীর খাসরুর ভাষায় ঃ

ہر دو عالم قیمت خود گفتئی
نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

বিশ্বজোড়া সবাই তাহার আপন মূল্য বাড়িয়ে বলে,
তোমার মূল্য বাড়াও ওহে এখনো যে সস্তা রইল।

৬. সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য ও সংসার–বিমুখ স্বল্পে তুষ্টির জীবন এ দু'টির মধ্যে কোন একটিকে স্বেচ্ছায় বেছে নেয়ার এ কঠিন পরীক্ষা ছাড়াও আর একটি পরীক্ষা এসেছিল তাঁর প্রথম জীবনে। সে সময়কার অবস্থা ও তাঁর বয়সের কথা চিন্তা করলে এটাও কোন ছোটখাট পরীক্ষা ছিল না। আর তা হলো, মীর্যা সুরাইয়াজাহ–এর কন্যা কায়সার জাহান বেগমের সাথে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেবের বিবাহ প্রস্তাব তিনি ও তাঁর পিতা মাওলানা ইসমাঈল সাহেব অগ্রাহ্য করে যখন নিজেদের বংশের মধ্যেই বিবাহ করলেন, তখন এ বংশের সাথে তাঁদের ভক্তি ও ঘনিষ্ঠতার জন্য তাঁরা শায়খুল হাদীছকে তাঁদের পরিবারে বিবাহ করাতে পরম আগ্রহী ছিলেন। শায়খের তাঁদের ঘরে শিশুদের মতো অবাধ যাতায়াত ছিল। সে হিসাবে তাঁদের সে আশা আকাঙক্ষা একবারে অমূলক বা অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব তা' পসন্দ করলেন না। কিন্তু তাঁদের পুনঃপুনঃ তাগিদের প্রেক্ষিতে পরীক্ষা স্বরূপ তিনি এ ব্যাপারে শায়খের মতামত জানতে চাইলেন। শায়খ বলেন, আমি আরয করলাম, "পানদান নিয়ে নিয়ে ফেরা আমার সাধ্যাতীত।" কেননা, তিনি কায়সার জাহান মরহুমার স্বামী মীর্যা শাহ্ মরহুমের এ প্রেমপ্রীতিপূর্ণ আচরণ স্বচক্ষে

দেখেছিলেন।[১৮] এভাবে তিনি সেই কঠিন পরীক্ষা ও বিড়ম্বনা থেকে বেঁচে গেলেন– যা' অমন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকদেরকে রঈস ও আমীর পরিবার সমূহের জামাইবাবু হওয়ার জন্যে প্রায়ই ভোগ করতে হয়। সে বয়সে এমন আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব তাঁর অসাধারণ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করছিল। আর তা' ছিল ফার্সী এ পংক্তিরিই ব্যাখ্যা যাতে বলা হয়েছে ঃ

بالائے سرش ز ہوش مندی
می تافت ستارہ بلندی

দ্বিতীয় হজ্জ সফর ঃ হযরতের সাহচর্য, মাদ্রাসার বেতন

১৩৪৪ হিজরীতে হযরত সাহারানপুরী হজ্জযাত্রা করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে মাদ্রাসা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয় এভাবে ঃ মাওলানা হাফিয আবদুল লতীফ সাহেবকে মাদ্রাসার নাযিম[১৯] এবং শায়খকে সদ্‌রে মুদাররিস নিযুক্ত করলেন। মাযাহিরুল উলুমের সদ্‌রে মুদাররিসের দায়িত্বের মধ্যে এটাও ছিল যে, বিভিন্ন স্থানের তাবলীগী ও দ্বীনী জলসাসমূহে, মাদ্রাসাসমূহের বার্ষিক জলসাসমূহে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সে সব জলসায়ও তাঁকে শরীক হতে হতো। শায়খ যেহেতু গোড়া থেকেই সভা সমিতিতে অভ্যস্ত ছিলেন না এবং এ দিকে তাঁর ঝোঁকও ছিল না, তাই এই গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে শুনেই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি হযরতের কাছে আরয করলেন ঃ "হযরত "বযলুল মজহূদের" কাজের কী হবে? সফরের দরুন সে কাজ তো বন্ধ হয়ে যাবে।" তিনি জবাব দিলেন ঃ "হাঁ, আমিও তো তাই ভাবছি। তখন পুনরায় আরয করলেন ঃ তা' হলে এ কাজের জন্য আমিও আপনার সাথে না হয় চলি! তখন হযরত বললেন ঃ সফরের ব্যয়ভারের কী হবে? শায়খ জবাব দিলেন ঃ "কর্জ করে নেয়া যাবে খন।" হযরত বললেন ঃ "হাঁ, তোমার বেতনও তো বেশ কয়েক মাসের বাকী আছে।" শায়খ বলেন, আমি তখন বললাম, "বেতন গ্রহণের এ চুক্তি আমি বাতিল করে দিয়েছি।" হযরত বললেন ঃ চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করা যায় না হে! আমি তো তোমার সে বাতিলকে অনুমোদন করিনি! হযরতের আদেশানুসারে শায়খ তখন তাঁর অনাদায়ী–মাসসমূহের বকেয়া বেতন আদায় করলেন।[২০] তাতে মোট অংক দাঁড়ালো ৯৪০ কি ৯৪২ টাকা। শায়খ হযরতের সে হুকুম তো তামিল করলেন এবং তাতে সফর শুরু করাটা সহজসাধ্যও হলো, কিন্তু হিজাযে পৌঁছেই এ

মর্মের ওসীয়তনামা মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিলেন যে, আমার দেশে ফেরার পূর্বেই আমার লাইব্রেরীর ম্যানেজার মওলবী নসীরুদ্দীন যেন কয়েক কিস্তিতে গৃহীত অর্থ মাদ্রাসাকে ফেরত দিয়ে দেন। সত্যি সত্যি তাই করা হয়েছিল। দেশে ফিরেই শায়খ সে টাকা–যা' পরবর্তী বর্ধিত পরিমাণ সহ মোট ২৭১৭ টাকায় দাঁড়িয়েছিল–সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দেন।

হজ্জের এই সফর এবং উস্তাদ ও মুর্শিদের সার্বক্ষণিক সাহচর্য একজন সুযোগ্য অনুগত শিষ্য ও মুরীদের জন্য–যার সফরের উদ্দেশ্যই কেবল মুর্শিদের খিদমত, সহযোগিতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ ছিল, তা' যে তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বাতিনী তরক্কী ও কামালাত অর্জনের পথে কতটুকু সহায়ক হয়েছিল, তা' সহজেই অনুমেয়। শায়খ মদীনা তাইয়্যেবায় দীর্ঘ প্রবাসকালেও হযরতের খিদমতে সর্বক্ষণ হাযির থাকা ও বযলুল মজহুদ রচনায় তাঁকে সাহায্য করা ছাড়া অন্য কোন দিকেই মনোনিবেশ করেন নি। সেই সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার জন্য মসজিদে নববীতে হাযিরী ও জান্নাতুল বাকীর যিয়ারত ছাড়া অন্য কোথাও তিনি যাতায়াতও করতে পারেননি।

বযলুল মজহুদের কাজ ছাড়া তিনি এসময় (সম্ভবতঃ মদীনা তাইয়্যেবার কথা খেয়াল করে) ইমামে দারুল হিজরত ইমাম মালিক (র)–এর মশহুর ও জনপ্রিয় কিতাব "মুআত্তা"–এর শরাহ লিখতে শুরু করেন–যা'[২১] আওজাযুল মাসালিক" নামে পরবর্তীকালে ৬ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। মক্কা শরীফে অবস্থানকালেও হযরত যদি কোন কিতাবের অনুলিপি তৈরী করা বা অন্য কোন ইল্‌মী খিদমত শায়খকে অর্পণ করতেন, তবে শায়খ সে কাজ সম্পন্ন করাকেই তাঁর একান্ত করণীয় এবং উন্নতির উপায় বলে মনে করতেন এবং কায়মনবাক্যে তাই করতেন।

ইজাযত ও রুখসত

হযরত সাহারানপুরী এবার মদীনা তাইয়্যেবা গিয়েছিলেন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য, দেশে ফিরে আসার কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বিশিষ্ট সাথীদের তা' জানা ছিল। তাঁরা বলতেন, হযরত তো এসেছেন জান্নাতুল বাকী'র মাটিতে অন্তিম শয্যায় শায়িত হতে। মাদ্রাসার শৃঙ্খলা বহাল রাখা এবং এই ফেতনার যুগে সমস্ত ফেতনা–ফাসাদ ও অনিষ্টকর প্রবণতা থেকে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে, সর্বোপরি হযরতের সাথে সংশ্লিষ্ট মুরীদানের ইরশাদ ও হিদায়েতের ধারাকে অব্যাহত রাখার

জন্যে শায়খের প্রত্যাবর্তন করাটাই ছিল যুক্তিযুক্ত। মাওলানা সাইয়েদ আহ্‌মদ মাদানী[২২] তাঁর মাদ্রাসায়ে উলুমে শারইয়ার জন্যে শায়খকে রেখে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি বারবার করে শায়খকে দেশে প্রত্যাবর্তন না করতে অনুরোধ করছিলেন এবং বলছিলেন যে, শায়খের পরিবারের অন্যদেরকে মদীনা শরীফে স্থানান্তারিত হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় ভাড়ার টাকা তিনি মাওলানা ইলিয়াস (র)–এর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু হযরত সাহারানপুরী মাযাহিরুল মাদ্রাসার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এ প্রস্তাবের পক্ষে সায় দেননি। বরং শায়খের জন্য "শায়খুল হাদীছ" উপাধি এবং মাদ্রাসার নায়েবে–নাযিম পদে নিযুক্তি পত্র লিখিতভাবে দিয়ে দেন। শায়খ এতে অনেকটা বিব্রতবোধ করেন এবং অনেক ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত হযরত মাওলানা আবদুল কাদির সাহেব রায়পুরীর মাধমে সুকৌশলে "নায়েবে–নাযিম"–এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। "শায়খুল হাদীছ" পদের জন্য হযরত তাঁর স্বহস্তে নিয়োগপত্র লিখে কিতাবের মধ্যে এমনভাবে রেখে দিলেন যেন তা' শায়খের চোখে পড়ে।

শায়খকে দেশের পথে বিদায় দেওয়ার প্রাক্কালে হযরত তাঁকে চার তরীকার বায়আত ও ইরশাদের আ'ম ইজাযত দান করেন। এ ইজাযত প্রদান পর্বটি গরুগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সমাপ্ত হয়। হযরত তাঁর নিজের পাগড়ী মাথা থেকে খুলে তা শায়খের মাথায় পরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মাওলানা সায়্যিদ আহমদ সাহেবের হাতে অর্পণ করলেন। তাঁর মাথায় মুর্শিদপ্রদত্ত পাগড়ীটি রাখা মাত্র শায়খ এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। স্বয়ং হযরত সাহারানপুরীর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে শায়খ কোন কোন মজ–লিসে বলেছেন, পাগড়ীটি মাথায় রাখার সাথে সাথে আমি অনুভব করলাম, আমার মধ্যে যেন কিসের আগমন হচ্ছে। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, এটাই বুঝি "ইন্‌তিকালে–নিসবত"–এর তাৎপর্য। শায়খ তাঁর এ ইজাযতপ্রাপ্তির ব্যাপারটাকে গোপনই রেখেছিলেন। হিন্দুস্থানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত হয়তঃ কেউ তা' টেরও পেতেন না। কিন্তু হযরত মাওলানা আবদুল কাদির সাহেব রায়পুরী তা সাধারণ্যে প্রকাশ করে দেন। এতদসত্ত্বেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত শায়খ কাউকে মুরীদ করতেন না। কিন্তু সম্মানিত চাচা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.)–এর নির্দেশে শেষ পর্যন্ত সেই সিল্‌সিলা চালু করতে হলো। সর্বপ্রথম বংশের কতিপয় মহিলা তাঁর কাছে বায়আত হওয়ার আবেদন জানালেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি তাতে অসম্মতি জানালেন। তাঁরা

এ ব্যাপারে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। হযরত মাওলানা তখন শায়খকে সম্মুখে বসিয়ে তাঁদেরকে বায়আত করাবার নির্দেশ জারী করলেন। পরম আদরসহ তিনি তাঁর নিজ আমামাও[ক] শায়খের মাথায় পরিয়ে দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর মুরীদানের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

টীকা ঃ

১. ঐ যুগের প্রাচীন মাদ্রাসাগুলোর বেতনের মাপকাঠি আজকের যুগের মাপকাঠি থেকে ভিন্নতর ছিল। বিশেষতঃ প্রাথমিক বেতন এতই কম ছিল যা আজ লোকে কল্পনাও করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ মাওলানা মঞ্জুর সাহেবের কথাই ধরা যাক–তিনি পরবর্তীকালে মাদ্রাসার একজন খ্যাতনামা শিক্ষক হয়েছিলেন। তাঁর প্রাথমিক বেতন ছিল চার টাকা মাত্র। বহুকাল পরে তাঁর বেতন বার টাকা পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিল। শায়খ বলেন, আমার পনের টাকা প্রাথমিক বেতনের জন্য অনেকেই ঈর্ষা করতেন। মাদ্রাসার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী সাহেব মুরুব্বী হিসাবে মন্তব্য করেন, পিতার ইন্তিকালের পর শায়খের উপর পারিবারিক যে বোঝা রয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য করলে, তাঁর বেতন কমপক্ষে পঁচিশ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শায়খকে তিনি বলেন, আল্লাহ্ যখন তাওফীক দিবেন তখন বেতন পরিহার করবেন। শায়খ তদনুসারে আমল করেছিলেন—যার বর্ণনা পরে আসছে।

২. তাঁর অপর কন্যাকে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব বিবাহ করেছিলেন–যিনি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের মা ছিলেন। এদিক থেকে শায়খ ও মাওলানা ইলিয়াস (র.) পরস্পরে ভায়রাভাই ছিলেন। সে স্ত্রীর গর্ভে শায়খের পাঁচটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। (১) যাকিয়া–মাওলানা ইউসুফ সাহেবের প্রথমা স্ত্রী। (২) যাকেরা–মাওলানা ইনামুল হাসানের স্ত্রী (৩) শাকেরা–মওলবী আহমদ হাসান সাহেব (ইবন হাজী মুহম্মদ মুহসীন)। (৪) রাশেদা–মাওলানা সাঈদুর রহমান (ইব্‌ন মওলবী লুৎফুর রহমান) এর স্ত্রী। মওলাবী সাঈদুর রহমানের ইন্তিকালের পর তাঁরও বিবাহ মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সাথে অনুষ্ঠিত হয়–যাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন (৫) সাজেদা–মওলবী হাফীয মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহারানপুরীর সহধর্মিণী।

৩. হযরতের পিতৃসুলভ আচরণের আর একটি ঘটনা স্বয়ং শায়খুল হাদীস লিখেছেন এভাবে ঃ জনৈক বহিরাগত ব্যক্তি সর্বক্ষণ হযরতের দরবারে আমাকে দেখে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, ইনি হযরতের সাহেবজাদা বুঝি? হযরত জবাবে বললেন ঃ "সাহেবজাদার চাইতেও বড়ো।" (ফাযায়েলে জবানে আরবী–পৃঃ ৫)

৪. তাঁর "আপবীতি" নামক আত্মচরিত্র গ্রন্থে তিনি এ সম্পর্কে লিখেন যে, মরহুমার ইন্তিকালের পর নিজের ইলমী ব্যস্ততার জন্যে মনে মনে সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, আর বিবাহশাদী করবো না, নতুবা বিঘ্ন উপস্থিত হবে—আপবীতী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭

৫. এ পক্ষের গর্ভে শায়খের সাহেবজাদা মওলবী মুহাম্মদ তাল্‌হা এবং দুই কন্যা সফিয়া ও খাদীজার জন্ম হয়।

৬. আপবীতি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬১–১৬২

৭. ইনি ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (র.)-এর খলীফা। তাঁর কাশ্‌ফের শক্তি ছিল।

৮. শরীফ হুসায়নের বিদ্রোহ এবং নাজদীদের হামলার প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

৯. আপবীতি, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৪-৩৫

ক. বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ ইমামা, অর্থ পাগড়ী, নযরুলের কল্যাণে বাংলায় শব্দটি আমামারূপেই মশহুর হয়েছে। অনুবাদক

১০. আপবীতি, পৃঃ ২৫

১১. হযরত সাহারানপুরী তখন হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তখন তাঁকে নৈনিতাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বিস্তারিত জানবার জন্য পড়ুন "হায়াতে খলীল", পৃঃ ২২১-২২

১২. উল্লেখ্য, এ সময় শায়খের বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর।

১৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আপবীতী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭-৮৯

১৪. কর্নাল মাদ্রাসার চাকুরীর প্রস্তাব সংক্রান্ত এ ঘটনাটি '৪০ হিঃ ও '৪৪, হিজরীর মধ্যকার।

১৫. আপবীতি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯-১০

১৬. এটা শায়খের সন্দেহ। তিনি ঠিক স্মরণ করতে পারছিলেন না যে, প্রস্তাবটি ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার না চট্টগ্রাম আলীয়া মাদ্রাসার।

অনুবাদকের মন্তব্য ঃ আসলে মাদ্রাসা আলীয়া সে যুগে কেবল কোলকাতা এবং সিলেটেই ছিল। ঢাকায় বা চট্টগ্রামে নয়। সম্ভবতঃ ব্যাপারটি ছিল সিলেট আলীয়া মাদ্রাসারই-যে পদে পরে দেওবন্দের সাবেক মুফতী মাওলানা সহুল উছমানী ভাগলপুরীকে নেয়া হয়েছিল। যদি তা-ই হয় তবে ঘটনাটি ১৯৩৬ সালের।

১৭. আপবীতি, পৃঃ ১০-১১।

১৮. আপবীতি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১-১২

১৯. অন্যান্য আরবী মাদ্রাসায় এ পদটিকে মুহ্‌তামিম নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

২০. চাকুরীকালীন কোন কোন মাসে শায়খ বেতন গ্রহণ করতেন আবার কোন কোন মাসে গ্রহণ করতেন না। যেসব মাসে বেতন গ্রহণ করতেন, সেগুলোও ফেরত দেবার তাঁর গোড়া থেকেই নিয়ত ছিল।

২১. শায়খ বলেন, এ কিতাব প্রণয়নের কাজ মাজার শরীফের মুখোমুখি বসে করা হতো। মদীনা শরীফের সংক্ষিপ্ত প্রবাসকালে এর যত কাজ হয়েছে হিন্দুস্তানে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে কাজ করেও তা সম্ভবপর হয়নি।

২২. মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মদনীর সর্বজ্যেষ্ঠ অগ্রজ এবং মদীনা শরীফের মাদ্রাসায়ে উলূমে শারইয়্যার প্রতিষ্ঠাতা। [মাদ্রাসাটি মসজিদে নববীর বিশেষতঃ রওজা পাকের ১০০ গজের মধ্যে অবস্থিত ছিল-যতে উপস্থিতির ও শায়খের সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অনুবাদকের হয়েছে ১৯৮১ সালে। ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয়বার হজে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, সে মাদ্রাসাটি মসজিদে নববীর ভিতরে বিলীন হয়ে গেছে ।—অনুবাদক]

চতুর্থ অধ্যায়

সাহারানপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস ঃ শিক্ষকতা ও গ্রন্থাদি রচনা ইরশাদ ও তরবিয়তঃ বিভিন্ন হজ্জ সফর ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

হিজায থেকে প্রত্যাবর্তন ও সাহারানপুরে কর্মজীবন

হিজায থেকে ফিরে শায়খুল হাদীছ কায়মনোবাক্যে মাদ্রাসায় অধ্যাপনা ও কিতাবাদি প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই আবূ দাউদ শরীফের দরসও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। 'বযলুল মজহূদ' প্রণয়নে অংশগ্রহণ এবং হযরত সাহারানপুরীর বিশেষ তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে এ কিতাবের অধ্যাপনায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। "আওজাযুল মাসালিকের" রচনাকর্মও তখন অব্যাহত গতিতে চলছিল। হযরত গাঙ্গূহী ও স্বনামধন্য পিতার গবেষণাসমৃদ্ধ রচনাদি ও তাকরীরসমূহ মুদ্রণের ব্যস্ততাও থাকতো। এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় ও তাবলীগী পুস্তকাদি–যার অধিকাংশই মুরুব্বী ও বুযুর্গদের বিশেষতঃ চাচা মাওলানা ইলিয়াস (র.)–এর আদেশ ও তাগিদে লিখিত হয়– এ পর্যায়ে রচিত হয়।

মাদ্রাসার শিক্ষকতা ও কিতাবাদি প্রণয়ন ছাড়াও মাদ্রাসা পরিচালনায় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং মাদ্রাসার নাযিম মাওলানা হাফিয আবদুল লতীফ সাহেবের[১] দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। চিন্তাসাপেক্ষ ও আলোচনা পরামর্শসাপেক্ষ ব্যাপারসমূহে অধিকাংশ সময় তাঁর মতামতই হতো চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকরী। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী, হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী, হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব কান্দেলবী, হযরত মাওলানা আশিক আহমদ মীরাটী, হযরত হাফিয ফখরুদ্দীন সাহেব পানিপথী ও শাহ মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব নগীনভী প্রমুখ মাশায়েখ ও বুযুর্গগণ তাঁর কাছে আসা–যাওয়া করতেন এবং তিনি তাঁদের সকলেরই প্রিয়,

আস্থাভাজন, পরামর্শদাতা ও অন্তরঙ্গ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যে বহুমুখী প্রতিভা, মেজাজের ভারসাম্য, এবং কারো সাথে নেই আবার সবার সাথেই আছেন–এই গুণের জন্য তাঁর সত্তা এবং বাসস্থান ছিল সকলেরই মিলনকেন্দ্র এবং বড় বড় ব্যাপার থেকে নিয়ে ছোট ছোট ব্যাপার পর্যন্ত সর্ব ব্যাপারেই তাঁর পরামর্শ ও হস্তক্ষেপ ছিল সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বাধিক কার্যকরী।

এসব ছাড়াও তাঁর সাধারণ জনপ্রিয়তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি স্বরূপ শহরস্থ তাঁর ঘরে ক্রমবর্ধমান হারে মেহমানের আগমন এবং দস্তরখানের প্রসার তথা আহার্য সংস্থানের চাপও ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে তাঁর ব্যস্ততা বেড়েই চলে। এমন কি তা' তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায়। তাঁর এ অতিথিপরায়ণতা এতই বিখ্যাত হয়ে উঠে যে, তা' অনেকের জন্যই ছিল রীতিমত এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মাদ্রাসার সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞ, নিঃস্বার্থ ও উদ্যমী নাযিম হাফিয মাওলানা আবদুল লতীফ সাহেবের ইন্তিকালের পর মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা এমন কি তার অস্তিত্বের ভারী বোঝা সবচাইতে বেশী পড়ে শায়খুল হাদীছের উপর যদিও মাদ্রাসার সাবেক সদরে–মুদাররিস হযরত মাওলানা আস্আদুল্লাহ্ সাহেব তাঁর জ্ঞান গরিমা, ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের ভিত্তিতে মাদ্রাসার প্রবীণ মাশায়েখ ও মুরুব্বীদের সত্যিকারের উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং তাঁর অস্তিত্ব মাদ্রাসার জন্য এক বিরাট নিয়ামতস্বরূপ ছিল, তবুও তাঁর ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও রোগব্যাধির ফলে মাদ্রাসা পরিচালনা ও তাঁর ছোট বড় সকল ব্যাপারে দেখাশোনায় শায়খুল হাদীছকে প্রচুর সময় দিতেই হতো এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব, সিদ্ধান্তকরী ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত প্রভাবই ছিল মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক শক্তি।

এদিকে খোদায়ী ও কুদরতী মুয়ামিলা ছিল এই যে, যে শায়খ বা মুরুব্বী আলিমই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয় তাঁরা নিজেরাই নিজেদের হিদায়েত–পিপাসু আধ্যাত্মিক শিষ্য–মুরীদানকে শায়খুল হাদীছের হাতে নিজেরাই তুলে দিয়ে যেতেন অথবা কোন গায়বী কারণে বা তাঁদের পীর মুর্শিদের যে গভীর আস্থা শায়খুল হাদীছের প্রতি তাঁরা প্রত্যক্ষ করতেন তার ভিত্তিতেই তাঁরা নিজেরাই এসে তাঁর দরবারে জড়ো হতেন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক কামালত ও বাতিনী তরক্কীর জন্য তাঁরা শায়খের দ্বারস্থ হতেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের ব্যাপার তো ছিল তাঁর ঘরেরই ব্যাপার, তাঁর পূর্বে মাওলানা আশিক এলাহী সাহেব মিরাটী, তারপর মাওলানা মাদানী, তারপর হযরত রায়পুরী এবং সর্বশেষে মাওলানা

ইউসুফ সাহেবও যখন ইন্তিকাল করলেন তখন তাঁদের অধিকাংশ মুরীদানই হযরত শায়খকে তাঁদের আধ্যাত্মিক মুরুব্বী এবং তাঁদের পীর মুর্শিদগণের উত্তরাধিকারী ও আমানতদার বলে বরণ করে নেন। বিশেষতঃ মাওলানা ইউসুফ সাহেবের ইন্তিকালের পর বিশ্বজোড়া তাবলীগী আন্দোলনের–যা ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া এবং ইউরোপ–আমেরিকায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে–তিনিই তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ান। তাবলীগের এ সিলসিলাকে অব্যাহত রাখা, যুগের সংকট ও জামানার অসংখ্য ফিতনা থেকে একে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর আকীদা–বিশ্বাস ও উসূলের হিফাযত, আন্দোলনের সরগরম কর্মীদের দ্বীনী অভিভাবকত্ব, রূহানী তারবিয়াত ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা প্রদানের সমূহ দায়িত্ব এবং নিযামুদ্দীনের বিশ্ব তাবলীগকেন্দ্র ও তাঁর পরিচালকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তায়। কাজের বিস্তৃতির সাথে সাথে এর মকবুলিয়াতও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যতই বড় বড় বুযুর্গগণ ইহধাম ত্যাগ করতে লাগলেন, ততই তাঁর এখানে তাঁদের ছেড়ে যাওয়া মুরীদানের ভিড় এবং শায়খের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকলো। দেশী–বিদেশী জামাআত ও প্রতিনিধিবর্গের আগমনের হার যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, শায়খের ব্যস্ততা ও আতিথেয়তাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কি অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, কোন অনবহিত বা নবাগত ব্যক্তি অতিথিদের এ প্রাচুর্য ও আতিথেয়তার বহর দেখলে মনে মনে ভাবতো, হয় তো বা আজ এখানে কোন বিশেষ উৎসব আছে এবং এজন্যে অতিথি আপ্যায়নের এ বিরাট আয়োজন, অথচ তাঁর এখানে এটা ছিল নিত্য–নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং তাতে নতুনত্বের কিছুই থাকতো না।

তৃতীয় হজ্জ

উপরেই বলা হয়েছে যে, সফরের সাথে তাঁর মেজাজের তেমন মিল ছিল না, বরং অনেকটা অমিলই ছিল। সফরের প্রশ্ন আসলেই তিনি অনেকটা বিব্রত বোধ করতেন। দিল্লী তো দূরের কথা সাহারানপুর থেকে রায়পুর বা দেওবন্দের সফরও তাঁর জন্যে ছিল এক বিরাট মুজাহাদা স্বরূপ। অনেক সময় সফরের প্রশ্ন উঠতেই সত্যি সত্যি তাঁর গায়ে জ্বর দেখা দিত এবং প্রায়ই সফর থেকে ফিরে বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি শারীরিক ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায় ভুগতেন। এমতাবস্থায় সফরের ব্যবস্থা যতই আরামদায়ক ও ক্লেশমুক্ত হোক না কেন, হজ্জের সফর তাঁর

পক্ষে ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অবস্থা দেখলে মনে হতো, '৪৪ হিজরীর হজ্জই বুঝি হবে তাঁর জীবনের অন্তিম হজ্জ। কিন্তু আকস্মিকভাবে গায়েব থেকেই এক ইন্তেজাম হলো। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (যিনি তখন তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব এবং যার ইঙ্গিত ইশারাকে তিনি মনের দিক থেকে কোনমতেই অগ্রাহ্য করতে পারতেন না) ১৩৮৩ হিজরীতে (১৯৬৪ ইং) এক বিরাট সংখ্যক সঙ্গীসাথী নিয়ে হজ্জযাত্রার মনস্থ করেন এবং এ সফরে শায়খের সাহচর্য কামনা করেন। তাঁর এ কামনা এতই আন্তরিক ও আবেগময় ছিল যে, তা' অগ্রাহ্য করা শায়খের পক্ষে সম্ভবপর হলো না। একদিকে সুযোগ্য অনুজের আবেগমিশ্রিত আবদার, অপরদিকে হাবীবের দুয়ারে হাযিরী হজ্জ ও যিয়ারতের সৌভাগ্য—যাঁর এশ্‌ক ও আগ্রহের অগ্নিস্ফুলিংগ অহর্নিশ বুকের ভিতর ধিক ধিক করে জ্বলতো, কবির ভাষায় ঃ

اک ڈھیر ہے یہاں راکھ کا اور آگ دبی ہے

অর্থাৎ এখানে এক ভস্মস্তূপ
আগুন জ্বলে উহার তলে—

শায়খ সফরসঙ্গী হওয়ার এ আবদার মঞ্জুর করলেন আর বিদ্যুতের বেগে এ সংবাদ গোটা উপমহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো যে, মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সাথে শায়খও এবার হজ্জে যাচ্ছেন। আর যায় কোথায়, হেরেম-প্রদীপের পতঙ্গকুল অমনি মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। শায়খের মুরীদ মু'তাকিদ এবং তাবলীগের সাথী সতীর্থের এক বিরাট জামাআত এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তৈরী হয়ে গেল। এ ছিল এক ঐতিহাসিক সফর। শায়খের স্বলিখিত আপবীতী বা আত্মকথার ৪র্থ খণ্ডে এর বিস্তারিত বিবরণ রছে।[২] এ সফরে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবসহ তিনি তায়েফও সফর করেন। ১৩৮৩ হিজরীর যিলকাদ মাসে তাঁরা সাহারানপুর থেকে যাত্রা শুরু করেন। দীর্ঘ চার মাসে পাকিস্তান হয়ে রবিউল আউয়াল মাসে সাহারানপুরে ফিরেন। ফেরার পথে করাচী, লাহোর, সারগোদা-এবং ঢডিয়াতে এক দিন দু'দিন করে তাঁরা অবস্থান করেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর সাহচর্য ও যিয়ারত থেকে বঞ্চিত পাকিস্তানী ভক্তগণ এটাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত এক নিয়ামত বলে গণ্য করলেন। কেবল পাকিস্তানের জন্য শায়খের সফরে বের হওয়া ছিল একান্তই অকল্পনীয় ব্যাপার। হজ্জের সফর উপলক্ষে সুদূরে অবস্থানকারী এ ভক্তদের ভাগ্য প্রসন্ন হলো। তাঁরা পতঙ্গকুলের মতো ছুটে আসেন। এক দিকে

মাওলানা ইউসুফ সাহেবের আকর্ষণ অপর দিকে এ অপ্রত্যাশিত নিয়ামত থেকে উপকৃত ও ফয়েযইয়াব হওয়ার দুর্বার বাসনায় হাজার হাজার ভক্ত মধ্যবর্তী ষ্টেশনসমূহে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে প্রতীক্ষারত রইলেন। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়িতে থাকা সত্ত্বেও বাইবের উত্তপ্ত লু-হাওয়াকে উপক্ষা করে-সারারাত জেগে পরম আগ্রহভরে প্রতীক্ষারত ভক্ত অনুরক্তদেরকে মুসাফাহা ও মুলাকাতের সুযোগ দান করলেন।

শায়খ বহুদিন ধরে ঢডিয়ায় পৌছে হযরত রায়পুরী (র.)-এর মাযারে ফাতিহা পড়ার এবং তথায় কিছু সময় অবস্থানের আকাঙক্ষা অন্তরে পোষণ করতেন। কোন কোন খাস মজলিসে তিনি এটাকেই তাঁর পাকিস্তান সফরের মূল আকর্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন। সারগোদায় উপস্থিতির সময় খুব গরম পড়েছিল। দু'দিকে বরফের বড় বড় শিলাখণ্ড রেখে বৈদ্যুতিক পাখা চালু রাখা হয়। ভক্তরা খরার প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করে ঢডিয়ার কর্মসূচি মূলতবী করার কথাই বারবার বলছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ঢডিয়া একান্তই একটা অজগাঁ, সেখানে না আছে বিদ্যুৎ আর বরফের কোন ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু শায়খ কোনক্রমেই তাতে সম্মত হলেন না। আল্লাহ্র কুদরত, সেখানে পৌছতেই আবহাওয়ার গতি এমনি পরিবর্তিত হয়ে গেল যে, আর কোন কিছুরই প্রয়োজন হলো না, বরং রাতের বেলা রীতিমত গায়ে কাপড় জড়িয়ে শীত নিবারণ করতে হয়। তাঁরা যতক্ষণ সেখানে ছিলেন, ততক্ষণ আবহাওয়া এমনি সুন্দর সুখকর ছিল। শায়খ বলতেন, হযরত জীবদ্দশায় আমার কুরআন তিলাওআত শুনবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ পোষণ করতেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় সে সুযোগ আর হয়ে উঠেনি। আমি সেখানে তাঁর মাযারে এক খতম কুরআন শরীফ তিলাওআতের ব্যবস্থা করি। সৌভাগ্যক্রমে এ সফর সংক্রান্ত শায়খের এ দীন লেখকের নামে লিখিত একখানা পত্র সংরক্ষিত আছে-যাতে এ সফরের বিশদ বিবরণ এবং এ সম্পর্কে শায়খের মতামত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য নিম্নে তা উদ্ধৃত করছি ঃ

این که می بینم به بیداری ست یا رب یا بخواب ؟

এ যে আজবলীলা প্রভো! হেরিনু যা চোখে আপন,
জাগরণে হেরিনু তো? নাকি এটা নেহাৎ স্বপন?

মুকার্‌রম ও মুহ্‌তারাম মাওলানা আলহাজ্জ আবুল হাসান আলী মিঞা সাহেব মাদ্দা ফুয়ূযুকুম!

সালাম মসনুন পর–
করাচীতে কুশলে পৌছার খবর জানিয়ে এমনি সংক্ষিপ্ত কার্ড ২৬ জুনে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছি। সম্ভবতঃ তা' ইতিমধ্যেই পৌছে গেছে। আজকের ডাকে মক্কা মুকার্‌রমা থেকে প্রাপ্ত মাওলানা হাকীম সাহেবের প্রেরিত পত্রগুলোর মধ্যে–যা' আমাদের বিদায়ের পর আমার ও মাওলানা ইউসুফ সাহেবের নামে এসেছিল—আপনার ২৭শে মুহার্‌রম তারিখে লিখিত স্নেহপ্রীতিমাখা লেফাফাখানাও পেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে আপনার সুধারণা ও প্রীতি ভালাবাসাকে আমাদের উভয়ের দ্বীনী তরক্কীর উপকরণ বানিয়ে দিন!
তিনদিন করাচী অবস্থানের পর সোমবার দুপুরের ট্রেনে মঙ্গলবার সকাল ৯টায় লায়ালপুর পৌছি। লোকজন আমাদের আরাম দানের হদ্দ করে রেখেছে। প্রথম শ্রেণীর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করে রাখা হয়েছিল। আমার এবং মাওলানা ইউসুফ সাহেবের তা' সয়নি এজন্যে যে, করাচী থেকে লায়ালপুর পর্যন্ত ছোট বড় এমন কোন স্টেশন ছিল না যেখানে ৩০–৩৫ জন থেকে নিয়ে ৪/৫শ' অভ্যর্থনাকারী আমাদের প্রতীক্ষায় না ছিলেন। শীতাতপ–নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে যেহেতু গাড়ির জানালা খোলা সম্ভবপর ছিল না, তাই প্রতি স্টেশনেই আমাদেরকে উঠে দরজা পর্যন্ত যেতে হয়েছে। রাতে একটু শোয়ার সুযোগ আর আমার হয়ে উঠেনি। শুনেছি, আমার প্রথম পাকিস্তান সফরও নাকি এজন্য অনেকটা দায়ী।
হারামায়ন শরীফে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম, এ পাপী নাকি মুহাদ্দিছও; উভয় স্থানেই মাশায়েখ ও হাদীছের উস্তাদগণ হাদীছের ইজাযত ও সনদ নেওয়ার জন্য এতই ভীড় করেছিলেন যে, আমি আমার অযোগ্যতার জন্যে ওযরখাহী করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। পাকিস্তানে এসে জানতে পেলাম, এ পোড়ার মুখ নাকি আবার পীরও; ভক্তদের ভীড় এমনভাবে বন্দী করে রাখে যে, অধিকাংশ সময় চারদিকের দরজা জানালা বন্ধ করে অন্দরে থাকতে হয়েছে। বুধবার আসরের পর লায়ালপুর থেকে সারগোদা রওয়ানা হই এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আসরের পর সারগোদা থেকে ঢডিয়াশরীফ যাত্রা করি। লায়ালপুর ও সারগোদায় এত অসহ্য গরম পড়েছিল যে, চারদিকে বরফের শিলাখণ্ড রেখে কয়েকটি করে বৈদ্যুতিক পাখা চালানো সত্ত্বেও কোন মতেই স্বস্থি পাচ্ছিলাম না। লায়লপুর ১১৭ ডিগ্রী এবং সারগোদায় ১২১ ডিগ্রী

তাপমাত্রা ছিল বলে বলা হয়। ঢডিয়ার কথা শুনে সকলেই এই বলে সাবধান করছিলেন যে, সেখানে বিদ্যুত বা পাখার কোনই ব্যবস্থা নেই, অথচ গরমের ব্যাপারে তা' সারগোদার অধীন। এ জন্যে নিজেও খুবই চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু হযরত (রায়পুরী) রহমতুল্লাহি আলায়হি তাঁর জীবদ্দশায় সব সময়ই এ অকর্মণ্যের আরামের দিকে খুবই খেয়াল রাখতেন। আর এবারও তা' এমনিভাবে দেখা দিল যে, ঢডিয়া অবস্থানের ৩দিন মনসুরী বরং চকরূতার শৈলাবাস সম শীতলতা মণ্ডিত ছিল। রাতের বেলা রীতিমত গায়ে কাপড় জড়িয়েই তবে শুইতে হতো। দিনের দুপুর বেলাও প্রবল শীতল বাতাস বইতে থাকে যে, প্রাণ জুড়িয়ে যেতো। ব্যস্ততা এত ছিল যে, ওখানকার ৩ দিনের কর্মসূচী অনেক বন্ধুবান্ধবকে মনঃক্ষুণ্ন করেই তৈরী করা হয়েছিল এ জন্যে যে, তাঁদের চাহিদা মুতাবিক বাড়তি সময় বরাদ্দের কোনই অবকাশ ছিল না। ওখানকার ৩দিন তো বিনা অতিশয়োক্তিতেই হযরত রায়পুরী (র)-এর পাকিস্তান রওয়ানা হওয়ার সময়কার সাথেই তুল্য। জানালা ও দরজায় সারাদিন নারীপুরুষের এত ভীড় ছিল যে, বারবারু দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু তারপরও কারো সরবার নামটা ছিল না। ভাই ইসমাঈল লায়ালপুরী শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে সরাতেন। আবার দরজা খুললেই সেই পূর্বের অবস্থা। হযরত মাওলানা ফযল আহমদ কয়েকদিন পূর্বেই ঢডিয়া পৌছে গিয়েছিলেন। হযরত হাফিয আবদুল আযীয সাহেব গমথলবী শুক্রবার ভোরেই ঢডিয়া চলে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় আবার ফিরে এসেছিলেন। তারপর আবার রোববার ভোরে চলে গিয়েছিলেন এবং সোমবার ভোরে আমাদের সাথেই ফিরে আসেন। মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব রায়পুর গুজরাঁ, তাঁর সহোদর মুফতী আবদুল্লাহ্ সাহেব, মাস্টার মনজুর সাহেব, মওলবী সাঈদ আহমদ ডোঙ্গাযোঙ্গা তো করাচীতে খবর শুনেই পৌছে গিয়েছিলেন। আযাদ সাহেবও আমাদের সাথে সারগোদা থেকে যান এবং আবার আমাদের সাথেই ফিরে আসেন। এছাড়াও হযরতের ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের অনেকেই সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন। ডিসেম্বরে রায়পুরে যে সমাবেশে যেতে চেয়েছিলাম, আমাদের ভাগ্যে যাওয়া জুটেনি সত্য, কিন্তু ঢডিয়া অবস্থানের ৩ দিন সেখানে যাকেরীনের খুবই ভীড় হয়। এখানে রাত্রে পৌছেছি। শুক্রবার সকালে এখান থেকে লাহোর রওয়ানা হওয়ার কথা। সেখান থেকে এক রাতের জন্য রায়াবিণ্ড এবং ১৫ই জুলাই

বিমানযোগে লাহোর থেকে দিল্লী। দিল্লীতে আপনারা দেখা করার চেষ্টা করবেন না। খুবই ভীড় হবে। সাক্ষাতও হবে না। ইনশাআল্লাহ্ দেওবন্দের কোন ইজতিমার সময় এ অকর্মণ্যের জন্যে কিছু সময় রাখবেন। ধীরে সুস্থে সময় হাতে নিয়ে মুলাকাত হবে। মাওলানা মনযুর আহমদ সাহেবের খিদমতেও একই বক্তব্য।

ইতি
মুহাম্মদ যাকারিয়া
৭ই জুলাই মঙ্গলবার
ব-কলমে এহসান

চতুর্থ হজ্জ

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (র.)-এর ইন্তিকালের পর এক বছর খালি যায়। পরবর্তী বছর মানে ১৩৮৬ হিঃ/ ১৯৬৭ইং সালে হিজাযের তাবলীগ কর্মকর্তা ও কর্মিগণ দাবী জানালেন, হিজায ও বহির্বিশ্বে কাজকে জোরদার করার স্বার্থে মাওলানার উত্তরাধিকারী ও তবলীগের বিশ্ব-আমীর মাওলনা ইনামুল হাসানের তাঁর বিশিষ্ট অনুচরবর্গসহ হজ্জ সফরে আসা প্রয়োজন রয়েছে। এতে দাওয়াতের প্রসারও ঘটবে এবং এতে নতুন চেতনার সঞ্চার হবে। অনেক চিন্তাভাবনা ও বিচার বিশ্লেষণের পর হযরত শায়খুল হাদীছের পরামর্শ ও সমর্থনক্রমে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। ইউসুফ সাহেবের সঙ্গবিহীন হজ্জ সফরের এটা ছিল মাওলানা ইনামুল হাসানের প্রথম অভিজ্ঞতা। হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বহির্বিশ্বের মুসলিম প্রধান ও অমুসলিম প্রধান রাষ্ট্রসমূহের প্রচুর সংখ্যক তাবলীগী সাথী ও কর্মী এবং উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এতে অংশগ্রহণের সমূহ সম্ভাবনার কথা পূর্বেই অনুমতি হয়েছিল। মাওলানা ইনামুল হাসান এ সফরের গুরুত্ব ও নিজের একাকীত্বের কথা ভেবে অত্যন্ত বিব্রতবোধ করছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে এ সফরে হযরত শায়খুল হাদীছের সাহচর্য কামনা করছিলেন। অপরদিকে হিজাযের তাবলীগ কর্মিগণ তাদের উপর্যুপরি লিখিত পত্রে হযরত শায়খুল হাদীছের এ সফরে আবশ্যিকভাবে শামিল থাকার দাবী জানাচ্ছিলেন। হিজায ও পাকিস্তানের মুরীদ মুতাকিদগণ এ সফরের বাহানায়ই কেবল তাঁর যিয়ারত ও সাহচর্য লাভের সুযোগ লাভ করতে পারতেন।

প্রথমে জামাআতের কাজকর্মের দেখাশোনা এবং মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবের অনুপস্থিতিজনিত শূন্যতার কথা চিন্তা করে শায়খুল হাদীছের হজ্জ সফরে

না যাওয়ার কথাই সাহারানপুরে ঠিক হয় এবং তা' ঘোষণাও করে দেয়া হয়। কিন্তু মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবের যাত্রার তারিখ যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, ততই ভারতব্যাপী শায়খের হজে যাওয়ার খবর রটতেই থাকলো। চতুর্দিক থেকে এ ব্যাপারে প্রকৃত খবর কি জানবার জন্যে রাশিরাশি পত্র আসতে লাগলো। এমন কি নির্দিষ্ট দিনে দিল্লী বোম্বেতে দর্শনার্থী ও বিদায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপনকারীদের আগমনের খবরও পৌছতে শুরু হলো। অবশেষে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ ইং তারিখে শায়খ দিল্লীতে তশরীফ নিয়ে আসলেন। তখনো যাত্রা স্থির হয়নি। কখনো তাঁর যাবার, আবার কখনো না-যাবার খবর রটছিল। এ লেখক, মাওলানা মনযূর নু'মানী ও মাওলানা মঈনউল্লাহ্ সাহেব নদভী তাঁকে বিদায় অভ্যর্থনা জানাবার উদেশ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লী পৌছান। শায়খ তাৎক্ষণিক ভাবে আমাদের কথা স্মরণ করলেন এবং একান্তে দেখা চাইলেন। এসময় কেবল মাওলানা ইনামুল হাসান, মাওলানা মনযূর সাহেব এবং এই দীন খাদেম ছিল। শায়খ তাঁর ইতস্ততঃ ভাবের কথা ব্যক্ত করলেন। কিছু কিছু গায়েবী ইশারা, শুভস্বপ্ন, বন্ধুবান্ধব ও ভক্তদের পরম আগ্রহ সফরের প্রেরণাদায়ক ব্যাপারসমূহ, পক্ষান্তরে দেশে অবস্থানের প্রয়োজন ও যুক্তিসমূহ-সব ব্যক্ত করে শায়খ আমাদের এ ব্যাপারে পরামর্শ কি জানতে চাইলেন। আমরা তাঁর দেশে অবস্থানের পক্ষেই মত ব্যক্ত করলাম এবং তার যুক্তিও ব্যাখ্যা করলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত বোঝা গেল না যে, শেষ পর্যন্ত-কি স্থির হলো! রাত্রে যখন সৌদী দূত মুহাম্মাদুল হামদ আশ্-শবীলী সাক্ষাৎ করতে আসলেন এবং এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ মজলিসে আমারও হাযির থাকার সুযোগ হয়, তখন তাঁর যাওয়ার ফায়সালা হয়েছে অনুমিত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি হজ্জ সফরে যাচ্ছেন।

সাক্ষাৎপ্রার্থী ও বিদায় অভ্যর্থনাকারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছিল। নিযামুদ্দীনের একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত এবং শায়খ পর্যন্ত পৌছা ভিড়ের মধ্যে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠলো। উপর নীচে লোকে লোকারণ্য এশার সময় থেকে সেই যে লোকদের খাওয়ানো শুরু হলো, তার শেষ দল খাবার খেতে খেতে ফজরের সময় হয়ে গেল। ফজরের নামায পড়েই বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। নানা কারণে অতিঘনিষ্ঠরা ধরে নিয়েছিলেন যে,এটাই বুঝি হযরতের চিরতরে দেশত্যাগ। বিমান বন্দরেও প্রচুরসংখ্যক লোক বিদায়-অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। কোন কোন খাদেম হিন্দুস্তানের বিশেষ অবস্থার

কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলমানদের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরতকে হজ্জ-অন্তে প্রত্যাবর্তনের দরখাস্ত জানাচ্ছিলেন। নয়টার দিকে বোম্বের উদ্দেশ্যে বিমান উড়লো। ২১ ও ২২ তারিখে বোম্বেতে অবস্থান করলেন। ২২ তারিখে বোম্বে থেকে সরাসরি জেদ্দার ফ্লাইটে রওয়ানা করে ঐদিনই কুশলে জেদ্দা পৌছেন। বিমান বন্দরে ভারতের দূত জনাব মদহাত কামেল কিদওয়াই সাহেব অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে তিনি নিজ বাসায় নিয়ে উঠালেন। সেখানে খাওয়া দাওয়া সেরে অল্পক্ষণ পরেই মওলবী শামীম সাহেব প্রমুখের সাথে একত্রে মক্কা মুয়াজ্জমায় হাযিরা দিলেন। মক্কা শরীফে চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এবারও মাদ্রাসা সউলতিয়ায় অবস্থান করেন। সেখানকার দৈনন্দিন কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র থেকে হুবহু উদ্ধৃত করছি ঃ

"এর পূর্বেকার সফরকালে স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, আর মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলায়হির জন্যে মোটরও সবসময় চার পাঁচটা করে মওজুদ থাকতো। এ জন্যে আগের সফরে ফজরের নামায হেরেম শরীফেও আদায় করা হতো। আর কোন দিন একটু দেরী হয়ে গেলে নামায মাদ্রাসার মসজিদে পড়েই মাওলানা ইউসুফ (র.) হেরেম শরীফ চলে যেতেন। কারণ, নামাযের পরে তিন ঘন্টার ভাষণ মাওলানা ইউসুফ সাহেবেরই হতো। শায়খুল হাদীছও সাথে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (র.)-এর ভাষণও শুনতেন। তারপর বাসস্থলে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের সাথে চলতে পথের বিপুল আয়োজন-যাতে প্রায় এক ঘন্টা ব্যয়িত হতো। উপস্থিত সকলে যেমন চা-পানে আপ্যায়িত হতেন, তেমনি মাওলানা ইউসুফ (র)-এর কড়াকড়িরও শিকার হতেন।

এ বছর ভোরবেলায় ভাষণ প্রায় আড়াই ঘন্টাব্যাপী চলে। ভাষণ দান করেন মাওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেব অথবা মাওলানা সাঈদ খান সাহেব। হযরত শায়খুল হাদীছ তাঁর রোগব্যাধি, ভগ্নস্বাস্থ্য ও বাহনের স্বল্পতার জন্যে মাদ্রাসার মসজিদেই নামায আদায় করে থাকেন।তারপর বাসস্থলে যাকেরীনদের যিকিরের সিলসিলা আল্লাহ্র ফযলে বেশ জোরে সোরেই চলে -যা' সাধারণতঃ সফরের সময় যে সুযোগ হয়ে উঠে না। তারপর ১টায় (আরবী সময়) শায়খুল হাদীছ একাকী চা-পান করেন। তখনো মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব ও মওলবী হারূন সাহেব নিজেদের কামরায় বিশ্রামরত থাকেন এবং নিজ নিজ

কামরায় চা-পান করেন। তারপর তাঁরা উভয়ে এবং হেরেমশরীফের সমাবেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাওলানা উমর প্রমুখ হযরত শায়খুল হাদীছের কামরায় চলে আসেন। তিনটা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা হয়। ৩টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হযরত শায়খুল হাদীছ সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন। এসময় মাদ্রাসার মসজিদে বিশিষ্ট হাজী সাহেবানের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আজ পাক-ভারতের উলামার সমাবেশ, গত কাল ছিল আফগানী আলিমগণের সমাবেশ। তার আগে আল-জিরিয়া প্রভৃতি দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত সমাবেশে হযরত শায়খও কিছুক্ষণের জন্য বসে থাকেন। মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবও তাতে শরীক হয়ে থাকেন। ঐ সময়ই তাঁদের নিজস্ব তা'লীমও মাদ্রাসার অন্যান্য কামরায় হতে থাকে।

হযরত শায়খের স্বাস্থ্য পূর্ব থেকেই খারাপ ছিল। এখানে আগমনের পর কিছু কিছু জ্বরের প্রকোপ দেখা দেয়। এছাড়া প্রশ্রাবের ব্যাপারটাও অনেকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যুহরের নামায সাড়ে ছয়টায়।৩ তারপর পরই মধ্যাহ্ন ভোজ এবং আসর পর্যন্ত কায়লুলা বা বিশ্রাম। সাধারণতঃ খাওয়া-দাওয়ায় একঘন্টা লেগে যায়; তবে দাওয়াতের দিন-যা' প্রায়ই হয়ে থাকে বিশ্রামে যেতে দেরী হয়ে যায়, যদিও বা দাওয়াতের আহার্য গ্রহণের জন্য বাইরে যেতে হয় না, দাওয়াত বাসস্থানেই হয়ে থাকে।আসর সাধারণতঃ সাড়ে নয়টায় পড়া হয়। তারপর হযরত শায়খ কফি খেতেন যা' তাঁর পসন্দসইও ছিল। কিন্তু তাতে নিদ্রা বিঘ্নিত হওয়ায় এখন তার স্থলে সবুজ চা-ই পান করে থাকেন। এসময় বন্ধুবান্ধব ভক্তজনেরাও আসেন। এগারোটায় হেরেম শরীফে গমনের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং সাড়ে এগারটায় হেরেমে পৌছে আড়াইটা পর্যন্ত সেখানেই সকলে অবস্থান করেন। এ সময় ঐ হযরতগণের কাছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার, সাধারণ সমাবেশ (আম ইজতেমা) উর্দু ও আরবীর বেশ কয়েকটি করে হল্‌কা (ছোট ছোট সমাবেশ) অনুষ্ঠিত হতে থাকে। অন্যান্য ভাষাভাষীদের সমাবেশ-যেমন আফগানী, তুর্কী, ইংরেজী ভাষাভাষীদের পৃথক পৃথক সমাবেশ হতে থাকে। হযরত শায়খুল হাদীছ তাঁর বহুমূত্রের জন্য এক কোণে বসে থাকতেন। আড়াইটায় বাসস্থানে ফিরে সকলে খাওয়া দাওয়া করতেন। হযরত শায়খ তখন কিছু ফল-ফলারী

খেতেন। চারটায় হযরত শায়খ বিশিষ্ট সাথীদেরকে নিয়ে পুনরায় হেরেম শরীফ চলে যেতেন। এবং অত্যন্ত ওযরগ্রস্ত থাকার দরুন গাড়িতে বসে বসে ৩/৪ তওয়াফ করতেন, ছয়টা বাজে হেরেম থেকে ফিরে এসে হযরত শায়খ বিশ্রাম নিতেন। দশটায় তাহাজ্জুদের আযান এবং প্রায় ১১টায় ফজরের নামায আদায় হয়ে থাকে।"

হজ্জ সম্পন্ন হওয়ার পর এবং মক্কা মুয়ায্যমায় বেশ কিছু দিন অবস্থান শেষে মদীনা তাইয়্যিবায় রওয়ানা হন। সেখান থেকে ২২শে এপ্রিল মক্কা শরীফে আসেন এবং দুই দিন সেখানে অবস্থানের পর জেদ্দায়। ২৬ তারিখে জেদ্দা থেকে করাচী, সেখান থেকে ২৮ তারিখে দিল্লী যাত্রা করেন। সেখানে পূর্ব ধারণা অনুযায়ী অভ্যর্থনাকারীদের ভিড় ছিল। শুক্র ও শনিবার দিল্লীতে অবস্থান করে ৩০শে এপ্রিল রোববার দশটার দিকে সাহারানপুর তশরীফ নিয়ে আসেন। কাঁচা ঘরে উযূ করে মসজিদে তশরীফ নিয়ে যান। সেখানে দু'রাকআত নামায আদায়ের পর উপস্থিত সকলের সাথে মুসাফাহা করেন। আত্মীয়স্বজন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কারো সাথেই নামাযের পূর্বে মুসাফাহা করেন নি। ঐ সময়ই বাদ আসর দু'আর এলান করা হয়। সে অনুসারে নতুন ছাত্রাবাসের মসজিদে মাওলানা ইনামুল হাসান দু'আ করান। তাতে শহর ও আশেপাশের এলাকার অনেক লোক অংশগ্রহণ করেন। সোমবার সকালে চা পানের পর উভয় হযরত আরও কয়েকজন সঙ্গীসাথীসহ গাঙ্গুহ্ তশরীফ নিয়ে যান এবং মধ্যাহ্নে খাবার সময়ে ফিরে আসেন। যুহরের পর মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব নিযামুদ্দীনে ফিরে যান এবং হযরত শায়খ বুখারী শরীফের দরস শুরু করিয়ে দেন।

শায়খের সময়সূচি

জ্ঞানসাধনা, সেবাপরায়ণতা, একাগ্রচিত্ততা এবং অহরহ ব্যস্ততার দিক থেকে হযরত শায়খ ছিলেন এ বিংশ শতাব্দীতে পূর্ববর্তী যুগের ঐ সমস্ত বুযুর্গ উলামার এক জীবন্ত স্মৃতি যাঁদের জীবনের প্রতিটি মূহূর্ত ইবাদত, খিদমত এবং ইলমের প্রচার প্রসারের জন্য নিবেদিত ছিল এবং যাঁদের কীর্তিসমূহকে দেখে তাঁদের জীবনকালের বরকত, তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অনমনীয় সাহস এবং বহুমুখী প্রতিভার সম্মুখে মানুষ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যায়। এসবকে তাঁদের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া আর কিছু বলে অভিহিত করার কোন উপায় থাকে না।

ফজরের নামাযের কিছুক্ষণ পরেই[৪] কাঁচাঘরে তশরীফ নিয়ে আসতেন এবং এক বিরাট জামাআতের সাথে চা পান করতেন। উপস্থিত লোকজনের সংখ্যা ৫০/৬০ জনের কম ক্বচিৎই হতো। কোন কোনদিন সংখ্যা অনেক উপরেও উঠে যেতো। কিছু লোকের জন্য নাশতার ব্যবস্থাও থাকতো। কিন্তু শায়খ নিজে ঐ সময় কেবল চা-ই পান করতেন। কোন বিশেষ মেহ্মান বা প্রিয়জন আসলে বা কোন মেহ্মানের সাহারানপুর অবস্থান স্বল্পকালের হলে বিশেষ অবস্থায় একান্ত কিছু আলাপ করতেন। তারপরই চলে যেতেন বালাখানায় তাঁর ইলমী ও কিতাবাদি রচনার কাজে। শীত, গ্রীষ্ম, ঝড় বৃষ্টি, আন্দোলন, কোন বড় মেহ্মানের উপস্থিতি কিছুতেই তাঁর সে অভ্যাসের মধ্যে বড় একটা বিরতি বা ব্যতিক্রম হতো না। কোন কোন সময় বলতেন, হযরত রায়পুরী বা অনুরূপ কোন বড় বুযুর্গের আগমনে আমি আমার এ সময়সূচির একটু ব্যতিক্রম করতে উদ্যত হলে আমার মাথা ধরে যেতো। অনুমতি নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য গিয়ে কিছু কাজ করে আবার ফিরে আসতাম। অধিকাংশ সময় তাঁরাই তাঁকে অনেক বলে কয়ে বিদায় নিয়ে নিতেন এবং তাঁর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পসন্দ করতেন না। উপরতলার বসার ঘরটি না দেখার মতোই ছিল আর না শোনার মতই। একটি ছোট কামরা। কিতাবাদি দ্বারা এমনি পরিপূর্ণ যেন এর দরজা-প্রাচীর সবই কিতাবাদির দ্বারা নির্মিত। এই বিপুল কিতাব সম্ভারের মধ্যে তিনি যখন "আশ্রয়" নিতেন, তখন মনে হতো যেন কোন পাখী সারাদিন তার সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর এবার তার নীড়ে এসে বসেছে। তাঁর সে সময়কার অধিষ্ঠানকে উর্দূ কবি খাজা মীর দর্দের ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করা যায়।

جائیے کس واسطے اے درد میخانہ کے بیچ
کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ

"কোন্ গরজে দর্দ তোমার শরাবখানায় যাওয়ার তাড়া?
দেলের মাঝের পেয়ালা যে করছে সদা পাগল পারা।

যদি কেউ বিশেষ প্রয়োজনে কোন কথা বলার জন্যে বা কোন প্রিয়জন একটু দেখা করার জন্যে সেখানে যেতেনও তবে বসার জায়গা পাওয়া ছিল ভারী মুশকিল। চারদিকে কিতাবের স্তূপ। এক আধখানা চামড়া বা চাটাইর ফরশ, ওষুধ পত্রের কিছু পুরনো শিশিবোতল, চতুর্দিকে জ্ঞানরত্নের ছড়াছড়ি। সাড়ে এগারটা পর্যন্ত শায়খ একাগ্রচিত্তে সেখানে বসে কাজ করতেন। তাঁর একান্তই কাম্য ছিল

নেহাৎ প্রয়োজন ও খুব কম সময়ের জন্য ছাড়া কেউ যেন সেখানে গিয়ে তাঁর একাগ্রতায় বিঘ্ন না ঘটায়। ঐ সময় খাস মেহ্মান ও যিকিরকারী প্রিয়জনদের জন্য বাইরে আঙিনায় বসে যিকরে-জাহ্রী বা সশব্দে যিক্র করার অনুমতি ছিল। তাতে শায়খের একাগ্রতায় বিঘ্ন হতো না।

সাড়ে এগারটায় তিনি নীচে তশরীফ নিয়ে আসতেন। দস্তরখান বিছানো হতো। প্রচুর সংখ্যক মেহ্মান বসতেন দস্তরখানে। প্রায়ই দু'তিন পালা বসতে হতো মেহ্মানদের। শায়খের পরিভাষায় পয়লা পিড়ী, দুসরী পিড়ী। শায়খ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাওয়ার মধ্যে শামিল থাকতেন এবং এমন ধীর গতিতে ও অল্প অল্প করে খেতেন যে, সর্বপ্রথম ব্যক্তিটি থেকে নিয়ে সর্বশেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ পেতো। খাবারও হতো রকমারি। বিবিধ প্রকারের ব্যঞ্জনাদি প্রচুর পরিমাণে থাকতো। বার বার বলে বলে মেহমানদেরে খাওয়ানো হতো। এমনকি নবাগতও এ দস্তরখান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অনেকে বলাবলির কারণে অভ্যাসের চেয়ে বেশী খেয়ে কষ্টও ভোগ করতেন। গভীরভাবে যাঁরা লক্ষ্য করতেন তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, শায়খ নামেমাত্রই খাওয়ায় শামিল, নতুবা তাঁর আহার্যের পরিমাণ এতই অল্প হতো, যে এত অল্প আহার্য গ্রহণ করে কী ভাবে এত কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন তা রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করতো। কিন্তু বাহ্যিকভাবে দস্তরখানে তাঁর উপস্থিতি দেখে কারো পক্ষে এটুকু ঠাহর করা খুবই মুশকিল ছিল যে, সুশীলমনা উদারচিত্ত মেজবান নিজে কত অল্প খাচ্ছেন।

খাওয়ার আগেই ডাক এসে যেতো। চিঠি পত্রের উপর একবার নজর বুলিয়ে নিতেন। চিঠিপত্রের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হিজায যাত্রার প্রাক্কালে দৈনিক ৩০/৪০ খানার মধ্যে হতো-পরবর্তীকালে তা' ৫০/৬০ পর্যন্ত পৌছে যেতো।

আহার্য গ্রহণের পর তিনি বিশ্রাম গ্রহণে বাধ্য হতেন। সাড়ে বার একটা তাতে বেজে যেতো। এ সময়টাই ছিল তাঁর বিশ্রাম গ্রহণের সময়। যুহরের পর এক ঘন্টা ডাক উপলক্ষে এবং ঐ সময়ই কোন প্রিয়জনের সাথে কথাবার্তায় অতিবাহিত করতেন। এক ঘন্টা কাটিয়ে চলে যেতেন হাদীছের দরস দানে। প্রথমে এ দরস হতো দ্বিতলে অবস্থিত ছাত্রাবাসের দারুল হাদীছে। তারপর তাঁর আরোহণের এবং চলাফেরার অসুবিধা দেখা দিলে তা' ছাত্রাবাসের মসজিদে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। মাওলানা হাফিয আবদুল লতীফ সাহেবের ওফাতের পর বুখারী শরীফ তিনিই পড়াতেন। তাঁর সে দরসের অবস্থা ছিল দর্শনীয়। হাদীছের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সুন্নতের

প্রতি অনুরাগ, নবী করীম (স)-এর প্রেমে মাতোয়ারা মনের প্রভাব পড়তো উপস্থিত সকলের উপর। কোন কোন সময় ক্ষণিকের জন্যে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যেতো সারা মজলিসে। বিশেষতঃ কিতাব খতম ও দু'আর সময় হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ পুরো মজলিসে ছেয়ে যেতো। নবী করীম (স)-এর ওফাত সংক্রান্ত হাদীছসমূহ পাঠের সময় সংযমের বাঁধ টুটে যেতো। চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে উঠতো এবং গলার স্বর ধরে যেতো।

আসরের নামাযের পর বাসস্থানে বসতো আম-মজলিস। সারা আঙিনা আগন্তুকে ভরে উঠতো। তাতে মাদ্রাসার ছাত্র, উস্তাদ এবং মেহমানদের অনেকেও থাকতেন। এ সময় ও চায়ের ব্যাপক আয়োজন থাকতো। এ সময়ই তাঁর তাবিজাদি লেখার সময় ছিল। মাগরিবের নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ ধরে মসজিদেই অবস্থান করতেন। কোন বিশেষ মেহমান বা প্রিয়জন আসলে এ সময় তাঁদেরকে একান্তে সময় দিতেন। ইশার নামাযের পূর্বে আবার দস্তরখান বিছানো হতো। কিন্তু শায়খ দীর্ঘকাল ধরে রাতের বেলা খেতেন না, তবে কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্রিয়জন আসলে তাঁদের খাতিরে কখনো কখনো দু'চার গ্রাস খেয়ে নিতেন। ইশার পরও কিছুক্ষণ সীমিত ও বিশেষ মজলিস চলতো। এ মজলিসে সাধারণতঃ তাঁর ঘনিষ্ঠ ও সার্বক্ষণিক খাদিমগণ বা বিশিষ্ট মেহমান ও প্রিয়জনরাই থাকতেন। তারপর বিশ্রামের পালা।

জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পূর্বে বিভিন্ন এলাকা ও গ্রামগঞ্জ থেকে আগত মুরীদানদের মজলিসে বসার অনুমতি থাকতো। এ সময় বয়আতপ্রার্থীদেরকে নতুনভাবে বয়আতও করা হতো এবং যিকির ও আত্মশুদ্ধির সবকও দেওয়া হতো। এ সংখ্যা দিন দিন এতই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, সারা আঙিনা এবং সদর অন্দর সব জনাকীর্ণ হয়ে উঠতো। তারপর জুমুআর প্রস্তুতি শুরু হতো। জুমুআ এ পর্যায়ে নিকটবর্তী হাকীম আইয়ুব সাহেবের ছোট মসজিদেও আদায় করা হতো। আহার-বিহার অবশ্যই জুমুআর পরে হতো আসরের মজলিসে-আম জুমুআর দিন মুলতবী থাকতো। শায়খের সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত আসর-মগরিবের মধ্যবর্তী সময় দু'আ-দরূদ ওযীফা-মুরাকাবার অতিবাহিত করার অভ্যাস ছিল। বলতেন, আব্বাজানেরও অভ্যাস তা-ই ছিল। ঐদিন চায়ের আয়োজন হতো মাগরিবের পর।

শায়খের এসব জ্ঞানসাধনা, গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান এবং দ্বীনি ও রূহানী সাধনার ব্যস্ততা (যার বর্তমানে অবসর বলে কিছু তাঁর জীবনে ছিল না) সত্ত্বেও আর

একটি পুরনো অভ্যাস ছিল বিশেষ ঘটনা–দুর্ঘটনা, মৃতব্যক্তিদের মৃত্যু দিনে তাঁদের সম্পর্কে লেখা, আপন পীর ও মুরুব্বীস্থানীয়দের বন্ধুবান্ধবের বা প্রিয়জনদের আগমন নির্গমন, তাঁদের সফর ও বিশেষ বিশেষ অবস্থাদি লিপিবদ্ধ করে রাখা তাঁর এ রোজনামচা বা ডায়েরীতে চান্দ্র ও সৌর বছরের দিন কাল সন লিখে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে লিখিত হতো। এরই সাহায্যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.) হযরত রায়পুরী, সর্বোপরি মাওলানা ইউসূফ সাহেবের জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভবপর হয়েছে। মাওলানা মাদানী (র.) সম্পর্কেও এতে যথেষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সন্নিহিত হয়েছে। উক্ত বুযুর্গগণ ছাড়াও অনেক খাদেম ও মুরীদের ঘটনাবলীও তাতে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ অনেকটা সেই 'জামে–জাহাঁনুমা' ধরনের পিয়ালা আর কি–যাতে গোটা বিশ্বই প্রতিফলিত হয়েছে। এতে হিন্দুস্তান ও বহির্বিশ্বের অনেক ব্যক্তিত্বের জীবনী ও কুলপঞ্জী বিধৃত হয়েছে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এত ব্যস্ততার মধ্যেও শায়খ এগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য সময় করতেন কী করে?

পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তাঁর সর্বদাই ছিল। নিষ্ঠা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকাগুলি সংরক্ষণ করা হতো। শায়খ তাঁর অবসর সময়ে সেগুলো দেখে নিতেন। দুনিয়ার হালচাল এবং বিভিন্ন দলের মেজাজ ও তৎপরতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার ব্যাপারে সর্বদাই তাঁর উৎসাহ ছিল। কিন্তু চোখে পানি আসার অসুবিধা দেখা দেওয়ায় এবং পড়াশুনার জন্য বিশেষ কাঁচের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়া পর পত্রিকা পাঠের অভ্যাস প্রায় ছেড়েই দেন। কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকলে তা অন্যদের দ্বারা পড়িয়ে শুনে নিতেন কিন্তু মানসিক সচেতনতার ব্যাপারে তখনো বিন্দুমাত্র তারতম্য সূচিত হয়নি।

চোখে পানি আসা রোগ ও আলীগড়ে অবস্থান

চোখে পানি আসা শুরু হয়েছিল ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে। তাঁর ব্যস্ততা ও চোখে ছানিপড়া পূর্ণ না হওয়াতে অপারেশন বিলম্বিত হচ্ছিলো। আলীগড়ের ভক্তবৃন্দ (যাঁদের মধ্যে হাজী আযীমুল্লাহ সাহেব ও হাজী নসীরুদ্দীন সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) এবং বন্ধুবান্ধব ও খাদেমদের পুনঃপুনঃ বলার পর প্রথমবার আলীগড়ের বিখ্যাত চক্ষু হাসপাতাল গান্ধী আই হসপিটালে ভর্তি হলেন ১৯৭০ সালের ৮ই মার্চ (মুতাবিক ২৯শে যিলহাজ্জ ১৩৮৯ হিঃ) তারিখে। ১৪ই মার্চ তারিখে উক্ত হাসপাতালের বিখ্যাত সার্জন ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু

রোগ বিশারদ অধ্যাপক ডঃ শুক্ল অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ডান চোখে অস্ত্রোপচার করেন। জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান বিতরণ ছাড়া শায়খের সময় কাটতে পারে না। পড়ালেখা তো ঐ অবস্থায় প্রশ্নই উঠে না। যখন কথা বলার অনুমতি পেলেন, তখন তাঁর নিজ জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উস্তাদবর্গ ও শায়খদের কামালতসমূহ ও জীবন যাপন পদ্ধতি, তাঁদের ইখলাস ও আত্মত্যাগের ঘটনাবলী খাদেমদের কাছে বর্ণনা করতে এবং তা' যথারীতি লিপিবদ্ধ করাতে শুরু করে দিলেন। এইভাবে "আপবীতী" বা আত্মচরিতের সেই বিখ্যাত সিরিজ রচনার কাজ শুরু হলো–যা' যথারীতি সাতটি খণ্ডে সমাপ্ত হয়। এ গ্রন্থখানা নিকট অতীতের এক সবাক চিত্র এবং প্রাণবন্ত বিবরণ। আলিম–উলামা, মাদ্রাসা–শিক্ষকবর্গ এবং ইলমী ময়দানে নবাগতদের জন্য এ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনকারী ও অন্তদৃষ্টিবর্ধক।

২২ শে আগষ্ট '৭০ ইং (মুতাবিক ১০ জমাঃছানী ১৩৯০ হিঃ) তারিখে এ হাসপাতালে দ্বিতীয়তার তিনি ভর্তি হন। এবার হাসপাতালে থাকেন ১৮ দিন। (২২শে আগস্ট থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) এবারও তিনি নীরব রইলেন না। ভক্তমুরীদান ও খাদেমদেরকে যথারীতি পাঠ ও বাণী দান করতেন। তদুপরি ছিল ডাক যোগাযোগ। তাঁর একদিনের ডাকে আগত পত্রের সংখ্যা ছিল বায়ান্ন– যা' হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, হারামায়ন শরীফায়ন, লন্ডন ও আফ্রিকা থেকে এসেছিল।[৫]

দু'বছর পর অপর চোখের অস্ত্রোপচারের জন্য তাগিদ হতে লাগলো। ২৪ এপ্রিল ১৯৭২ ইং তারিখে মদীনা তাইয়্যিবার হাসপাতালে লাহোরের মশহুর চক্ষু সার্জন ডাঃ মনীরুল হক সাহেব বাম চোখে অস্ত্রোপচার করলেন। ২৮শে এপ্রিল ভোরে হাসপাতাল থেকে তাঁর বাসস্থল মাদ্রাসায়ে উলূমে শার'ঈয়ায় ফিরে আসেন।[৬]

দরসদানে অক্ষমতা

১৩৪১ হিজরীর শাওয়াল মাস (১৯২৩ হিঃ) থেকে দরসদান শুরু হয়েছিল। তাঁর এ দরসদান বা শিক্ষকতা ১৩৮৮ হিজরী (১৯৬৮–৬৯ ইং) পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। তারপর চোখে পানি আসার দরুন দরসদান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পুস্তকাদি রচনা ও সংকলনের কাজ অব্যাহত থাকে।[৭]

দরসদানের সিলসিলা চোখের অসুস্থতার জন্যে ৮৮ হিজরী থেকে মওকুফ[৮] হয়ে গেলেও মুসালসিলাত'–এর ইজাযত দানের সিলসিলা সাহারানপুরে অবস্থানের

অন্তিম দিনগুলি পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলছিল। ৯০ হিজরীর ২৩ রজব তারিখে "মুসালসালাত" উপলক্ষে দেড় হাজার লোকের সমাবেশ হয়–যাতে অনেক বড়দরের আলিম–উলামা এবং মাশায়েখও উপস্থিত ছিলেন।[৯]

হিজাযের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সফর

১৩৮৬ হিজরী (১৯৬৭ ইং)–এর পরে যখন হযরত শায়খ হিজাযে কর্মরত তাবলীগী কর্মীবৃন্দের চাহিদা এবং মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবের অনুরোধে হিজায সফর করেন এবং হজের পর হিন্দুস্থান ফিরে আসেন, তার দু'বছর পর ১৩৮৯ হিজরীর সফর (১৯৬৯ ইংরেজীর এপ্রিল) মাসে পুনরায় তিনি হিজায যাত্রা করেন। এ সফরে পেকার্ড ওয়াচ কোম্পানীর হাজী মুহাম্মদ শফী সাহেব তাঁর সাথে যাবেন বলে আশা করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর একটি মামলার তারিখ থাকায় তিনি সঙ্গে যেতে পারেননি। হযরত শায়খ আমাকে এ সফরে তাঁকে সঙ্গ দিতে পারবো কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমার প্রতি বছরই এক দু'বার রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাসমিতি উপলক্ষে হিজাযে যেতেই হয়। আমি বললাম, এবার তো সেখানে যাওয়ার মতো কোন উপলক্ষ এখনো পড়ে নাই। কেননা রাবেতা বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সভা এখনো আয়োজন করা হয়নি। উত্তর শুনে শায়খ চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে লক্ষ্ণৌ আসতেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের একটি পত্র এই মর্মে পেলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের একটা জরুরী সভা আহ্বানের জন্য চ্যান্সেলর (আমীর ফাহ্‌দ)–এর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সুতরাং জরুরী সভায় উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সাথে সাথে শায়খকে এ গায়েবী ইন্তেযামের সংবাদ দেওয়া হলো। এতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আমি প্রিয় মওলবী মঈনুল্লাহ্ নদভী এবং মাওলানা সাঈদুর রহমানকে নিয়ে দিল্লী থেকে হযরতের সাথী হয়ে গেলাম। ৮ই সফর ১৩৮৯ হিঃ (২৬শে এপ্রিল ১৯৬৯ ইং) তারিখে দিল্লী থেকে আমরা বিমানযোগে বোম্বের পথে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। শায়খের সাথে চললেন আলহাজ্জ আবুল হাসান। পথিমধ্যে যাত্রীদেরকে যে মিষ্টান্নদ্বারা আপ্যায়িত করা হয় তার খানিকটা আমি শায়খের খেদমতে পেশ করলে তিনি বললেন ঃ মওলবী সাহেব! আমি রোযা আছি। জানতে পারলাম, এটা ছিল তার খুশী ও শোকরানার রোযা। তাঁর "অপবীতী" পাঠে জানা

যায় যে, এ সফর রোযা ও উযূর সাথে সম্পন্ন করার সংকল্প তিনি করে রেখেছিলেন–যা' অক্ষরে অক্ষরে পালিতও হয়েছিল।

২৯শে এপ্রিল সোমবার বোম্বে থেকে আমরা করাচী রওয়ানা হই। করাচী বিমানবন্দরে অভ্যর্থনার জন্য অনেক লোকের সমাবেশ হয়। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব দেওবন্দীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যুহরের নামায ও রুখসতী দু'আ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করে জেদ্দার পথে আমরা পাড়ি জমালাম। এ সফরে শায়খ তাঁর নিজের ভাষায় ঃ

صيام شهرين متتابعين توبة من الله

অর্থাৎ তওবার উদ্দেশ্যে এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা পালনের নিয়্যাত করেন এবং বন্ধুবান্ধব ও মুরব্বীদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও খায়বরের সফর পর্যন্ত তা' পালন করেই যান।

মদীনা তাইয়্যিবার এ সফরে (যাতে শায়খ এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা থাকার নিয়্যাত করেছিলেন) শায়খ প্রতিদিন মাগরিবের প্রাক্কালে বাবে–জিব্রীল দিয়ে (মসজীদে নববীতে) ঢুকে রওজা শরীফের সম্মুখ দিয়ে যেতে ডানদিকের যে প্রলম্বিত প্রাচীর সেখানে পবিত্র কদমদ্বয়ের দিকে মুখ করে প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে বসে পড়তেন এবং নামাযের সময় ছাড়া বাকী সময়টুকু মুরাকাবা বা ধ্যানরত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। এভাবে বসা থাকা অবস্থায় যখন ইফতারের সময় হতো তখন এক গ্লাস জমজমের পানি নিয়ে ইফতার করতেন। তারপর ইশা পর্যন্ত পানাহার বর্জন করে ধ্যানরত অবস্থায় সেখান কাটাতেন। সে সময় কোন কথা বলা বা অন্য কোন কিছুর দিকে মন নিবিষ্ট করা তাঁর জন্য খুবই কষ্টকর হতো। ইশার নামাযান্তে তিনি বেরিয়ে আসতেন। মোটর গাড়ী প্রস্তুত থাকতো। গাড়িতে বসা অবস্থায় আর এক গ্লাস শরবত বা পানি পান করতেন। এই অধমও তাঁর সঙ্গেই থাকতো। আবাসস্থল মসজিদে নূরে পৌছার পর দস্তরখান বিছানো হতো। তখন খাওয়া দাওয়া করতেন। ভাবতেও অবাক লাগতো, একাধারে তিন চার ঘন্টা কি ভাবে তিনি অত্যন্ত আদবের সাথে মুরাকাবায় বসে কাটাতেন, অথচ ঐ সময় তাঁর ঘন ঘন প্রশ্রাবের বেগও হতো। ইফতারের স্থলে যে আহার হতো, তাও অনেক বিলম্বে হতো। অন্তর্নিহিত প্রেরণা, বাতিনী শক্তি এবং আধাত্মিক উচ্চ সম্পর্ক ছাড়া এটাকে আর কিছু বলে অভিহিত করার কোনই পথ নাই।

রাত্রের দস্তরখানে হযরত শায়খের আন্তরিক আগ্রহ হতো যেন খাবারও মদীনার উৎপন্নজাত দ্রব্যাদির দ্বারাই প্রস্তুত হয়। বাইরের খাদ্যদ্রব্যাদি-যা' একটু আয়াসলভ্য হতো তা' তিনি পসন্দ করতেন না। ঐ পাকভূমির প্রত্যেকটি বস্তুই ছিল তাঁর নজরে প্রিয়, সুস্বাদু ও তাবার্রুক স্বরূপ।

وللناس فيما يعشقون مذاهب

"ভালবাসা ও প্রেমের জগতে পদ্ধতি রকমারি।"

'৮৯ হিজরীর হিজায সফরের পর হযরত শায়খের ষষ্ঠ সফর যাত্রা হয় ১৫ই যু'কাদা ৯০ হিঃ (১৩ই জানুয়ারী '৭১ ইং) তারিখে সাহারানপুর থেকে। ১৮ই জানুয়ারী সকাল ৯টা বাজে তিনি দিল্লী থেকে রওয়ানা হন।

দেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি সফর

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সফরের সাথে শায়খের যে কেবল রুচির মিল ছিল না তাই নয়, বরং তিনি তাতে অনেকটা বিব্রতবোধ করতেন। এটা ছিল বাল্যকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর প্রতিপালন ও পরিবেশের প্রভাব বা ফলশ্রুতি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বারা কিতাবাদি প্রণয়ন ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের যে খেদমত আঞ্জাম দেওয়ানোকে তাঁর ভাগ্যলিপি করে রেখেছিলেন, এটা বুঝি ছিল তাঁরই কুশলী হাতের ইঙ্গিত যে, শায়খ যেন একাগ্রচিত্তে কাজ করার অধিকতর সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর এ স্বভাবজাত নির্জনতাপ্রীতি ও একাগ্রচিত্ততা সত্ত্বেও মাওলানা মাদানী (র.), মাওলানা রায়পুরী (র.) ও মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের সাথে সাহারানপুর, মীরাট, মুযাফ্ফর নগর, মুবাদাবাদ, বেরিলী ও মেওয়াতের বিভিন্ন মাদ্রাসার জলসা ও তাবলীগী ইজতিমা উপলক্ষে ছোট ছোট সফর তাঁকে মাঝে মাঝে করতেই হতো। প্রতিবছর তাঁকে কয়েকবার করে এ জাতীয় সফর করতে হতো-যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আয়াসসাধ্য। এ জাতীয় সফর ছাড়াও কোন কোন সময় তাঁকে দূরবর্তী জেলাসমূহেরও সফর করতে হয়েছে। এ জাতীয় সফরসমূহের মধ্যে তিনটি সফর উল্লেখযোগ্য।

তাঁর এ পর্যায়ের সফরগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে লক্ষ্ণৌর সফর-যা' ৬২ হিজরীর রজব (১৯৪৩ ইংরেজীর জুলাই) মাসে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের ইঙ্গিতে এবং লক্ষ্ণৌর তাবলীগী জামাআত ও তাবলীগী কাজের পরিচালকদের আমন্ত্রণক্রমে

মঞ্জুর করা হয়েছিল। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.) ১৮ই জুলাই তারিখে লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। পরের দিন ১৯শে জুলাই হযরত শায়খ সাহারানপুর থেকে সোজা লক্ষ্ণৌ এসে পৌছান। এ উপলক্ষে মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র.), মাওলানা আবদুল হক সাহেব মাদানী, মাওলানা ইহ্তেশামুল হাসান সাহেব, হাফিয ফখরুদ্দীন সাহেব (হযরত সাহারানপুরীর খলীফা) এবং তাবলীগী জামাআতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। কয়েকদিন লক্ষ্ণৌতে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার মেহমানখানায় অবস্থান করেন এবং তবলীগী ইজতিমা' ও মজলিসসমূহে অংশগ্রহণ করেন । লক্ষ্ণৌ অবস্থানের শেষ দিকে একদিনের জন্য হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.) তাঁর বিশিষ্ট সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)–এর বস্তি, জন্মস্থান ও বয়ঃপ্রাপ্তির স্থান শহরে তাকিয়া কালা নামে মশহুর দায়েরায়ে হযরত শাহ্ আলমুল্লাহ্ হাসানীতে তশরীফ আনেন এবং দিনটিকে পূর্ণ আনন্দে উপভোগ করেন।

দ্বিতীয়বার তিনি হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ জেলার রহীমাবাদে তশরীফ আনেন এক গুরুত্বপূর্ণ তবলীগী ইজতিমা উপলক্ষে। ইজতিমাটি ৩, ৪, ও ৫ জমাঃছানী ১৩৬৫ হিঃ (৬, ৭ ও ৮ ইং মে ১৯৪৬ ইং) তারিখে বাকী–নগর মৌজায় তথাকার রঈস আলহাজ শায়খ ফৈয়ায আলী সাহেবের আমন্ত্রণ ও উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। ঐ ইজতিমাতে ঐ সময় ইলাহাবাদের নৈনীজেলে বন্দী হযরত মাদানী (র.) ছাড়া দেশের প্রায় সকল বিশিষ্ট ও মশহুর আলিমই তশরীফ এনেছিলেন। এঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুশ্ শাকুর সাহেব ফারূকী লক্ষ্ণৌবী, মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব সাহেব মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ, হযরত মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব থানবী, মাওলানা আবদুল হক সাহেব মাদানী, মাওলানা আবদুল হালীম সাহেব সিদ্দীকী, মাওলানা হাকীম ডক্টর সায়্যিদ আবদুল আলী সাহেব (র.) নাযিম, নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা শাহ হালীম আতা সাহেব শায়খুল হাদীছ, নদওয়াতুল উলামা, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত ইজতিমার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, থাকা খাওয়ার ব্যাপারে কারো জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা না করে সকলের জন্যই একই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আওয়াম ও খাওয়াস, উলামা ও মাশায়েখ সকলেই একই স্থানে অবস্থান করেন এবং একই সাথে খাওয়া দাওয়া করেন। তা'লীম ও তবলীগী গাশতে সকলেই সমানভাবে শরীক থাকেন। তিনদিনের উক্ত ইজতিমায় যেভাবে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণ

করেছিলেন, তাতে কারো কোন অভিযোগ বা অনুযোগের সুযোগ ছিল না। হযরত শায়খ তাঁর স্মৃতি কথা লিখতে গিয়ে বিশেষতঃ এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবেঃ

> "এ ইজতেমার একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, স্থানীয় বিশেষ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থায় কোন তারতম্য রাখা হয়নি। উপস্থিত সকলকে নির্বিশেষে একই ডাল-রুটিতে (দুই ওয়াক্ত ছাড়া) আবার কখনো রুটি ও শোরবা দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।"[১০]

অযোধ্যার এ দু'টি সফর ছাড়াও তাঁর তৃতীয় সফর লক্ষ্ণৌ ও রায়বেরিলীর হয় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এ সফর হযরত মাওলানা আবদুল কাদির সাহেব রায়পুরী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, পীর হাশিমজান (সিন্ধুর একজন মশহুর বুযুর্গ এবং মুজাদ্দাদীয়া তরীকার শায়খ ছিলেন), আলহাজ সায়্যিদ মুহাম্মদ খলীল সাহেব নাহটুরী ও মওলবী জহীরুল হাসান সাহেব কান্দেলবীর সাহচর্যে হয়।

হযরত শায়খ মাওলানা রায়পুরীও বিশাল জামাআতসহ কানপুর হয়ে লক্ষ্ণৌ পৌছেন। দু'দিন লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করে ৮ রবিউছ্ছানী ১৩৬৬ হিজরী (৩০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ ইং) তারিখে একটি স্বতন্ত্র লরীযোগে উক্ত পূর্ণ কাফেলা রায়বেরিলীতে অবতরণ করে। তাঁদের এ অবতরণ হয় হযরত শাহ্ আল্মুল্লাহ্ (হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের পূর্বপুরুষ)-এর মসজিদের সোজাসুজি নদীর ওপারে। তারপর নৌকাযোগে নদী পার হয়ে তাঁরা দায়েরায়ে শাহ্ আল্মুল্লাহ্তে প্রবেশ করেন। অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত মহল্লাবাসী ছাড়াও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সেখানে এক দিন এক রাত্রি অবস্থান করেন। সে আনন্দঘন মূহূর্তগুলো ভাষায় অবর্ণনীয়। এ দীন লেখক যখন বিদায়ের দিন সকাল বেলা হযরত শায়খকে উযূ করাচ্ছিল তখন শায়খ ধরা গলায় বললেন ঃ মওলভী সাহেব, এখান থেকে বিদায়ের ব্যথা মনে খুব বাজছে!

শায়খের জীবনের শোকাবহ ঘটনাবলী

শায়খের জীবনে উপর্যুপরি দেখা দিয়েছে নানা প্রাণান্তকর বিপর্যয়-যা' হৃদয়কে দলিত মথিত, পৃষ্ঠদেশকে কুব্জ ও বক্ষদেশকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শায়খের মনোবল ছিল সর্বদাই অটুট। কোন একজন আল্লাহ্প্রেমিক ফার্সী কবির ভাষায় ঃ

خوشا وقت شو ریدگاں غمش * اگر ریش بینند دگر مرهمش
شراب محبت و مادم کشند * اگر تلغ بینند در دم کشند

তাঁর জীবনের প্রথম বিপর্যয়টি ছিল তাঁর সন্তান বৎসল ও কৃতী পিতার ইন্তিকাল। একান্তই তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে (উনিশ বছর বয়সে) ১৩৩৪ হিজরীর ১০ই যী কা'দা তারিখে এ বিপর্যয়টি ঘটে। এতে যে কেবল তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কে চাপ পড়লো, তাই নয় বরং পারিবারিক দায়িত্বের জগদ্দল পাথর ও বিপুল পিতৃঋণের বিরাট এক বোঝাও তাঁর মাথায় চেপে বসলো। বিশদ বিবরণ ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে। তারপর একটি বছর ঘুরে না আসতেই ২৫ রমযানুল মুবারক ১৩৩৫ হিজরীতে তিনি হারালেন তাঁর সন্তানবৎসলা আম্মাজানকে।

আরও ছয়টি মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই তিনি হারালেন পিতা-মাতার চাইতেও বাড়া তাঁর প্রিয় শায়খ ও আধ্যাত্মিক মুরুব্বী হযরত মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারানপুরীকে। তারিখটি ছিল ১৫ই রবিউছ্ছানী ১৩৩৬ হিজরী।

এ সময় হযরত শায়খ অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বল্তে পারতেন ঃ

حال من در بحر حضرت کمتر از یعقوب نیست
او پسر گم کرده بود ومن پدر گم کرده ام

"বিরহের ব্যথা ইয়াকুবের চেয়ে কম নয় মোটে আমার হিয়ায়
সন্তান-হারা ব্যথা ছিল তাঁর, আমি হারিয়েছি আমার পিতায় ।"

৫ই যিলহজ্জ ১৩৫৫ হিজরীতে তাঁর সহধর্মিণী চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ২১শে রজব ১৩৬৩ হিঃ (১২ই জুলাই '৪৪ইং) তারিখে স্বনামখ্যাত চাচা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র)-এর ওফাতের হৃদয় বিদারক ঘটনাটি ঘটে। এ বিয়োগান্ত ঘটনাটি কেবল তাঁর পরিবার বা বংশের জন্যই গুরুত্ববহ ঘটনা ছিল না বরং গোটা মুসলিম মিল্লাত ও দীনের জন্য যে এ কতবড় অপূরণীয় ক্ষতিকর ঘটনা ছিল, তা' সহজেই অনুমেয়। এতবড় ঘটনাকেও শায়খ তাঁর ঈমানী শক্তি, আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক ও অনন্যসাধারণ ধৈর্য দ্বারা এমনিভাবে মুকাবিলা করেন যে, বিরহ কাতরগণ তা' দেখে রীতিমত নিজেদের দুর্বলতার জন্য লজ্জাবোধ করেন। এ লেখকের খুব ভালভাবেই স্মরণ আছে যে, তাঁর দাফন কাফন শেষে আমি বাংলাওয়ালী মসজিদের বিরহবিধুর পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ হুমায়ূনের সমাধিক্ষেত্রের দিকে চলে যাই। মগরিবের নামাযান্তে অনেকটা বিলম্বে যখন এসে

তাঁর খেদমতে পৌছলাম, তখন তিনি সস্নেহে বললেন, "মওলভী সাহেব! কোথায় চলে গিয়েছিলেন? এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন? তোমাদের কি সেই হাদীছখানা মনে নেই–যাতে হুযূর (সা.) ফরমানঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ ব্যথাহত হয়, সে যেন আমার মৃত্যুজনিত ব্যথার কথা স্মরণ করে, কেননা, উম্মতের জন্য এর চাইতে বেশী বেদনাদায়ক ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না।" এমনি সময় দস্তরখান বিছানা হলো। তিনি সস্নেহে পাশে ডেকে নিয়ে অত্যন্ত আদর সোহাগসহ একের পর এক খাদ্যদ্রব্যাদি পরিবেশন করতে লাগলেন এবং বারবার বলে বলে খাওয়াতে লাগলেন।

তারপর ২৯শে যী কা'দা ১৩৮৪ হিঃ (২রা এপ্রিল ১৯৬৫ ইং) তারিখে দক্ষিণহস্ত, নয়নমণি ও গর্বের ধন ভাই মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ মন মগজকে তড়িতাহত করে ফেললো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শায়খ শুধু যে ধৈর্যের মাধ্যমে বিধির বিধানে সন্তুষ্ট (رضا بالقضاء) মনেরই কেবল পরিচয় দিলেন, তাই নয়, বরং তাঁর সন্তুষ্টিতেই আপন সন্তুষ্টির, (راضی برضا) এমনি পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন–যা' কেবল পূর্ববর্তী যুগের ওলী আল্লাহ্গণের অবস্থার সাথেই তুল্য হতে পারে। তাঁর এ ধৈর্য অন্যদের জন্য সান্ত্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর 'আপবীতি'তে লিখেনঃ

> "২৯ শে যী কা'দা ৮৪ হিঃ শুক্রবার মরহুমের সাহারানপুর পৌছবার ছিল। ঐদিন ভোরে তাঁর অসুস্থতার তারবার্তা পেলাম। ....তাঁর অসুস্থতার কথা আমার কাছে একটুও বিশ্বাস হচ্ছিলো না। জুমুআর নামাযের পর খাওয়া দাওয়া করে একটু শুয়েছি, এমন সময় ৪টার দিকে প্রিয় (পুত্র) তাল্হা এসে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বল্লো, সাবেরী সাহেবের লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। লাহোর থেকে ফোন এসেছে যে মামা হযরত ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুর জন্য কোন কাল অকাল নেই, এ অসম্ভব কিছুও নয়, তাই আমি আর বাক্যব্যয় না করে উযূ করে সোজা মাদ্রাসার মসজিদে গিয়ে বসলাম এবং নামাযের নিয়ত বেঁধে ফেললাম। কেননা, তাল্হার এখবর দেয়ার সাথে সাথে চারদিক থেকে লোক–জনের ভিড় জমে উঠলো। আর আমার এ সময় "হায়, কি হয়ে গেলো, কি অসুখ হয়েছিল? কবে হয়েছিল? কে খবর নিয়ে এলো?" ইত্যাকার অহেতুক কথাবার্তা অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকে। কেননা, এ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সময়

অত্যন্ত বরকতের হয়ে থাকে যখন মন منقطع عن الدنيا مبتل الى الاخرة অর্থাৎ পার্থিব সবকিছু থেকে বিমুখ এবং একান্তই পরকালমুখী থাকে। এ সময়ের তিলাওয়াত যিকির সবই খুব মূল্যবান হয়ে থাকে।

ক্রমে জনতার ভিড় বেড়েই চল্‌লো। মসজিদ, মাদ্রাসা, সড়ক সবই জনাকীর্ণ হয়ে গেল। আমি তকবীর পর্যন্ত সালাম ফিরিয়ে তাকিয়েও দেখলাম না। আসরের তকবীর হওয়ার সাথে সাথে সালাম ফিরালাম। তারপর ঘরে গেলাম। সেখানে ইতিমধ্যেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল।[১১]. . .

আমি যেনানা–দরজা বা অন্দর মহলের দরজায় দাঁড়িয়ে আহত কণ্ঠে বললাম, দুঃসংবাদ তো তোমরা সকলে শুনেছই। খুব কাছে থেকো কিন্তু, আমি ইশার পর তোমাদের কাছে আসবো। এর পূর্ব পর্যন্ত নিজেরা পড়ায় ও অন্যদেরকে পড়ানোর মধ্যে লেগে থেকো। ওখান থেকে বেরিয়ে দেখি পুরনো মাদ্রাসা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। আমি সমবেত বন্ধুদেরকে একটু রাগতঃ কণ্ঠে বললাম, আপনারা বসুন, আমার তো এ সময় কিছু অবশ্যই পড়তে হবে একথায় জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং আমি সোজা গিয়ে মসজিদে বসলাম।[১২]

তারপর ২৯শে শাবান ১৩৯৩ হিজরীতে অকস্মাৎ প্রিয় দৌহিত্র মওলভী মুহাম্মদ হারূনের মৃত্যু হলো। হারূন যেমন তাঁর চোখের মণি ছিলেন, তেমনি হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবেরও বংশের একক চেরাগ ছিলেন। এ যুবক ও প্রতিভাবান দৌহিত্রের (যার উপর তাঁর অনেক আশা ভরসা ছিল।)[১৩] ওফাতের খবর শায়খ পান মক্কা শরীফে। রমযানের সময় ছিল। শায়খ সবাইকে তাগিদ করলেন যেন খবরটা তাৎক্ষণিকভাবে মেয়েদের মধ্যে প্রচার করা না হয়, নতুবা কেউই আর সাহ্‌রী খাবে না। শুয়ে উঠার পর তিনি মেয়েদেরকে ডাকালেন এবং বললেন, তোমাদের তো আমার রীতিনীতি জানাই আছে। দুঃখবেদনা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু কান্নাকাটিতে না তোমাদের কোন উপকার হবে, আর না তাতে মরহুমেরই কোন উপকার সাধিত হবে। তার চাইতে বরং সারাদিন বসে মরহুমের জন্য কিছু পড় আর রাতের বেলা তাঁর পক্ষ থেকে উমরা কর। ঠিক একই কথা তিনি শোকজ্ঞাপনের জন্য আগতদেরকেও বললেন। শায়খ বলেন, অবিরতভাবে দু'শ উমরার খবর আমার নিকট পৌঁছলো। এসব উমরাই রমযানের মধ্যে হয়েছিল।[১৪–১৫]

এ উপলক্ষে এ লেখক প্রেরিত শোকবাণীর জবাবে লিখিত শায়খের পত্রের একটা উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করছি ঃ

"মাওলানা! অনেক শোক সহ্য করে এসেছি। এখন মন এমনি অনুভূতিহীন নিথর হয়ে গেছে যে, খুশী আর শোক সবই আমার পক্ষে এখন অনেকটা কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

لِكَيْ لاَ تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ

এর মত অবস্থা আমার হয়ে গেছে। হযরত সাহারানপুরী, তারপর চাচাজান, তারপর হযরত মাদানী (র), হযরত রায়পুরী এবং সর্বশেষে প্রিয় ইউসুফ মরহুম অনেকটা সিমেন্টের মত প্লাস্টার করে দিয়ে গেছেন যে, খুশী ও শোক উভয়টাই এখন আমার জন্য অনেকটা নেহাৎ সাময়িক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লী ও সাহারানপুর থেকে যখন কোন ভক্তের ব্যাপারে কোন পত্র আসে, তখন মনের অজান্তে তাৎক্ষণিকভাবে দু'চার ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। এমনিতে আল্লাহ্র ফযলে তেমন কোন অনুভূতি সবসময় থাকে না।

এসব দুর্ঘটনা ও আপদ বিপদের মধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ ও বিভাগ-জনিত পরিস্থিতিও একটি-যদ্দরুন তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দিল্লীতে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

শায়খ ২৯শে শা'বান ৬৬ হিজরী (১৯ জুলাই, '৪৭ ইং) তারিখে তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী রমযান শরীফ দিল্লীতে কাটাবার উদ্দেশ্যে নিযামুদ্দীন পৌছলেন এবং একমাসের ইতিকাফের নিয়তে 'মুকীম' হয়ে গেলেন। এ রমযানেরই ২৭ তারিখ শবেকদরে (১৫ই আগষ্ট) রাত বারটার সময় ভারত বিভাগের ঘোষণা হলো। দেশব্যাপী এক মহাপ্রলয় সংঘটিত হলো।[১৬]

এ মহাবিপর্যয়ের দরুন শায়খকে প্রায় চার মাসকাল নিযামুদ্দীনে অনেকটা বন্দী জীবন কাটাতে হলো।[১৭] দিল্লী থেকে ফিরে আসা ছিল চরম বিপজ্জনক। জীবজন্তুর কেটে কেটে বকরাঈদের গোশতের মতো বিনারুটিতে খেয়ে খেয়ে দিন কাটছিল। দিল্লীর রাস্তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও সীমিত হয়ে পড়েছিল। কেউ যদি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রেশন উঠিয়ে নিয়েও আসতো, তবুও রেশন আসতো ১৫ জনের আর স্থায়ীভাবে তখন ওখানে বাস করছিলেন ৫০ জনের মতো লোক। কেবল শিশুদেরই তাতে খোরাকী চলতো। ঘর এবং মসজিদে তল্লাশী চালানো হলো অনেকবার।

وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يَبْصِرُوْنَ

আয়াতের তাফসীরও সামনে এলো। কয়েকবারই নিযামুদ্দীন–এর বাংলো মসজিদ (তবলীগী মারকায) আক্রমণের প্রস্তুতির সংবাদ এলো। কিন্তু প্রত্যেকবারই আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করলেন। শায়খ যখন নিযামুদ্দীন গিয়েছিলেন, তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। কেবল একটা পাঞ্জাবী পাজামা ও এক প্রস্থ লুঙ্গী সাথে নিয়েছিলেন। জুমু–আর দিন লুঙ্গি পরে গায়ের কাপড় ধুইতে দিতেন। দেখতে দেখতে শীত এসে পড়লো। কাপড় ক্রয়ের সুযোগ কোথায়? সুফী মুহাম্মদ ইকবাল ২ টাকা দিয়ে জনৈক ফৌজী ব্যক্তির কাছ থেকে একটা সোয়েটার কিনে আনেন। শায়খ বলেন, ঐ সোয়েটারটা আমি পনের বছর পর্যন্ত পরেছিলাম।

ঐ অহেতুক বন্দীত্ব এবং কুরআন বর্ণিত البأساء والضراء তথা সংকীর্ণতা ও দুঃখের মুহূর্তে আরও একটি পরীক্ষার তাঁকে সম্মুখীন হতে হলো। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের সহধর্মিণী, মওলভী হারূনের আম্মা শায়খ–নন্দিনী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রতিদিনই মনে হতো, আজই বুঝি তাঁর জীবনের অন্তিম দিন। ২৯মে শাওয়াল ১৩৬৬ হিজরী (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ ইং) তারিখে তাঁর মৃত্যু হয় এবং বাসস্থানের পিছনের অংশে তাঁকে দাফন করা হয়। ঐ দুর্যোগময় দিনগুলোতে যখন ডাকও বন্ধ ছিল, যাতায়াতের তো কোন প্রশ্নই উঠে না, শায়খের প্রিয় জামাতা মওলভী সাইদুর রহমান কান্দেলবী যুবক বয়সে ইন্তিকাল করেন। এ সংবাদও শায়খ পেলেন দুইমাস পরে। দিল্লী থেকে সাহারানপুর যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। ২৮ যিলহাজ্জ ৬৬ হিজরী (১২ই নভেম্বর ১৯৪৭ ইং) তারিখে মাওলানা মাদানী অতিকষ্টে দিল্লী পৌছান। মাওলানাকে একটা সরকারী ট্রাক এবং সাথে তাঁর হিফাযতের জন্য সশস্ত্র পুলিশ দেওয়া হয়েছিল। ১৭ই নভেম্বর তারিখে হযরত শায়খ উক্ত ট্রাকযোগে মহিলাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সাহারানাপুর পৌছান। পথে ট্রাক বিকল হওয়ায় তাঁদের বেশ সংকট দেখা দেয়। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে ভালো ভালোয় তাঁরা সাহারানপুর পৌছে যান।

১১ই মুহার্‌রম '৬৭ হিঃ তারিখে মাওলানা মদনী রহমতুল্লাহি আলায়হি দেওবন্দ থেকে এবং হযরত রায়পুরী রায়পুর থেকে সাহারানপুর তশরিফ আনেন এবং সেই ঐতিহাসিক বরং ইতিহাস সৃষ্টিকারী পরামর্শ করেন– যার ফলশ্রুতিতে উক্ত তিন মনীষীই যে কেবল হিন্দুস্তানে স্থায়ীভাবে রয়ে যাওয়ার (পাকিস্তানে

হিজরত না করার) সিদ্ধান্ত করলেন তাই নয়, বরং জেলা সাহারানপুর, মীরাট এবং গোটা পশ্চিম ইউ. পি এলাকার মুসলামানগণ পিতৃপুরুষের ভিটামাটি আঁকড়ে ধরে থাকেন।[১৮]

সাহরানপুরের একনিষ্ঠ খাদেমগণ

আল্লাহ্ তা'আলা শায়খকে এমন কিছু উৎসর্গীকৃত প্রাণ, মিযাজ উপলব্ধিকারী সেবাপরায়ণ খাদেম দান করেছিলেন (যা' সাধারণতঃ তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দিয়ে থাকেন)–যা অনেক বড় বড় রঈস ও আমীর ব্যক্তিদেরও ভাগ্যে জুটে না। এঁদেরই একজন ছিলেন শায়খের একজন একনিষ্ঠ খাদেম মওলভী আবদুল মজীদ সাহেব। তিনি হযরত শায়খের খিদমতের জন্য নিজের জীবন ওয়াক্ফ করে রেখেছিলেন। তিনি দিনরাত শায়খের দরজায় পড়ে থাকতেন। শায়খের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা, এমনকি ছোটখাট ব্যাপারেও তিনি যে হযরত শায়খকে খুশী করবার কেমন যত্নবান থাকতেন, হযরত শায়খ তা' অত্যন্ত সরস ভাষায় বিশদভাবে বর্ণনা করতেন। শায়খের ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৯]

তাঁর চাচা শায়খ নসীরুদ্দীন সাহেব, মুহতামিম, কুতবখানা ইয়াহ্ইয়াবী ও নাযিম, উম্মুল মুদারিস ছিলেন শায়খের ব্যক্তিগত সচিব স্বরূপ। নাশতা ও উভয়বেলার আহার্য প্রস্তুত করা এবং মেহ্মানদের দেখাশোনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকতো। মেহমানের সংখ্যা কত বেশী হলো বা খরচ কত বেড়ে গেল, তা' নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না' কুতুবখানার আয় এবং শায়খের সময় সময় দানই এজন্যে যথেষ্ট ছিল। রমযান শরীফের শুরুতে কয়েক শ' টাকা করে এবং শেষের দিকে কয়েক হাজার টাকা করে দিয়ে মেহ্মানদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল তাঁরই কাজ–যা' তিনি অত্যন্ত ধৈর্য স্থৈর্য্য সহকারে এবং খুশী মনেই আঞ্জাম দিতেন। শায়খের জীবদ্দশায়ই ৪ জমাঃ উলা ১৪০১ হিঃ (১১ই মার্চ ১৯৮১ ইং) তারিখে তাঁর মৃত্যু হয় এবং শায়খ তাতে অত্যন্ত মর্মাহত হন।

উক্ত দু'জন ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা শায়খকে আর একজন একনিষ্ঠ খাদেম দান করেন যিনি পরবর্তীকালে তাঁর মেজাজ বুঝে চলার এবং সেবার দ্বারা শায়খের এমনি নৈকট্য হাসিলে সমর্থ হয়েছিলেন যা' অনেক পুরনো ও সুদীর্ঘকালের খাদেমেরও ভাগ্যে জুটেনি। এ লেখকের খুব ভাল করেই স্মরণ আছে যে, হযরত

রায়পুরীর দীর্ঘকাল সাহারানপুরের বিখ্যাত ভট হাউসে অবস্থানকালে (১৩৭৯ হিঃ, ১৯৫৯ ইং) দু'তিনজন নওজোয়ান শায়খের কাছে যাতায়াত করতেন। তন্মধ্যে একজন খুব শিগগীরই তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। এবং অবশেষে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে শায়খের চরণে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। দেখতে দেখতে তাঁর বেশভূষা ও পোশাক-আশাকে বেশ পরিবর্তন সূচিত হলো। হযরত শায়খেরও তাঁর রুচি-অভিরুচি এবং মেজাজ বুঝে চলার যোগ্যতা অত্যন্ত পসন্দ হলো এবং তিনি তাঁকে প্রাণভরে খেদমত করার সুযোগও দান করলেন। ইনি ছিলেন আলহাজ্জ আবুল হাসান। ইনি সাহারানপুরের ইসলামিয়া কলেজের সহকারী কেরানী এবং ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন। শায়খের খেদমত তাঁর কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলো যে কলেজের চাকরীকেও জবাব দিয়ে দিলেন! শায়খের হিজায ও পাকিস্তানের সফরসমূহে তিনি তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হন। অবশেষে মদীনা শরীফে গিয়েও শায়খের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং হযরত শায়খের জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

টীকা ঃ

১. ১৩৭৩ হিজরীর ২রা যিলহাজ্জ মুতাবিক ১২ই আগষ্ট ১৯৫৪ ইং তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২. আপবীতী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ঃ ২৫৮-২৬৮

৩. আরবী সময় -যা' এখনো নামায প্রভৃতির ব্যাপারে হিজাযে প্রচলিত আছে।

৪. প্রথমে প্রথমে তো ফজরের অব্যবহিত পরেই কাঁচা ঘরে তশরীফ নিয়ে আসতেন, কিন্তু ক্রমেই সময়ের দূরত্ব বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াতে ওযীফায় কাটিয়ে তারপরেই আসতেন, তবে কোন বিশেষ মেহমান বা প্রিয়জনের আগমন প্রভৃতিতে মাঝে মধ্যে এর ব্যতিক্রমও হতো।

৫. আপবীতি, ২য় খণ্ড

৬. ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ঃ ৯২

৭. ঐ, পৃ. ঃ ৭

৮. একটি পত্রে শায়খ লিখেন ঃ

আলী মিঞা, অনেক রোগের শিকার হয়ে পড়েছি। কিন্তু সকল কষ্টের মধ্যেই আরাম আছে অবশ্য চোখের অসুখ কেবল কষ্টই কষ্ট। কারণ, এর দরুন ইল্মী কাজ কর্মে অপারগ হয়ে গেছি। অনেক বলা কওয়ার পর মাদ্রাসাওয়ালারা বুখারী আর রদ করেননি। এখন হাফেজ্জী বনে গিয়ে মুখস্থ পড়িয়ে যাচ্ছি! (যিলহাজ্জ ১৩৮৭)

৯. হযরত শায়খের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার খাস মোয়ামেলাই বলতে হবে যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরই তত্ত্বাবধানে তিনি তাঁর নিজস্ব শাস্ত্র ইল্মে হাদীছে কিছু শিষ্যকে তৈয়ার করতে সমর্থ হন। এঁদের

মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব জৌনপুরী ও মওলভী মুহাম্মদ আকিল সাহেব সাহারানপুরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম জনকে হযরত শায়খ তাঁর সাহারানপুরে অবস্থানকালেই হাদীছে শিক্ষাদানের মসনদে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ১৩৮৮ হিজরীর ২৫ শে শাওয়াল তারিখে বুখারী শরীফের দরস শুরু করে দেন। উদ্বোধন স্বয়ং হযরত শায়খই করিয়ে দেন। মওলভী আকিল সাহেবকেও হযরত শায়খ তাঁর লেখা ও গবেষণার কাজে শরীক করে হাদীছের খেদমতের জন তৈরী করে দেন এবং তিনিও পুরনো উস্তাদদের স্থান দখলে সমর্থ হন।

উপরোক্ত দু'জন ছাড়াও শায়খের হাদীছের শাগরিদগণ হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে (এবং বাংলাদেশেও–অনুবাদক) ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। তাঁরা স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে হাদীছের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। এঁদের মধ্যে মাওলানা আবদুল্ জব্বার সাহেব আযমী, মাওলানা মুনাওয়ার হুসায়ন সাহেব, মাওলানা ইযহারুল হাসান কান্দেলবী, মাওলানা আবদুল হালীম সাহেব জৌনপুরী (বাংলাদেশে মাওলানা মুহিবুর রহমান সাহেব জালালাবাদী–আনুবাদক) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য

এঁদের মধ্যে আরও রয়েছেন প্রিয় মওলভী তকীউদ্দীন নদভী মাজাহেরী–যিনি আবুধাবীর বিচার বিভাগের উপদেষ্টা ছিলেন এবং বর্তমানে 'জামেয়াতুল আইনে' হাদীছের প্রধান অধ্যাপক। সম্প্রতি ইনি বায়হাকীর "কিতাবুল যুহ্দের" উপর গবেষণা কর্ম চালান এবং তা সম্পদনা করে কায়রো থেকে প্রকাশও করেন। আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয় এজন্য তাঁকে ডক্টরেট প্রদান করে

১০. সাওয়ানিহে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব কান্দেলভী, ২৬০–৬২ (সংক্ষিপ্ত)

১১. আপবীতি, ৩য় খণ্ড, পৃ.ঃ ৯৭–৯৮

১২. ঐ, পৃ.ঃ ৯৮

১৩. মৃত্যুকালে মওলভী হারূনের বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর। বিস্তারিত জীবনী জানতে হলে পড়ুন প্রিয় মওলভী মুহাম্মদ ছানী মরহুম প্রণীত "তায়কেরাযে মওলভী হারূন কান্দেলভী"

১৪. আপবীতি, পৃ. ঃ ৩–৩০

১৫. ১৭ রমযান ১৩৯৩ (১৩ অক্টোবর ১৯৭৩ ইং) তারিখে লিখিত পত্র

১৬. বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন সাওয়ানিহে মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (রহ)। অষ্টম অধ্যায়

১৭. আপবীতি, ৫ /৯–১২

১৮. আপবীতি ৫/২৭–৩০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত দেখুন

১৯. তাঁর মৃত্যু তারিখ ১৪ই শাবান ১৩৭০ হিঃ মুতাবিক ৩১শে মে ১৯৫৩ ইং

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত শায়খের জীবনে রমযান পালনের সনিষ্ট কর্মসূচী ও এ উপলক্ষে অনন্যসাধারণ সমাবেশ

আল্লাহ্ প্রেমিক মনীষীদের রমযান বরণের নমুনা

রমযানুল মুবারক একাধারে কুরআনঅবতরণবার্ষিকী, রহমত, বরকত ও তজল্লীর মাস, ইবাদত বন্দেগীর বসন্তকাল এবং আধ্যাত্মিকতার অভিষেক অনুষ্ঠান স্বরূপ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) রমযানুল মুবারকে পুণ্য কার্যাদিতে ঝঞ্ঝা বায়ুকেও ছাড়িয়ে যেতেন।[১ ও ২] হযরত আইশা (রা) ফরমান ঃ রমযানের শেষ দশক উপস্থিত হলে হুযূর (সা) পূর্ণরাত জেগে কাটাতেন এবং ইবাদত-বন্দেগী নফল নামাযাদির জন্য কোমর কষে বাঁধতেন। আল্লাহ্ প্রেমিক ওলী-আল্লাহ্গণ এবং আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাগণের জন্যও এ মাসটি হচ্ছে মনের আশা পূরণের প্রিয়তম মাস। তাই এ মাসটির আগমনপ্রতীক্ষায় তাঁরা সারা বছর ধরেই দিন গুণতে থাকেন। প্রাথমিক যুগের ওলীআল্লাহ্গণের কথা নয়, নিকট অতীতের কোন কোন বুযুর্গ সম্পর্কেও শুনা যায় যে, ঈদের চাঁদ দেখার পর থেকেই তাঁরা পরবর্তী রমযানের অপেক্ষা শুরু করে দিতেন। রমযানুল মুবারক আসতেই তাঁদের অন্তরে এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হতো।[৩] তাঁদের হাবভাবে যে কথাটি ফুটে উঠতো তা' হলো ঃ

هذا الذى كانت الايام تنتظر
فليوف لله اقوام بما نذروا

এই সেই শুভক্ষণ
যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা ছিল কো যাহার,
আল্লাহ্র নামে মানত যাদের
সুবর্ণ সুযোগে তারা করে নিক্ বিহিত তাহার।

আবার কখনো বা উতালা মনে গজলের কলি ভাজেন ঃ

پلا ساقیا وہ مئے دل فروز
کہ آتی نہیں فصلِ گل روز روز

"মন মাতানো শরাব আজি পিলাও আমায় বন্ধু সাকী!
এমন ফুলের বসন্তকাল নিত্য কভু আসে নাকি?"

রমযানুল মুবারক আসতেই দীনী ও রূহানী তথা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রসমূহ ও খানকাহ্সমূহের পরিবেশের পরিবর্তন সূচিত হতো। স্থায়ীভাবে এসব কেন্দ্রে বসবাসকারিগণ ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তমুরীদান ঠিক তেমনি ছুটে আসতেন যেমন ছুটে আসে লোহা চুম্বকের টানে অথবা পতঙ্গ প্রদীপের পানে। এসব আধ্যাত্মিক কেন্দ্র তিলাওয়াত ও নফল ইবাদত প্রভৃতি দ্বারা এমনিভাবে মুখর থাকতো যেন দিবারাত্রির মধ্যে এছাড়া আর কোন কাজ নেই আর এ রমযানের পর আর কোন রমযান আসবে না। প্রতেকে অন্যদের উপর বাজীমাত করতে চাইতো এবং রমযানের প্রতিটি দিনকে রমযানেরই কেবল নয়, নিজের জীবনের অন্তিম দিন বলে মনে করতো।

আল্লাহ্র যে বান্দাই কিছুক্ষণের জন্য এ পরিবেশে এসে পড়তো সে-ই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর কথা বে-মালুম ভুলে যেতো। মুর্দা প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার হতো, সাহসহারাগণ বুকে সাহস ফিরে পেতো, বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রাণে প্রাণে তরঙ্গায়িত হতো। আধাত্মিকতার এ মহড়া স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য যাদেরই হতো, তাদের মন সাক্ষী দিতো যে, আল্লাহ্ প্রেমিকদের এ আধ্যাত্মিক সাধনা, আল্লাহ্কে পাওয়ার এ আকূতি, এ কর্মকোলাহল, দীন ও রূহানিয়াতের পতঙ্গদের এহেন ভীড়, পার্থিব স্বার্থ ও ভোগ-বিলাস ভুলে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য এত লোক যতদিন এভাবে সমবেত হতে থাকবে, ততদিন আর যাই হোক, পৃথিবী ধ্বংসের আর এর অধিবাসীদের জীবনের পাট চুকাবার ফায়সালা হতে পারে না। এ দৃশ্য দেখলে মনের অজান্তেই স্মরণ পড়ে যায় ফার্সী কবি হাফিযের পংক্তিটি ঃ

از صد سخنِ پیرم یک نکتہ مرا یاد است
عالم نشود و یراں تا میکدہ آباد است

"গুরুর শতেক বাণীর মাঝে স্মরণ আছে একটি বাণী
'মদ্যশালা' থাকতে চালু লয় পাবে না জগৎখানি।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, হিজরী অষ্টম শতকে সুলতানুল মাশায়েখ মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার গিয়াসপুরের (দিল্লী) খানকাহ্ এবং ত্রয়োদশ শতকে হযরত শাহ্ গোলাম আলী (র)-এর চাতলী কবরস্ত (দিল্লী) খানকাহে মাযহারিয়ার রমযানুল মুবারকের অবস্থাদি কোন প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকের বিবরণে পাওয়া যায় না। সেখানকার যিকির-আযকার, তিলাওয়াত, নফল ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ও দিবারাত্রির নির্ঘন্ট কোন পুস্তকে বিস্তারিত পাওয়া যায় না। কিন্তু ফাওয়াইদুল ফুয়াদ, 'সিয়রুল আউলিয়া ও দুররুল মা'আরিফ গ্রন্থে-এর কিছু ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি সেসব খানকাহ্র দিবারাত্রি এবং ঐ মহাত্মাগণের ইবাদতের উৎসাহ উদ্দীপনা ও তাঁদের অন্তরের দাহন সম্পর্কে অবহিত তারা সে বিন্দু থেকে লিপি এবং সে অসম্পূর্ণ রেখাগুলো থেকে পূর্ণ চিত্র আঁকতে পারবেন। ফার্সী কবির ভাষায় ঃ

قیاس کن ز گلستانِ من بہار مرا

আমার বাগান দেখেই বুঝো নাও
বসন্তটি কেমন আমার!

কিন্তু যেসব খানকাহ্ ও রূহানীয়াতের কেন্দ্রসমূহ সেসব খানকার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে আর যে উলামা ও মাশায়েখ পূর্ববর্তী যুগের সে বুযুর্গগণের উত্তরাধিকারী হয়েছেন, তাঁরা সেসব পুরনো দৃশ্যকে আবার জীবন্ত করেছেন এবং তাঁদের যুগে সে পুরনো ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, সেসব ভাগ্যবান লোকের দেখা তো এখন কৃচিতই পাওয়া যাবে-যাঁরা গাঙ্গুহ্তে কুৎবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র)-এর যুগে রমযানের বাহার দেখেছেন, কিন্তু এমন লোকের অভাব নেই-যাঁরা গাঙ্গুহের সে যুগের পর শায়খে-ওয়াক্ত হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেব রায়পুরীর যুগে রায়পুরের এবং হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর যুগে থানাভবনে রমযানের বাহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর আজ যখন তাঁরা সেদিনের সে মধুময় স্মৃতির কথা স্মরণ করেন, তখন তাঁদের কলিজা মোচড় দিয়ে উঠে।[৪]

মাওলানা মাদানীর রমযান পালন

আমাদের জানা মতে এই শেষযুগে যিনি পূর্ববর্তীযুগের বুযুর্গগণের বহুল আচরিত সুন্নতকে পুনর্জীবিত করেছেন এবং এতে নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করেছেন,

তিনি হচ্ছেন শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী (র)। তিনি তাঁর বিশিষ্ট ভক্তমুরীদানের আবেদনক্রমে কোন এক বিশেষ স্থানে অবস্থান করে রমযান শরীফ অতিবাহিত করার অভ্যাস করে ফেলেন। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তমুরীদান পতঙ্গের মতো ছুটে আসতেন। হযরত সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সিলেটে রমযান শরীফ অতিবাহিত করেন। তারপর কয়েক বছর বাঁশকান্দিতে[৫] রমযান শরীফ কাটান। দু'এক বছর তিনি তাঁর মাতৃভূমি ফয়যাবাদ জেলার টাণ্ডার নিকটবর্তী এলাহদাদপুরস্থ আপন বাসস্থানে রমযান শরীফ অতিবাহিত করেন। এসব স্থানেই তাঁর শত শত মুরীদান ও খাদেম এবং রমযানের সমাদরকারিগণ একত্রিত হতেন। এঁরা সবাই পূর্ণ মাস তাঁর মেহমান হয়ে থাকতেন। তিনিই তাঁদেরকে (তারাবীহতে) কুরআন শরীফ শুনাতেন। লোকজন পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে তিলাওয়াত, যিকির, নফল নামায প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকত। খাদেমগণ আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি টের পেতেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁরা সে মধুময় স্মৃতিগুলোর কথা আলোচনা করে করে স্বাদ পেতেন।[৬]

আল্লাহ্ চাইলে এবং হযরত মাওলানা বেঁচে থাকলে এলাহ্দাদপুরে হয়তো এ বরকতময় সিলসিলা অব্যাহত থাকতো এবং আল্লাহ্ই জানেন কত লোক যে এভাবে সাফল্যের অধিকারী এবং সাধনার স্তরসমূহ অতিক্রম করে কামালিয়াত অর্জনে সক্ষম হতেন। কিন্তু ১৩ই জমাদউল উলা ১৩৭৭ হিঃ বৃহস্পতিবার মুতাবিক ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ ইংরেজী তারিখে তাঁর ওফাতের ফলে এ ধারা বন্ধ হয় যায় এবং তা লোক-জনের জন্য আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রায়পুর ও অন্যান্য স্থানে রমযানুল মুবারক

আমার মুর্শিদ হযরত মাওলানা আবদুল কাদির সাহেব রায়পুরীর এখানেও রমযান পালিত হতো অসাধারণ গুরুত্বের সাথে। দেশ বিভাগের পূর্বে পাঞ্জাবের ভক্তমুরীদান বিপুল সংখ্যায় শা'বানের শেষদিকে রমযান কাটানোর জন্য রায়পুর চলে আসতেন। এঁদের মধ্যে অনেক আলিম উলামা পীর-মাশায়েখও থাকতেন। এভাবে এমন একটি অজগাঁয়ে—যেখানে পৌছবার জন্য একটা পাকা সড়কও ছিল না, পাশে কোন রেলষ্টেশনও ছিল না—পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এমন একটি স্থানে পূর্ণ একনিষ্ঠতার সাথে রমযান কাটানোর জন্য তাঁরা ছুটে আসতেন এবং পূর্ণ রমযান ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে রমযানের সময়গুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ঈদের নামায

পড়েই তবে সকলে যার যার বাড়িতে ফিরতেন। সে যুগে রায়পুরের খানকাহ্র কী পরিবেশ থাকতো, শায়খ ও তালেবীনের অবস্থা কী হতো, তার কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে এ লেখকের লিখিত "সাওয়ানিহে হযরত মাওলানা আবদুল কাদির সাহেব রায়পুরী" পাঠে।[৭]

রায়পুর ছাড়াও ভট হাউস (সাহরানপুর), সূফী আবদুল হামিদ সাহেব (পাঞ্জাবের সাবেক মন্ত্রী)–এর লাহোর জেল রোডস্থ কুঠি, পাকিস্তানের মারী পাহাড়ের ঘোড়াগলি এবং লয়ালপুরের মসজিদে খালিসা কলেজেও এমনি ধুমধামের সাথে রমযান শরীফ অতিবাহিত হয় যে, প্রত্যেক স্থানেই কয়েক শ' করে খাদেম ও ভক্তমুরীদান অহরহ তিলাওয়াত, যিকির–আযকার ও রিয়াযত মুজাহাদায় লিপ্ত থাকতেন।

হযরত শায়খের রমযান পালন

এ সুন্নতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা বরং এর প্রসার ও উন্নতি বিধানের দায়িত্ব অর্পিত হলো এমনি এক ব্যক্তিত্বের উপর, যাঁর উপরে তাঁর পূর্বসূরি উস্তাদ মুরব্বীদের অনেক গৌরবজনক কীর্তির হিফাযত, তাঁদের অনেক রচনার প্রচার এবং অনেক অসম্পূর্ণ ব্যাপারের পূর্ণতা বিধানের ভার অর্পিত হয়েছিল।[৮] এমনিতেই তো রমযানের ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান থাকা, নির্জনতা অবলম্বন ও একাগ্রতা সর্বযুগেই আল্লাহ ওয়ালাদের বৈশিষ্ট্যরূপে বিরাজমান রয়েছে। কিন্তু শায়খের ওখানে রমযানের ব্যস্ততা, একাগ্রতা ও নির্জনতা অবলম্বন যে কিরূপ ছিল তা' বুঝবার জন্যে একটা মজার ঘটনা বেশ সহায়ক হবে।

শায়খের ওখানে রমযান মাসে সাক্ষাৎ তো দূরের কথা, কথা বলারও অবকাশ ছিল না। যেখানে দৈনিক কুরআন শরীফের এক খতম করতে হতো বরং সতর্কতার জন্যে (পাছে রমযান ২৯শা হয়)[৯] আর একটু বেশী তিলাওয়াত করতে হতো, সেখানে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা বলার অবকাশ খুব কমই ছিল। হাকীম তৈয়ব সাহেব রামপুরী মরহুমের হযরত শায়খের সাথে পুরাতন খান্দানী সম্পর্ক ও মেলামেশা ছিল। আর হযরত হাকীম যিয়াউদ্দীন সাহেবের–যিনি এই সিলসিলার একজন অন্যতম শায়খ ও মুরব্বী ছিলেন–সাথে সম্পর্ক থাকার দরুন হযরত শায়খও এই সিলসিলার অন্যান্য বুযুর্গণ তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করতেন। একবার ইনি রমযান মাসে হযরত শায়খের কাছে আসলেন। তিনি হযরত শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করতে

চাইলে খাদেমগণ জানালেন, রমযানের এ চরম ব্যস্ততার সময় হযরতের কথা বলার ফুরসৎ নেই। তারপর যখন তাঁর হযরত শায়খের সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন তিনি শায়খকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"ভাইজান, আস্‌সালামু আলায়কুম। কথা বলতে চাই না,
কেবল এটুকুই বলতে চাই, রমযান আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের
ওখানেও এসে থাকে। কিন্তু কখনো এভাবে জ্বরের মতো আসে না।
আস্‌সালামু আলাইকুম। আসি তা' হলে!"১০

রমযান শরীফের সময়সূচি

রমযানুল মুবারকে শায়খের দৈনন্দিন কর্মসূচীতে অনেক পরিবর্তন সূচিত হতো। কর্মচাঞ্চল্য, ইবাদত ও তিলাওয়াতের আগ্রহ ও উৎসাহ এবং একাগ্রতা ও পার্থিব ব্যাপারসমূহ থেকে সংশ্রবহীনতা চরমে পৌঁছতো।

এ লেখকের একবার (১৩৬৬/১৯৪৬ ইং) রমযানের পূর্ণ মাস তাঁর সাথে কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেবার তিনি নিযামুদ্দীনেই অবস্থান করছিলেন। শায়খের বিশেষ স্নেহমমতার সুযোগে অত্যন্ত নিকট থেকেই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। পূর্ণ মাসব্যাপী ইতিকাফ চলছিল। দৈনিক অবশ্যই এক খতম কুরআন শরীফ পড়তে হতো। বরং (রমযান শরীফ ২৯শা হলেও যাতে খতম ৩০ খানা হতে অসুবিধা দেখা না দেয় তার জন্য) দৈনিক কিছু বাড়তিও পড়তে হতো। দৈনন্দিন কর্মসূচী হতো এরূপঃ ইফতার কেবল একটি মদনী খেজুর দ্বারা, তারপর এক পেয়ালা চা ও এক খিলি পান। মগরিবের নামাযের পরই আওয়াবীনের নামায শুরু করে দিতেন। তাতে বেশ কয়েকপারা কুরআন শরীফ পড়তেন। আওয়াবীনের নামাযের পর এবং ইশার নামাযের পূর্বে একটি খাস মজলিস হতো। এতে কেবল বিশেষ খাদেমগণ ও প্রিয়জনরাই থাকতেন। ইশা ও তারাবীর পর আবার মজলিস হতো। তাতে হালকা নাশতা আমরুদ বা কলার চাটনী অথবা ফুলকবড়া, তাও অল্প পরিমাণে। তখনও কিন্তু খাওয়া দাওয়ার নামটি পর্যন্ত নেই। এটা ছিল গ্রীষ্মকালের কথা। মাওলানা মুহম্মদ ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলায়হি খুব ধীরে থেমে থেমে কিরাআতে অভ্যস্ত ছিলেন। এজন্যে তারাবীতে বেশ দেরী হতো। ঘন্টা দেড় ঘন্টা মজলিসে বসে হাযিরীনে–মজলিস বিশ্রাম গ্রহণের জন্য চলে যেতেন। শায়খ তখন নফলে প্রবৃত্ত হতেন। এক মিনিটও শোবার অভ্যাস ছিল না। সাহ্‌রী খেতেন

একেবারে শেষ ওয়াক্তে এবং দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে খাবার বলতে এই এক বেলাই ছিল। ফজরের নামায আউয়াল ওয়াক্তেই পড়া হতো। ফজরের পরই বিশ্রাম করতেন এবং বেলা হলে পর উঠতেন। দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এটাই ছিল শোবার একমাত্র সময়। তারপর সারাদিন কুরআন শরীফের দওর চলতো। যেটুকু সময় পাওয়া যেতো কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও দওরেই তা' কাটতেন।

রমযানের এ চরম ব্যস্ততা স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি সত্ত্বেও ক্রমেই বাড়তে থাকে। ১৩৮৫ হিজরী (১৯৬৫–৬৬ ইং)–এর রমযান পালনের বিস্তারিত নির্ঘন্ট একজন অষ্টপ্রহরের সাথী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি।[১১] এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"মধ্য শা'বান থেকে ২৮ রমযান পর্যন্ত যেসব মেহমান বাইরে থেকে আসেন এবং পূর্ণ রমযান অথবা রমযানের কিছু অংশ কাটিয়ে চলে যান জনৈক খাদিম তাঁদের নামের একটি তালিকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈয়ার করেছিলেন। তাতে ৩১৩ জন মেহ্মানের নাম আছে।

হযরত শায়খের রমযান শরীফের সময়সূচি ছিল এরূপ ঃ লোকজন যখন সাহ্‌রী খাওয়ার জন্য উঠতো, হযরত শায়খ তখন লিপ্ত হতেন নফল নামাযে। একেবারে সাহ্‌রীর শেষ ওয়াক্তে দু'একটা ডিম খেতেন এবং এক কাপ চা পান করতেন। তারপর ফজরের জামাআত পর্যন্ত বালিশে ঠেস দিয়ে লোকজনের দিকে মুখ করে বসে থাকতেন। মেহ্মানগণ তাঁর দিকে মুখ করে বসে থাকতেন। ফজরের পর আরাম করতেন প্রায় নয়টা পর্যন্ত। তারপর প্রাত্যহিক কর্ম সেরে নফল নামাযে লিপ্ত থাকতেন দুপুর পর্যন্ত। তারপর ডাক দেখতেন এবং কিছু জরুরী পত্রাদি লেখাতেন যুহর পর্যন্ত। তারপর নামায পড়তেন। যুহরের নামায পড়েই আবার তিলাওয়াত শুরু করতেন এবং আসর পর্যন্ত তা' চলতো। মেহ্মানদের প্রতি কায়মনোবাক্যে যিকিরে মশগুল থাকার নির্দেশ ছিল। আসরের পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই চলতো। যাকেরীন যিকিরে এবং অন্যরা এভাবে তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। আসরের নামাযের পর হযরত নিজে কুরআন শরীফ শুনাতেন। অধিকাংশ মেহমান হয় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুনতেন নতুবা নিজেরাও তিলাওয়াতে থাকতেন ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত। ইফতারের কয়েক মিনিট পূর্বেই তিলাওয়াত বন্ধ করে কিছুক্ষণের জন্য মুরাকাবায় বা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। মেহমানদের প্রতি তখন মসজিদের আঙিনায় ইফতারীর দস্তরখানে চলে যাওয়ার নির্দেশ থাকতো আর নিজে পর্দার

অন্তরালে একান্তই নিভৃতে থাকতেন। আযানের সাথে সাথে মদীনার খেজুর ও এক পিয়ালা যমযমের পানি দিয়ে ইফতার করতেন। তারপর ধ্যানমগ্ন হতেন বা ঠেস লাগিয়ে বসতেন। মগরিবের নামাযের পর মেহ্মানদেরকে আহার করানো হতো আর হযরত আযানের আধঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নফল নামাযে লিপ্ত থাকতেন। এ সময় দু'একটি ডিম খেতেন। তারপর এক পেয়ালা চা। এ চাও সপ্তাহ দশদিন পরে অনেক বলার পর ধরেছেন। অনুরূপভাবে ডিমও অনেক বলার পর মঞ্জুর করেছেন। ভাতরুটি তো পূর্ণ রমযান মাসে বরং তার একদিন পূর্বেও মোটেও মুখে দেননি।

ইশার আযানের আধঘন্টা পূর্বে পর্দা তুলে দেয়া হতো। হযরত ঠেস দিয়ে মেহমানদের দিকে মুখ করে বসতেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এ সময় নতুন আগন্তুকগণ দেখা করতেন। তারপর আযান হতেই যার যার প্রাকৃতিক কর্মাদি সেরে প্রথমে নফল তারপর ইশার ও তারাবীহর নামাযে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। এবারকার রমযানে তিন ভাগে কুরআন শুনেন। প্রথমে শুনান মুফতী ইয়াহ্ইয়া সাহেব, তারপর হাফিয ফুরকান সাহেব তারপর সাহেবজাদা সালমান— মুফতী ইয়াহ্ইয়া সাহেবের পুত্র।পূর্ণমাস ইতিকাফে অতিবাহিত হয়।মেহ্মান-দেরও অধিকাংশই ইতিকাফ করেন এমন কি কোন কোন সময় ডাকঘরে যাবার মতো একটা লোকও খুঁজে পাওয়া যেতো না। হযরতের ৩/৪ জন খাদেমকেই কেবল প্রয়োজনের খাতিরে ইতিকাফের বাইরে থাকতে দেখা যায়।

রমযানের শেষ দশক বা তারও কিছু পূর্বে কোন কোন বন্ধুবান্ধবের বার বার মিষ্টি বা কাবাব আনার দরুন তারাবীহ্র পর এক দু'লোকমা শামী কাবাব বা মিষ্টান্ন ও মুখে দিতেন। কিন্তু অধিকাংশই বিলিয়ে দিতেন। রমযানের শুরুর দিকে ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, তারাবীর পরে কিতাব পাঠ করা হবে। হযরত নিজেই তা' বলে দিয়েছিলেন। তাই তারাবীহ্র পর কিতাব পড়া হতো। আর এ সময় চানা বা ফুলকি প্রভৃতি পরিবেশনের যে প্রথা পূর্ব থেকে চলে আসছিল, সময়ের অপচয় রোধের জন্য এবার তা' বন্ধ করে দেয়া হয়। কিতাব পাঠ শেষে হযরত বলতেন, "হযরতরা! এবার যান, মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করুন গে!" অধিকাংশ মেহ্মানই তখন তিলাওয়াত ও নফল নামায প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হতেন। হযরত নিজেও আপন সাধনায় লিপ্ত হয়ে পড়তেন। কিছুক্ষণ পর পর কিছুক্ষণের জন্য আরামও করতেন। কিন্তু তাও হাদীছে বর্ণিত

تَنَامُ عَيْنِى وَلَا يَنَامُ قَلْبِى

(আমার চোখই কেবল ঘুমায়, অন্তর ঘুমায়না) এরই অবস্থা হতো। কোন কোন সময় পার্শ্বেই অবস্থানরত আবুল হাসানকে কোন কোন কথাও বলতেন। তিনি এও বলতেন, তোমাদের তিলাওয়াত বা যিকিরের দ্বারা আমার আরামে কোনই বিঘ্ন হয় না।"

পরবর্তী রমযান (১৩৮৬ হিজরী) মাসের নির্ঘন্ট অনেকটা এরূপই ছিল। কোন কোন ব্যাপারে একটু পরিবর্তনও হয়েছিল। মাওলানা মুনাওয়ার হুসায়ন সাহেব বিহারী[১২] তাঁর পত্রে যেসব অবস্থার কথা লিখেছেন, তার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ঃ

২৯শে শাবানের ফজরের নামাযের পূর্বেই মেহমানগণও ই'তিকাফ্কারিগণ বিছানা বিছিয়ে নিজ নিজ আসন দখল করতে শুরু করে দেন। ফজরের পর যারা গিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই জায়গা পেয়েছিলেন তৃতীয় কাতারে। হযরত আগেই এলান করে দিয়েছিলেন যে, ২৯শে শা'বান আসরের পরেই ই'তিকাফের নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তরিত হবেন। তিনি তাই করলেন। সাথে সাথে নব্বুই জনের অধিক এবং একশ' থেকে ৩/৪ জন কম মেহ্মানও নতুন ছাত্রাবাসের মসজিদে অবস্থান ও ই'তিকাফের নিয়্যাতে পৌছে গেলেন। মস-জিদটি বেশ প্রশস্ত। ভিতরেই ছ'কাতারের জায়গা রয়েছে। কিন্তু মেহমানগণ ও তাঁদের সামানা পত্রে মসজিদটি ভর্তি হয়ে গেল। যেসব মেহমান রাতের বেলা অথবা পরদিন সকালে বা তারপরে এসেছিলেন, তাঁদেরকে মসজিদের বারান্দায় ঠাঁই দিতে হলো। সন্ধ্যাবেলার দস্তরখানে এক শ'র চাইতে কম এবং সাহ্রীর সময় দস্তরখানে শতাধিক মেহ্মান খেতে বসেছিলেন। তারপরও মেহ্মান আগমন অব্যাহত ছিল। বারান্দা পূর্ণ হয়ে গেলে বাধ্য হয়ে আরো কিছু লোককে মসজিদের ভিতরে জায়গা দিতে হলো। রমযানের প্রথম দশদিন যেতে না যেতেই প্রতিজন মেহমানের জন্য কেবল দেড়ফুট জায়গা ছিল। মেহ্মানদের সংখাধিক্যের জন্য রমযানের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি একটা বিশাল প্যাণ্ডেল মসজিদের খোলা আঙিনায় নির্মিত হলো। শেষ দশকে তাও লোকে পূর্ণ হয়ে যায়। পূবাহ্নেই নূতন ছাত্রাবাসের ছয়টি কামরা খালি করানো হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে কোন গণ্যমাণ্য মেহ্মানগণকে এসব কামরায় চৌকি দিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ দশকে কেবল দু'টি কামরায় গণ্যমান্য মেহ্মান-

দেরকে রেখে বাকী চার কামরায় ঢালাও বিছানা করে সাধারণ মেহ্মানদের ঠাঁই করে দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত সকল কামরাতেই ঢালাও বিছানা করে দিতে হয়। ২৩ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত প্রায় পৌনে তিন শ' মেহ্মান দস্তরখানে খেতে বসতেন। উপরন্তু মওলভী নসীরুদ্দীন সাহেবের ওখানেও কিছু মেহ্মানের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।............" এবছর তবলীগী জমাআতসমূহে উলামা, মুদাররিসীন ও আহ্লে ইল্মগণ প্রচুর সংখ্যায় আসেন। হযরত অনেককে খিলাফত প্রদান করেন। গুজরাট, বোম্বাই ও পালনপুরের মেহ্মান-দের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। এমনিতে সাধারণভাবে ইউ-পির মেহ্মানদের সংখ্যা বেশী ছিল। আফ্রিকা, আন্দামান, মহীশূর, মাদ্রাজ, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামেরও অনেক মেহমান ছিলেন।

যুহর থেকে আসর পর্যন্ত হযরত শায়খ তিলাওয়াতে রত থাকতেন। মেহ্মানগণ তখন যিকিরে মশগুল থাকতেন। আসর পর্যন্ত অধিকাংশ মেহ্মান সশব্দ যিকিরে এবং কেউ কেউ নিঃশব্দে যিকিরে বা মুরাকাবা এবং কিছু সংখ্যক তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। কথাবার্তা বলা ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। 'আমভাবে এমর্মে হিদায়েত দেওয়া ছিল যে, আমার এখানে যদি আস, তবে গল্পগুজবে লিপ্ত হয়ো না, শুয়ে থাকো অথবা চুপ থাকো তাতে কোন আপত্তি নাই। আসরের পর কিতাবাদি পড়ে শুনানো হতো। 'ইমদাদুস সুলুক, আল্লামা সুয়ূতীর একখানা রিসালা, অপর একখানা রিসালা, তারপর ইতমামুন্ নি'আম তরজমা তাবভীবুল হিকাম, তারপর ইকমালুশ-শিয়াম শরহে ইতমামুন-নি'আম প্রভৃতি সুলূক বা আধ্যাত্মিক পাঠ্য কিতাবাদি পূর্ণ রমযান মাস পড়ে শুনানো হয়। ইফতারের পনের মিনিট পূর্বে কিতাব শুনানো বন্ধ করে দেয়া হতো এবং শায়খ পর্দার অন্তরালে মুরাকাবার নিমগ্ন হতেন। মদনী খেজুর ও যমযম দিয়ে ইফতার করতেন। কিছু খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। তারপর আবার ধ্যানমগ্ন হতেন। মগরিবের নামাযের পর প্রায় পৌনে এক ঘন্টা নফল নামাযাদিতে মশগুল থাক্তেন। তারপর দুটো ডিমের কুসুম খেয়ে এক পেয়ালা চা পান করে নিতেন।

তারপর পর্দা তুলে দেওয়া হতো। সোয়া সাতটার দিকে 'আম মজলিস শুরু হয়ে যেতো। নবাগতদের সাথে মুসাফাহা করতেন এবং কবে পর্যন্ত মেহ্মান থাকবেন, তা' জিজ্ঞাসা করতেন। কোথায় মেহ্মান অবস্থান করবেন তা' বলে

দিতেন। তারপর ৮টা পর্যন্ত বুযুর্গানের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। এ সময় বয়আতও করতেন। আযান হওয়ার সাথে ইশার নামাযের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেতো। তিনি নিজেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি সেরে নফল নামাযে লিপ্ত হয়ে পড়তেন।

তারাবীহ্‌র পর সূরা ইয়াসীনের খতম হতো এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'আয় রত থাকতেন। তবলীগী জমাআতের বিশিষ্ট হযরতদের কেউ থাকলে তাঁকেই মুনা-জাত পরিচালনার জন্য ফরমাশ করতেন। তারপর সাড়ে এগারটা পর্যন্ত কিতাব পড়ে শুনানোর সিলসিলা চালু থাকতো। তবলীগী কারগুজারী (কাজের রিপোর্ট)ও এ সময় শুনানো হতো। এ কিতাবী মজলিস শেষে রাত বারটার দিকে পর্দা ফেলে দেয়া হতো।

একেবারে কিছু না খেয়ে থাকলে পিপাসা খুব বেশী হতো, আবার পানি বেশী পান করলে পেটে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে রমযানের পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কিছু খেতে পারতেন না। এজন্য বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্টজনদের অনুরোধে ইফতারীর সিলসিলা শুরু করা হয়। হযরত কিছু ফলমূল খেয়ে নিতেন। পৌনে একটা পর্যন্ত বিশেষ মজলিস চল্‌তো। মুরাকাবার মতো বসে থাকতেন। একটার পর শুয়ে যেতেন। চারটার সময় ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি সেরে নফল নামাযে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। সুবহে সাদিকের আধঘন্টা পূর্বে দুধ কয়েক চামচ ও এক পেয়ালা চা পান করতেন। তারপর নফল নামাযে লিপ্ত হতেন এবং আযান পর্যন্ত এভাবেই নামাযের মধ্যে কাটতো।

১৩৯৫ হিজরীর রমযানের সময়সূচী শায়খের স্বহস্ত লিখিত 'আপ্‌বীতী' থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ

"মাগরিবের নামাযান্তে আওয়াবীনের নামাযে দুইপারা, তারপর চা-পান। ইস্তেন্‌জা প্রভৃতি। তারপর ৮টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত মজলিস। এরই মধ্যে বয়আত ও আলাপ আলোচনা। ইশা নয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তারপর ইয়াসীন খতম ও দু'আ। তারপর ফাযায়েলে রমযান সোয়া এগারটা পর্যন্ত। বিদায়ী মুসাফাহা সেরে বারটায় দ্বাররুদ্ধ। তিনটা বাজে দরজা খোলা ও সাহ্‌রীর ইনতেযাম। তাহাজ্জুদে দুই পারা। ফজরের নামাযান্তে ৯টা পর্যন্ত বিশ্রাম। তারপর দেখে দেখে দুই পারা তিলাওয়াত ১১টা পর্যন্ত। একটা পর্যন্ত বিবিধ। যুহরের নামাযান্তে খতমে খাজেগান ও যিকির। দুই পারা মুখস্থ শুনানো। বাদ আসর ইরশাদ ও ইকমাল।"[১৩]

১৩৮৫ হিজরী থেকে শায়খ নতুন ছাত্রাবাসের মসজিদে রমযান পালন শুরু করেন। প্রতি বছরই সমাবেশ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৩৮৫ সালে চল্লিশ জন ইতিকাফকারী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সংখ্যা দু'শোতে উন্নীত হয়। ১৩৮৬ হিজরীতে ইতিকাফকারীর সংখ্যা দুশো থেকে শুরু হয়। ১৩৮৭ হিজরীতে তাঁবু লাগানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। ছাত্রদের খালি কক্ষসমূহে মেহমানদের রাখা হয়।[১৪] ১৩৯৪ হিজরীর রমযান কাটে সাহারানপুরে। নতুন ছাত্রাবাসের মসজিদ তখন দোতলা হয়ে গেছে। রমযানের শুরুতে ৮/৯ শ' জনের মতো মেহমান ছিলেন। রমযানের শেষ তারিখে মওলভী নসীরুদ্দীন বলেন ঃ আজ মেহ্মানের সংখ্যা ১৮শ'। প্রথম দশকের শেষদিকেই মেহ্মানের সংখ্যা এক হাজারে দাঁড়িয়েছিল। ২৭/২৮ রমযান পর্যন্ত মেহ্মানের সংখ্যা দুই হাজারে উঠেছিল।[১৫]

দৈনন্দিন সময়সূচি ছিল এরূপ ঃ ১১টা বাজে প্রায় এক ঘন্টা ওয়ায–নসীহত। যুহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত খতমে খাজেগান এবং সশব্দ যিকির (যিক্‌রে জলী), আসরের পর 'ইকমালুশ–শিয়ম' ও 'ইরশাদুলমলুক', মগরিবের পর প্রায় একঘন্টাকাল নফল নামাযাদি ও আহার। তারপর ইশা পর্যন্ত নবাগতদের সাথে এবং অবস্থানকারীদের সাক্ষাৎ প্রদান। ঈদের পরও নতুন ভবনের মসজিদে কয়েকদিন অবস্থান করতে হয়। কেননা, আগন্তুকদের সমাবেশ অনেক বেশী ছিল।[১৬] শায়খ ১লা শাওয়াল, ১৩৮৪ হিজরী সম্পর্কে লিখেন, "আমি তো আজ কের বিদায়ী মুসাফাহার সময় মনে করেছিলাম, মেহ্মান হয়তো শ' পঞ্চাশ জন রয়ে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু এখন দেখছি, আজ ও কাল যাঁরা থাকছেন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শ' জন।

সাহারানপুরে রমযান অতিবাহিত করার সময় শায়খের সাথে অবস্থানকারিগণ যদিও পূর্ণ একাগ্রতার সাথে তিলাওয়াত, নফল ইবাদত ও রমযানের বিশেষ আমলসমূহে নিবিষ্ট থাকতেন (খুব কমই তার ব্যতিক্রম হতো) তবুও শায়খ বারবার বলতেন, সাথীদের যার যত ইচ্ছা খেতে শুইতে পারেন। কিন্তু কেউ গল্পগুজবে মত্ত হবেন না। কেননা, এর চাইতে বেশি ক্ষতিকর আর কিছুই নেই। কিন্ত তারপরও শায়খ রমযানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে বলে নিশ্চিত হতে পারতেন না। কখনো কখনো শায়খ বিনয় প্রকাশার্থে রমযানের এ সমাবেশকে 'মেলা' বলতেন। ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ইং তারিখে এ লেখককে লিখিত এক পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"আমার এখানের এ ভিড় সম্পর্কে আপনারও জানা থাকবে যে, আমি মওলভী

মুনাওয়ার ও মুফতী মাহমুদ প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবকে বারবার জিজ্ঞাসা করছি যে রমযানের সময় এখানে যে মেলা লেগে যায় তাতে উপকার বেশি হচ্ছে, না অপকারই বেশি হচ্ছে?"

একটা মর্মভেদী ও সময়োপযোগী কবিতা

এ প্রসঙ্গে প্রিয়বর মওলবী মুহাম্মদ ছানী মরহুমের সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যাতে রমযানুল মুবারককে 'আলবিদা' জানানোর ব্যাপারে সেই ঐতিহাসিক উপলক্ষ, সে মনোরম দৃশ্য এবং তার এক ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করার প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। মওলভী মঈনুদ্দীন সাহেব যখন উচ্চৈঃস্বরে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন তখন এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। স্বয়ং শায়খ এতে অভিভূত হয়ে পড়েন। বিশেষতঃ শেষ দু'টি পংক্তি শুনে অনেক চোখই অশ্রুসজল এবং আবৃত্তিকারীদের কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠে।

আলবিদা রমযান

রহমতের ডাক এসেছে দেখনা ভাগ্যবানের দলে,
সিজদা দেওয়ার তরে তারা সবে আল্লার ঘরে চলে।
কোল ভরে নিতে নিয়ামত লুটে যতনা ভাগ্যবান,
চলে ত্বরা করি সম্মুখ পানে পুণ্য পিপাসুপ্রাণ।
আহা মরি কী যে রহমত মাঝে সবাই জুটিল এসে
মাতোয়ারা প্রাণ প্রেমিক সুজন নাইকো পিছনে বসে।
রহমতভরা বাগিচার মাঝে সতত চরিছে তারা
ফুলে ফুলে তারা ভরিছে আপন কোলের বসুন্ধরা।
হায়রে কেবল আমি বুঝি রই অভাগা বিশ্ব মাঝে,
তাই তো কোলের সব ফেলে দিয়ে খালি হাতে ফিরি সাঁঝে।
পতঙ্গ সম ছুটে যে এলাম মহ্‌ফিলে আমি তার
সজল নয়নে এসে খালি হাতে যাচ্ছি যে ফিরে আবার।
এ নিয়ামতের আমার দ্বারায় হলোনা কদর করা,
যাই খালি হাতে মাথা যে আমার পাপের বোঝায় ভরা।

কী পোড়া কপাল! সব হলো মিছে দুঃখই হলো সার
কী কাজে এলাম কী নিয়ে বা শেষে বিদায় নিলাম আর!

টীকা ঃ

১. বুখারী ও মুসলিম।

২. ঐ

৩. সমকালীন একজন ঐতিহাসিক শেষযুগের একজন বুযুর্গ মাওলানা সায়িদ শাহ্ জিয়াউন্ নবী হাসানী (রহ) রায়বেরলভী (মৃত্যুঃ ১৩২৬ হিঃ) সম্পর্কে লিখেন ঃ রমযানের আগমনে তিনি এতই আনন্দিত হতেন যে, ছয় মাস আগে থেকেই গুণতে শুরু করে দিতেন রমযানের আর এত মাস বাকী। রমযান অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করতেন।হাদীছের বর্ণিত من فرح بدخوله ولهف بخروجه " যে রমযানের আগমনে আনন্দিত, নির্গমনে ব্যথিত, –এর বাস্তব চিত্র নমুনা ছিলেন তিনি।

৪. হযরত শাহ আবদুর রহীমের যুগে রমযান শরীফে চার পাঁচ শ'র ও অধিক ভক্ত সমবেত হয়ে পূর্ণ মাস ইবাদতে কাটাতেন।—আপবীতী পৃঃ ঃ ৭/৬৯

৫. লেখক বাঁশকান্দি লিখে বন্ধনীর ভিতরে বাংগাল লিখেছেন। আসলে বাঁশকান্দি বাংলাদেশে নয়। আসাম প্রদেশে করীমগঞ্জের নিকট কাছাড় এলাকায় অবস্থিত। সিলেটে তিনি একাধারে সতের বছর রমযান শরীফ কাটান সিলেট শহরের নয়াসড়ক মসজিদে। দেশ বিভাগের পর সিলেট পাকিস্তানভুক্ত হওয়ার পর সিলেট শহরে না এসে সিলেট জেলার ভারতভুক্ত অংশ করীমগঞ্জেই রমযান কাটাতেন। –অনুবাদক

৬. মওলভী আবদুল হামিদ আযমী লিখিত কিয়ামে সিলহেট এবং হযরত শায়খের "আকাবির কা রমযান" দ্রষ্টব্য।

৭. দেখুন ঐ, পৃঃ ১২৩

৮. "সুহবতে বা আউলিয়া" কিতাবের এ লেখক লিখিত ভূমিকা থেকে পৃঃ ১–৬ (উক্ত কিতাবখানির রচয়িতা মাওলানা তকীউদ্দীন নদভী মাযাহেরী)

৯. শায়খের আপবীতী পাঠে জানা যায়, ১৩৩৮ হিজরীর রমযান মাসে সর্বপ্রথম দৈনিক এক খতম কুরআন পাঠের অভ্যাস শুরু হয় এবং প্রায় ১৩৮০ হিজরী পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে বরং তারপরও আরও কিছুকাল এরূপ চলেছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আপবীতী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫–৩৬

১০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আপবীতী, পৃঃ ২/৩৭

১১. মাওলানা মুনাওয়ার হোসেন বিহারী মাযাহেরী, হযরত শায়খের অন্যতম খলীফা।

১২. ইনি হযরত শায়খের রমযানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীলদের অন্যতম একজনরূপে ভূমিকা পালন করতেন।

১৩. আপবীতি পৃঃ ৭/১১৬–১১৭

১৪. আপবীতি পৃঃ ৭/৬৬

১৫. ঐ

১৬. ঐ, পৃঃ ৭১

৬ষ্ঠ অধ্যায়

মদীনা তাইয়িবায় স্থায়ীভাবে বসবাস মদীনার দৈনন্দিন জীবন ঃ হিন্দুস্তানের কয়েকটি সফর ও রমযানুল মুবারক

হযরত শায়খের দীর্ঘকালের সাধ ছিল, মদীনায় তাইয়িবায় গিয়ে জনমের তরে সফরের সমাপ্তি ঘটাবেন এবং যাঁর সুন্নত ও শরীআতের এবং হাদীছের খিদমত সারাটি জীবন ধরে করে এসেছেন, তাঁরই চরণে অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেবেন। তাঁর প্রিয় শায়খ ও মুর্শিদ (মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব)–এরও এই সাধই ছিল এবং অবশেষে তিনি তাঁর এ প্রচেষ্টায় আল্লাহর কৃপায় সফলও হয়েছিলেন। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা ও অন্যান্য অসুবিধা হেতু দরসদান এবং প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়ন ও রচনাকর্মে অক্ষম হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সে পুরনো ইচ্ছেটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। অবশেষে ১৮ই রবিউল আউয়াল ১৩৯৩ হিঃ (২২শে এপ্রিল ১৯৭৩ ইং) তারিখে সে লক্ষ্যে হিজাযের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। ইকবালের ভাষায় ঃ

بایں پیری رہ یثرب گرفتم * نوا خواں از سرور عاشقانہ

چوں آں مرغے کہ در صحرا سر شام * کشاید پر بفکر آشیانہ

" জীবন সাঁঝের দিনগুলিতে ধরিনু পথ যাই মদীনা
গুণগুনিয়ে ভাজি যে সুর প্রেমেরই গান আশেকানা
সেই পাখীরই তুল্য আমি মরুভূ-তে সন্ধ্যা ঘনায়
তখন তাহার ভাবনা কেবল কেমন করে ফিরবে কুলায়।"

এ সফরের পরই শায়খ স্থায়ীভাবে মদীনা শরীফে বসবাস শুরু করেন এবং হিজরতের নিয়্যাত করে ফেলেন।[১]

২৬শে রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার ১৩৯৩ হিঃ (১লা মে ১৯৭৩ইং) তারিখে বোম্বে থেকে যাত্রা করেন। অসংখ্য ভুক্ত মুরীদান বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা

জানান। দুবাইতে তাবলীগী জমাআতের লোকজন তাঁকে বিমান থেকে নামিয়ে নেন। লোকজন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং অনেকে বয়আতও হন। পরদিন ২৭শে রবিউল আউয়াল (২রা মে) তিনি মক্কা মুয়ায্যমায় পৌছেন এবং উমরা করেন। এ সফরে মক্কা শরীফে ভাই সা'দীর[২] ঘরে এবং মাদ্রাসা সউলতিয়ার দফতরে অবস্থান করেন। মক্কা শরীফ অবস্থানকালে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। পরের দিনই থেকেই মদীনা শরীফ যাত্রার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু খাদিমগণ এভাবে কোনমতেই তাঁকে ছাড়তে রাযী হলেন না। অবশেষে ১৯শে সে তারিখে মোটরগাড়িতে মদীনা শরীফ রওয়ানা হলেন। পর দিন সাড়ে বারটায় মাদ্রাসায়ে শার'ইয়্যাতে পৌছে যান এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ মাদ্রাসাটি মসজিদে নববীর 'বাবুন নিসা' তোরণ থেকে মাত্র কয়েক কদমের ব্যবধানে অবস্থিত বিধায় মসজিদে নববীতে হাযিরী এবং রীতিমত জামাআতে শরীক হওয়া খুবই সহজ হলো। শায়খ প্রথমে 'আকদামে-আলীয়া'য় হাযির থাকতেন। কিন্তু এবার পায়ের অসুস্থতার জন্যে পূর্বদেওয়ারের বিপরীত দিকে 'বাবে-জিবরীল' সংলগ্ন ছাপড়ায় অবস্থান করতেন।

মদীনার দৈনন্দিন কর্মসূচি

মদীনা অবস্থানকালে ফজরের নামাযান্তে যিকির হতো। তারপর কিছুক্ষণ শায়খ বিশ্রাম নিতেন এবং সঙ্গীসাথিগণ তখন নাশতা করতেন। জাগবার পর কিছু ইল্মী বা কিতাবাদি রচনা সংক্রান্ত কাজ করতেন, নতুবা চিঠিপত্র লিখাতেন। যুহর, আসর, মগারিব ও ইশা সব নামাযই মসজিদে নববীতে আদায় করতেন। বাদ-আসর মাদ্রাসায়ে উলুমে শারইয়্যার আঙিনায় আম মজলিস হতো। এ মজলিসে অধিকাংশ সময়ই কিতাব পড়া হতো। এসময় বিশিষ্ট আগন্তুক ও বিশিষ্ট উলামার সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হতো। ইশার পর আম দস্তরখান বিছানো হতো। সাহারানপুরে যেখানে দুপুরের আহারই ছিল মুখ্য—যাতে শায়খ নিজে হাযির থাকতেন, আর রাতের খানা হতো নাম-কা ওয়াস্তে, শায়খের তাতে হাযির থাকা জরুরী ছিল না, মদীনা শরীফে হতো তাঁর বিপরীত ; এখানকার আসল আহার ছিল রাতের আহার। কোন মেহ্মান এবেলায় অনুপস্থিত থাকলে হযরত শায়খের মনে তা' খুব বাজতো। এ লেখকের সে অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে। এজন্য মদীনা তাইয়্যিবায় অন্য কোথাও আমার রাতের দাওয়াত রাখা হতো না। এ সময় হযরত

শায়খ খুবই প্রফুল্ল থাকতেন। প্রিয় মেহমানদের আদর আপ্যায়ন ঠিক তেমনিভাবে করতেন, যেমনটি করতেন সাহারানপুরে দুপুরের দস্তরখানে। মেহমানদের আপ্যায়নের ভার সাধারণতঃ সুফী মুহাম্মদ ইকবাল[৩] সাহেবের উপরই ন্যস্ত থাকতো। ডাক্তার ইসমাঈল মার্চেন্ট[৪] এবং অন্য ভক্ত খাদেমগণও এব্যাপারে অগ্রণী থাকতেন। মসজিদে-নূরে (মদীনা শরীফের তাবলীগী মারকায) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইজতিমাসমূহে অংশগ্রহণ করতেন এবং জান্নাতুল বাকীর যিয়ারতও করতে যেতেন।

হিজাযের বিশিষ্ট ভক্ত খাদেমগণ

হিজাযের রূহানী ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছাড়াও (যে সম্পর্কের কোন তুলনা হয় না) শায়খ ও তাঁর খানদানের লোকদের ঐ পাকভূমির সাথে এক প্রকার দেশীয় ও আত্মীয়তাসুলভ সম্পর্ক ছিল। ফলে সে পবিত্রভূমিটি অনেকটা তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি ছিল। মক্কা শরীফে মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদ সাহেব কেরানভী নাযিমে-আউয়াল মাদ্রাসা সউলতিয়ার পরিবারের সাথে আত্মীয়তা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। উক্ত মাদ্রাসার নাযিম মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ সলীম সাহেব ছিলেন উক্ত খানদানেরই একজন এবং হযরতের একজন প্রিয় ব্যক্তি। মাদ্রাসা সউলতিয়ার দেওয়ান বা দফতরে (যেখানে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহ) দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন) দীর্ঘকাল যাবত হযরত শায়খও অবস্থান করেন। মাদ্রাসার বর্তমান নাযিম এবং মাওলানা সাহেবের পুত্র মওলভী মাসউদ শামীম সাহেব এবং মাওলানার ভাতিজা আলহাজ্জ মুহাম্মদ সাঈদ রহমতুল্লাহ্ (ওরফে সা'দী) শায়খের নিজ বংশের ছেলেপিলেদের মত ছিলেন। মাদ্রাসায় দীর্ঘকার ধরে বসবাসরত ও মক্কায় হিজরত-কারী হাকীম মুহাম্মদ ইয়াসীন সম্পর্কে হযরতের মামা হতেন। এখানে মাদ্রাসার পরিবেশে পৌছলে এমনি মনে হতো যেন সাহারানপুর থেকে দিল্লী অথবা কান্দেলায় গিয়ে পৌছেছেন আর কি!

হযরতের বিশিষ্ট খাদেম ও খলীফা মালিক মওলবী আবদুল হাফিজ সাহেবের বাড়িও এখানে মক্কা শরীফে ছিল। স্বভাবজাত সেবাপরায়ণতা, আনুগত্য ও মেযাজ-মর্যী বুঝবার অদ্ভুত ক্ষমতাবলে হযরতের কাছে তিনি এমনি এক মর্যাদার আসনে আসীন ছিলেন, যা' খুব কম ভক্তের ভাগ্যেই জুটেছিল। হযরতের আরবী রচনাবলী, বিশেষতঃ اوجز المسالك (আওজাযুল মাসালিক) এবং হযরত মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারানপুরীর প্রসিদ্ধ শরহে আবূ দাঊদ "বযলুল-মজহূদ" ও অন্যান্য আরবী

কিতাবাদির মুদ্রণ ও প্রচারার্থ মক্কা মুয়ায্‌যমায়-মাকতাবায়ে বাবুল উমরাতে স্বতন্ত্র "মাকতাবায়ে ইমদাদীয়া" নামে এবং মুদ্রণের সুবিধার্থ স্বতন্ত্র প্রেস "মাতাবিউর রশীদ" প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি হযরতের যে সন্তুষ্টি ও দু'আ লাভ করেন, তা' অনেক মুজাহাদা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পরই বিশিষ্ট খাদেমগণের ভাগ্যে ঘটে থাকে। আফ্রিকা ও হিন্দুস্তানের সফরে (যার বিবরণ পরে আসছে) তিনি ছিলেন হযরতের বিশিষ্ট সফরসাথী, বিশেষ বিশেষ মওকায় মুনাজাত পরিচালনাকারী জুমুআর ইমাম ও খতীব এবং হযরতের দোভাষী ও ভাষ্যকার। তাঁর শ্রদ্ধের পিতা মালিক আবদুল হক সাহেব দীর্ঘকাল পূর্বে মক্কা মুয়ায্‌যমায় হিজরত করে চলে আসেন এবং এখানে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রত্যেকটি পুত্রই অহরহ হযরতের খিদমতের জন্য প্রস্তুত থাকতেন এবং নিজেদের গাড়ি ও অন্যান্য সবকিছু হযরতের আরামের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছিলেন।

পরবর্তীকালে মক্কা মুয়ায্‌যমায় হযরতের আবাসস্থল ছিল ভাই সা'দীর বিশালায়তন প্রাসাদ-যার পাশেই হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের অনেক ভক্তমুরীদানের বাস ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রিয়ভাজন মওলভী ডক্টর আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ লেখক ও তার বন্ধুবান্ধব বহু বছর ধরেই তাঁর আতিথ্য ভোগ করে আসছি। তিনিও হযরতের সাথে সর্বদা খাদেম ও ভক্তসুলভ সম্পর্ক রাখতেন এবং হযরত ও তাঁর গোটা পরিবারের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ও সদয় ছিলেন। ভাই সা'দীর কুঠি থেকে তাঁর বাড়ি অল্প কয়েক গজের ব্যবধানেই অবস্থিত ছিল। পাশেই মহল্লার মসজিদ-যা' ভাই সা'দীর বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় একটি বিশালায়তন ও পূর্ণাঙ্গ মসজিদে রূপান্তরিত হয়। এজন্য এ মসজিদটি "মসজিদুর রহমত" নামে পরিচিত। এখান থেকে অদূরেই হাফায়ের মহল্লা-যেখান তাবলীগের খাস মারকায মসজিদ ও মেহমানখানা রয়েছে। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের জামাআতী মেহ্‌মানদের তা একটি বিশেষ অবতরণস্থল।

মদীনা শরীফের সাথে হযরত শায়খের ঘনিষ্টতা ছিল আরও বেশি। এখানে তিনি তাঁর শায়খ ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা খলীলুর রহমান সাহারানপুরীর সাথে মাসের পর মাস অতিবাহিত করেন এবং হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মদ মদনীর অগ্রজ মাওলানা সায়্যিদ আহ্‌মদ ফয়েযবাদীর আতিথ্য উপভোগ করেন—যিনি অনেক বছর ধরে গাঙ্গুহ্‌তে তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া সাহেবের একনিষ্ঠ সহকর্মী ও একান্নবর্তী ছিলেন। মাওলানা সায়্যিদ আহ্‌মদ

ফয়েযবাদীর পর তাঁর এবং মাওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনীর অনুজ মাওলানা সায়্যিদ মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব শায়খের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। তাঁরই কল্যাণে মাদ্রাসা উলূমে শারইয়্যা শায়খের স্থায়ী নিবাসে পরিণত হয়। মাওলানা সায়্যিদ মাহ্‌মূদ শায়খকে এতই ভালবাসতেন যে, মদীনা শরীফে তাঁর নিজ বাগানে উৎপন্ন আম অত্যন্ত যত্ন সহকারে হিন্দুস্তানে শায়খের জন্য পাঠাতেন। আম না পাঠাতে পারলে আমের রস বের করে তা-ই পাঠিয়ে দিতেন। হযরত শায়খও তাঁর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার এমনি মর্যাদা দিতেন যে, তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর রিসালা الحظ الاوفر فی حج الاکبر (আল হাযযুল আওফর ফী হাজ্জিল আকবর) অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে দিয়ে তার পরিচিতি লেখান। মাওলানা সায়্যিদ মাহমুদ সাহেবের ওফাতের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা সায়্যিদ হাবীব (বর্তমানে আওকাফ বিভাগের পরিচালক) তাঁর পিতার যোগ্য প্রতিনিধিত্ব করেন এবং অত্যন্ত মর্যাদা ও আরামে হযরত শায়খের মাদ্রাসায়ে শারইয়্যায় অবস্থানের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। ইনি আমীরে-মদীনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা এবং মদীনার একজন গণ্যমান্য নাগরিক ও পারিষদরূপে গণ্য হয়ে থাকেন।

শায়খের মদীনা শরীফে অবস্থানকালে তাঁর সফরসমূহের ব্যবস্থাপনা এমন কি তাঁর স্থায়ীভাবে বসবাসের সময়ও সামগ্রিকভাবে দেখাশোনার ব্যাপারে কাযী আবুদল কাদির সাহেবের বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকতো। ইনি কেবল হযরত শায়খের খিদমত ও ইনতেযামের জন্য মাতৃভূমি পাকিস্তানের ঝাউরিয়া থেকে মদীনা শরীফ এসে অনেক সময় পূর্ণ মাস শায়খের কাছে কাটিয়ে দিতেন। কেবল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বহির্দেশীয় তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষে সাময়িকভাবে বাইরে যেতেন। হিজাযের তাবলীগী জমাআতের আমীর মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদ খানও তাঁর সাথে একজন ভক্ত খাদেমের মত আচরণ করতেন এবং তাঁর নিজ আবাসস্থল মসজিদে নূরে শায়খের অবস্থানের দিনসমূহে ছাড়াও এমনিতেই সাধারণভাবে নিজেকে হিজাযে শায়খের মেহ্‌মানদারী ও আদর-আপ্যায়নের যিম্মাদার বলে মনে করতেন। অনুরূপভাবে মদীনা তাইয়িবায় হযরতের অন্তরঙ্গ ও সার্বক্ষণিক খাদেমদের মধ্যে হাজী আনীস আহ্‌মদ সাহেব (খানবাহাদুর হাজী শায়খ রশীদ আহ্‌মদ সাহেব মীরাটীর পুত্র), মাওলানা আফতাব আলম সাহেব (মাওলানা বদরে আলম সাহেব মীরাটীর পুত্র) প্রিয়বর সাইয়িদ হাসান আসকারী তারিক, ক্বারী

আব্বাস সাহেব বুখারী প্রমুখও হযরতের প্রীতি ও নৈকট্য অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন।[৫]

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, কেবল আরব বিশ্বই নয়, বিশ্বব্যাপী নতুন প্রজন্মের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় এবং বিভিন্ন জামাআতের পক্ষ থেকে তাসাওউফ বিরোধী প্রচারণার ফলে সৃষ্ট ধুম্রজালের দরুন আরব আলিম ফাযেলগণ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থিগণ এবং বহিরাগত হাজী ও যিয়ারতকারিগণ শায়খুল হাদীছের সাহচর্য থেকে উপকৃত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগের খুব কমই সদ্ব্যবহার করেছেন। কেউ ভাল করে তাকিয়েও দেখেন নি, মসজিদে-নববীরই ছায়াতলে সুন্নতের অনুসারী একজন জবরদস্ত মুহাদ্দিছ ও আলিম এবং আধ্যাত্মিক জগতের দিকপাল স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর চরণতলে বসে অধ্যাত্মবাদিদের খেদমত ও তারবিয়াত দেবার মানসে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্ককে পরিত্যাগ করে অহোরাত্রি বসে আছেন। কখনও যদি বাইরের কোন কোন জাঁদরেল আলিম এ মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেতেন, তখন তাঁরা সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং তাঁর খেদমতে উপস্থিতও হতেন। তাঁদের মধ্যে এ অকিঞ্চনেরও কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে তাঁর সাথে পরিচিত করার সৌভাগ্য হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন উস্তাদে আকবর শায়খ আবদুল হালীম মাহ্মুদ শায়খুল জামেউল আযহার, উস্তায মুহাম্মদুল মুবারক (সাবেক অধ্যক্ষ, কুল্লিয়াতুশ শারইয়্যা দামেশ্ক ও সিরিয়ার সাবেক মন্ত্রী), আল্লামা আল জালীব বালখুজা (মুহাদ্দিস ও মুফতী তিউনিস) প্রমুখ বিশিষ্ট আরব পণ্ডিত ও বিদ্বজন-যাঁরা মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদ ও উর্ধ্বতম পরিষদের (মজলিসে আ'লার) সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য মদীনা শরীফে আসতেন এবং এ অকিঞ্চনেরও সে পরিষদসমূহের সদস্য হওয়ার কারণে তাঁদের সাথে উঠা বসা করার সুযোগ হতো।

হযরত শায়খের আইনগত 'কফীল' হওয়া, টিকেট প্রেরণ প্রভৃতি ব্যাপার সর্বদাই আলহাজ্জ মুহাম্মদ সাঈদ রহ্মতুল্লাহ্ (ভাই সা'দী)-এর দায়িত্বে ন্যস্ত থাকতো। এবার শায়খের আগমনের পর থেকে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তিনি খুবই চেষ্টিত ছিলেন এবং শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল-কায্যায (আমীনে আ'ম, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী)-এর মাধ্যমে চেষ্টা শুরুও করেছিলেন, মক্কার প্রসিদ্ধ আলিম সায়্যিদ মুহাম্মদ উলুভী মালিকীও এ চেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন। এমন সময় ১৬ জমাঃ উলা ১৩৯৩ হিঃ (১৭ই জুন, ১৯৭৩ ইং) তারিখে হঠাৎ খবর পেলাম যে,

একামা (নাগরিকত্ব) হয়ে গিয়েছে। শুনে সবাই তো হতবাক! এখানে যাঁরা পনের কুড়ি বছর ধরে পড়ে আছেন, অনেক বড় বড় লোকের সুপারিশেও তা' তাঁদের অদ্যাবধি হয়নি। এটাও জানা যায় যে, শায়খের 'একামা' (সৌদী নাগরিকত্ব) সরাসরি বাদশাহ্ ফয়সাল মজলিসের পরামর্শ না চেয়ে নিজেই দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যাই হোক, তাতে শায়খ সালেহ্ কায্যায ও শায়খ মুহাম্মদ উলুভীর চেষ্টার যথেষ্ট দখল ছিল। একামা তো আনুষ্ঠানিকতার সকল স্তর অতিক্রম করে অনেক পরেই পাওয়া যায়–যার শুরু হয়েছিল ২৩শে জমাঃছানী ১৩৯৩ হিঃ থেকে। ২৫শে আগস্ট ১৯৭৩ ইং তারিখে শায়খ পাকিস্তানের রায়বিণ্ডে অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমা উপলক্ষে মক্কা শরীফের পথে রওয়ানা হয়ে পড়েন। কিন্তু এ সফর শেষ পর্যন্ত হতে পারেনি। এ সময় রমযান শুরু হয়ে যায়। শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ সালেম সাহেবের ওখানে খাওয়া দাওয়া সেরে সোজা তান্ঈম যেতেন। সেখান থেকে উমরার জন্য ইহ্রাম বেঁধে তাওয়াফ ও সাঈ' শেষে যেতেন ভাই সা'দীর ওখানে। সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করতেন। পনের রমযানের তারাবীহ্ পড়ে মদীনা শরীফ রওয়ানা হয়ে যান। হিজাযে অতিবাহিত প্রত্যেকটি রমযানের প্রথমার্ধ উমরার আগ্রহে মক্কা শরীফে এবং বাকী অর্ধেক মসজিদে নববীতে ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে অতিবাহিত হতো। এবার শায়খের ই'তিকাফস্থল ছিল বাবে-সউদের সামান্য একটু আগে। ২৬শে রমযানের রাতের বেলা ইসরাঈলী যুদ্ধের বিভীষিকাময় সংবাদ এসে পৌছলো। এ জন্যে খতমে বুখারীর ব্যবস্থা করা হলো। রাতের রেডিওতেই আবার যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা প্রচারিত হলো।

হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সফর

রমযানের পরই শুরু হলো প্রবল জ্বরের পালা। এ কারণে এবার হজ্জ করা সম্ভবপর হলো না। এ বছর মাওলানা ইনামুল হাসান তাঁর সঙ্গী সাথীসহ হজ্জ করেন।

'একামা' থাকায় এখন হিজাযে অবস্থানই ছিল শায়খের মুখ্য, বাইরে যাওয়াটা গৌণ। একামাধারীদের ছয় মাসের বেশী বাইরে থাকার অনুমতি নেই। তাতে একামা বাতিল হয়ে যাবে। মওলভী হারূনের ইন্তিকালজনিত কিছু অসুবিধা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন হযরত শায়খের হিন্দুস্তানে আগমনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে হযরত শায়খ

হিন্দুস্তানে তশরীফ আনেন। কোন কোন ঘনিষ্ঠ মহলের৬ পরামর্শ ছিল এই যে, শায়খ যদি একান্তই হিন্দুস্তানে তশরীফ আনেন, তাঁর রমযান যেন সাহারানপুরে কাটান, যাতে করে সামগ্রিক ও সুদূরপ্রসারী উপকার বর্তায়। পাকিস্তানী ভক্তদের চেষ্টা তদবিরে এবার পাকিস্তানের ভিসা পাওয়া যায়। সে হিসাবে ২৩ জমাঃউলা ১৩৯৪ হিঃ (২৪ শে মে, ১৯৭৪ ইং) তারিখে মদীনা শরীফ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। এ লেখকও তখন তাঁর সঙ্গী। মগরিবের পর যাত্রা শুরু হলো। ডাঃ ইসমাঈল সাহেবের অনুরোধক্রমে রাতসহ প্রায় বিশ ঘন্টা বদরে অতিবাহিত হলো। (তখন উক্ত ডাক্তার সাহেব বদরের সরকারী ডাক্তার ছিলেন।) রাত্রে মসজিদে আরীশের খোলা ময়দানে শয়ন করেন। পরদিন বাদ আসর বদর থেকে পুনরায় যাত্রা করে রাতের বেলা মাদ্রাসা সউলতিয়া পৌছলেন।

২২শে জুন, ১৯৭৪ ইং তারিখে শায়খ জিদ্দা থেকে করাচীর পথে বিমানে চড়লেন এবং ৩টা ২৫ মিনিটে করাচী বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন। সেখানে আড়াই তিন হাজার অভ্যর্থনাকারীর বিরাট সমাবেশ অপেক্ষমান ছিল। যুহরের নামায মক্কী মসজিদে পড়লেন। করাচীতে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের মাদ্রাসায় এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বিন্নুরীর মাদ্রাসায়ও যাওয়া হয়। এ যাত্রায় মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব উছমানী থানবীর সাথেও মুলাকাত হলো। শুক্রবার দিন রায়বিণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের বিরাট সমাবেশ ছিল। রায়বিণ্ড থেকে যান ঢডিয়ায়। সেখানে প্রচুর ভিড় ছিল। দিল্লীর টিকেট যেহেতু করাচী থেকে নির্ধারিত ছিল, তাই কারচী ফিরে যেতে হয়। ১৪ই জুলাই করাচী থেকে দিল্লী পৌছেন এবং একদিন দিল্লীতে কাটিয়ে ১৬ই জুলাই সাহারানপুর পৌছেন। সাক্ষাৎ লাভের জন্য উদগ্রীব ভক্তগণ দূরদূরান্ত থেকে সফর করে সাহারানপুর এসে পৌছুতে থাকেন।

এবারের হিন্দুস্তান অবস্থানকালে মেওয়াতেরও একটি সফর হয় এবং আগষ্টের সাহারানপুরের তাবলীগী ইজতেমায়ও শরীক হন।

এবারের (১৩৯৪ হিঃ) রমযান অত্যন্ত ধুমধামের সাথে নতুনভবনের মসজিদে অতিবাহিত হয়। পূর্বেই ধারণা করা হয়েছিল যে, এবার ভক্তদের ভিড় খুব বেশী হবে। হলোও তাই। রমযানের প্রারম্ভে ৮/৯ শ' জনের অনুমান করা হয়েছিল। শেষ দিকে সে সংখ্যা আঠারো শ'তে উন্নীত হয়।[৭] তারাবীহ্‌তে দৈনিক তিন পারা শুনবার অভ্যাস ছিল—যাতে করে প্রত্যেক দশকে এক খতম হতে পারে। এ বছর

মওলভী খালিদ (মওলভী সালমান সাহেবের অনুজ) কুরআন শরীফ শুনান। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এ লেখকও দু'দিনের জন্য হাযির হয়। আমার উপস্থিতিতে হযরতের তারাবীহ্অন্তে ইফতারীর আয়োজন খুব জোরেশোরেই হতো।

রমযানেও হযরতের স্বাস্থ্য কিছুটা খারাপ ছিল। অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৫ই যিলকাদ ১৩৯৪ হিঃ (৩০ নভেম্বর ১৯৭৪ ইং) তারিখে সাহারানপুর থেকে হিজাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়েন। বিদায়ের সময় এত ভিড় ছিল যে, কাঁচা ঘর থেকে ছাত্রাবাস পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল। ১৮ই যিলকাদ ১৩৯৪ হিঃ (৩রা ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইং) তারিখে দিল্লী থেকে বিমানযোগে বোম্বে, ৬ই ডিসেম্বর ২১শে যিলকাদ তারিখে বোম্বে থেকে করাচী রওয়ানা হন এবং পরদিন কুশলেই মক্কা মুয়ায্যমা পৌছে যান। হজের সময় নিকটবর্তী হওয়ার মক্কা শরীফে খুব ভীড় ছিল। এজন্য অধিকাংশ সময় মাদ্রাসা সউলতিয়ায়ই অতিবাহিত করেন। ৭ই যিলহজ তারিখে স্থায়ীভাবে ভাই সা'দীর কুঠিতে স্থানান্তরিত হয়ে যান। হজ শেষে ১৫ই যিলহাজ্জ (২৯শে ডিসেম্বর) রাতের বেলা মদীনা শরীফের পথে বদরে অবস্থান করে পরদিন মদীনা শরীফে পৌছেন এবং মাদ্রাসায়ে উলূমে শারইয়্যায় অবস্থান পুনরায় শুরু করেন। ১৩৯৫ হিজরীতে পুনরায় তাঁর হিন্দুস্তান সফর হয়। এর পিছনের কিছু অদৃশ্য ইঙ্গিত ইশারারও হাত ছিল।[৮] সে অনুসারে শায়খ হিন্দুস্তানে রমযান অতিবাহিত করার সংকল্প করেন ২৮শে রজব, ১৩৯৫ হিজরী (৬ই আগষ্ট, ১৯৭৫ ইং) তারিখে মক্কা মুকার্‌রমা থেকে রওয়ানা হন এবং ঐ দিনই বোম্বে পৌছেন। ১৮ই আগষ্ট মুতাবেক ১লা শাবান ১৩৯৫ হিঃ তারিখ বোম্বে থেকে নিযামুদ্দীন গিয়ে পৌছেন। ১২ই আগষ্ট (৩রা শা'বান) বুখারী শরীফের খতম হয়। প্রথমে "মুসালসাল বিল আউয়ালিয়া"-এর হাদীছ পড়া হয়। তারপর মওলভী ইউনুস সাহেব বুখারীর শেষ হাদীছ পাঠ করেন। উভয় হাদীছের মতন বা পাঠ (Text) পড়েন স্বয়ং শায়খুল হাদীছ। ১লা রমযান সোমবার (৮ই সেপ্টেম্বর) শায়খ তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী নতুন ভবনে পৌছে যান।

রমযানের প্রথম দশকে মওলভী যুবায়র, মধ্যম দশকে মওলভী খালেদ ও শেষ দশকে মওলভী সালমান কুরআন শরীফ খতম করেন। তারপর সাহারানপুর থেকে রওয়ানা হয়ে কান্দেলা, পানিপথ, সেরহিন্দ হয়ে মোটরযোগে রায়বিণ্ড গিয়ে পৌছেন এবং সেখানকার তাবলীগী ইজতেমায় শরীক হয়ে ঢড়িয়া, রাওয়ালপিণ্ডি এবং তারপর বিমানযোগে করাচী যান। করাচী থেকে সোজা জিদ্দার পথে রওয়ানা হয়ে

যান। মক্কা শরীফে উমরা করে সেখানে অবস্থান করেন এবং তারপর হজ্জ সম্পন্ন করেন। এ বছর মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবও হজ্জ করেন। হজ্জ শেষে মদীনা শরীফে ফিরে যান।

১৩৯৬ হিজরীতে পুনরায় হিন্দুস্তান সফর করেন। এ সফর ১৪ জমাঃছানী ১৩৯৬ হিঃ (১২ই জুন ১৯৭৬ ইং) থেকে শুরু হয় এবং উক্ত বছরের ২২ যিলকাদ (১৫ই নভেম্বর) তারিখে সমাপ্ত হয়। এবারকার রমযানও নতুন ভবনে অতিবাহিত হয়। প্রথম দশকে মওলভী সালমান সাহেব, দ্বিতীয় দশকে মওলভী খালিদ ও তৃতীয় দশকে মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবের সাহেবজাদা মওলভী যুবায়র কুরআন শরীফ খতম করেন। দেশের বাইরে থেকেও অনেক বিশিষ্ট ভক্ত মুরীদান শরীক হয়েছিলেন। এ লেখকও সবান্ধবে তিন রাত্রির জন্য হাযির ছিল।

রমযান পালনের পর করাচীর পথে জিদ্দা রওয়ানা হন। লোকের ভিড় ও জ্বরের জন্য উমরা করা মুশকিল ছিল।, তাই জিদ্দা থেকে সরাসরি মদীনা শরীফ রওয়ানা হয়ে পড়েন।

২৪শে মে, '৭৭ইং তারিখে ভাই সা'দীর পত্রে জানা গেল যে, নাগরিকত্বের ব্যাপারে "জালালাতুল মালিক" (বাদশাহ্)-এর দরবারে যে আবেদন করা হয়েছিল, তা' মঞ্জুর হওয়ার খবর এসে গেছে। কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যায় এবং ২১শে জুন, '৭৭ ইং তারিখে "নাগরিকত্ব" শায়খের হাতে এসে পৌছে যায়। সাথে সাথে তিনি হিজরতের নিয়্যাত করে ফেলেন। নাগরিকত্ব প্রাপ্তির পর এ অধীনের নামে লিখিত পত্রে হযরত শায়খ লিখেন ঃ

"নাগরিকত্ব প্রাপ্তির পর খুশীর পরিবর্তে দুশ্চিন্তাই প্রবল হয়ে গেছে। জানি না, নাগরিকত্বের রীতিনীতি মেনে চল্‌তে কতটুকু সমর্থ হবো। দু'আ করবেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন এখানকার রীতিনীতি মেনে চলার তৌফিক দান করেন।[৯]

নাগরিকত্ব লাভের পর জমাঃছানী ১৩৯৭ হিজরীতে পুনরায় হিন্দুস্তান সফরে আসেন। করাচী ও দিল্লী হয়ে তিনি সাহারানপুর পৌছেন। ১০ই শা'বান (২৮ শে জুলাই) তারিখে 'মুসালসালাতে বুখারীর' খতম হয়। এ বছর মানে ১৩৯৭ হিজরীর রমযানে আগন্তুক মেহমানদের ভিড় পূর্বের চাইতে বেশী হয়েছিল। প্রথম ও তৃতীয় দশকে কুরআন শরীফ শুনান মওলবী সালমান এবং দ্বিতীয় দশক মওলভী খালিদ। যিলকাদ '৯৭ হিঃ (মুতাবেক অক্টোবর '৭৭ ইং হিজাযে প্রত্যাবর্তন করেন। জিদ্দা থেকে সোজা মদীনা তাইয়িবায় রওয়ানা হয়ে পড়েন। এবারকার অবস্থানকালে

খাদেমগণ ও বন্ধুবান্ধবগণ অনেক মুবারক স্বপ্ন দেখেন। অনেক শুভ ইংগিত লাভ করেন।[১০] এ বছর সাহারানপুরের রমযান মুলতবী করে দেন। ভক্ত মুরীদানকে পত্র লিখে স্ব-স্ব এলাকায় রমযান পালনের নির্দেশ দিয়ে দেন।[১১]

১৩৯৮ ও '৯৯ হিজরীর রমযানও পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত সাহারানপুরের নতুন ছাত্রাবাসের মসজিদে অত্যন্ত শান শওকতের সাথে পালিত হয়। ১৩৯৯ হিজ-রীর রমযানে ইতিকাফকারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার ছিল। ফলে স্থানাভাব দেখা দেয়। এজন্য এ বছর কাউকেই এক দশকের বেশীকাল ধরে ইতিকাফ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি। পূর্ববর্তী বছরগুলোর বিপরীতে এবার কেবল মওলভী সালমানই কুরআন শরীফ শুনান (অর্থাৎ তারাবীর ইমামতি করেন)।

১৪০০ হিজরীর রমযান (জুলাই, '৮০ ইং) পাকিস্তানী ভক্তমুরীদানের অনেক পুরানো আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ফয়সালাবাদে (ভূতপূর্ব লায়ালপুরে) কাটানো স্থির হয়। এর বিশেষ আহবায়ক, ব্যবস্থাপক ও যিম্মাদার ছিলেন হযরতের একজন বিশিষ্ট খলীফা ও তাবলীগী জমাআতের একজন ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল পরিচালক মুফতী যয়নুল আবেদীন সাহেব। পাকিস্তানী ভক্তবৃন্দ, তাবলীগী জামাআতের কর্মীগণ, হযরত রায়পুরীর ভক্ত মুরীদান, মাদ্রাসাসমূহের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ ও নিয়ামতরূপে বিবেচনা করে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট হন। অবস্থান করছিলেন দারুল উলুম ফয়সলাবাদ ও তার মসজিদে। এ রমযানটি অতিবাহিত হয় পূর্ণ ব্যস্ততা, দ্বীনী বরকত ও রূহানী ফয়েযসমূহের মধ্য দিয়ে। দৈনন্দিন কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ

ইশার আযানের অর্ধঘন্টা পূর্বে শায়খের বিশেষ মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। সাধারণতঃ শায়খ মুরাকাবার অবস্থায় বসা থাকতেন। সমবেত জনতাও হলকা-বন্দী হয়ে মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকতো। কিছুক্ষণ এরূপ মৌনও মুরাকাবা অবস্থায় কাঠানোর পর নবাগতদেরকে বয়আত করানো হতো। (এদের সংখ্যা দৈনিক ৩০/ ৪০ জন হতো)। হযরতের পক্ষ থেকে মাদ্রাসায়ে আরাবীয়া রায়বিণ্ডের শিক্ষক মওলভী ইহ্সান সাহেব বয়আতের প্রাক্কালে জরুরী জ্ঞাতব্যসমূহ ঘোষণা করতেন। হযরত আস্তে আস্তে বয়আতের শব্দগুলো বলতেন আর মওলভী ইহ্সান সাহেব সশব্দে তার পুনরাবৃত্তি করতেন। গোটা জামাআতের লোকজন তার অনুসরণ করতেন। এ বছর তারাবীহ্তে কেবল সোয়া পারা করে কুরআন পড়া হতো। তারাবীহ্র পর সূরা ইয়াসীনের খতম, তারপর দু'আ, তারপর কিতাব পাঠ করে

শুনানো হতো। তারপর শায়খের হুজরা বন্ধ করে দেয়া হতো আর লোকজন যার যার মতো ইবাদতে লিপ্ত হতেন। যুহরের নামাযের পর খতমে খাজেগান, দু'আ ও যিকিরের হল্‌কা হতো। (অর্থাৎ লোকজন বৃত্তাকারে বসে এসব করতেন।) আসরের নামাযের পর মজলিস হতো। মওলভী মঈনউদ্দীন সাহেব রমযানের পঠিতব্য কিতাবাদি সেখানে পড়ে শুনাতেন। গোটা মজলিস অভিভূত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা' শুনতো। ইফতারের পূর্বক্ষণে তা' বন্ধ হয়ে যেতো।

হযরত শায়খ ফয়সালাবাদ থেকে সাহারানপুর এসে এ অকিঞ্চনের নামে যে পত্র লিখেন তা' এখানে তুলে ধরছি ঃ

আল-মাখদুমুল মুকর্রম হযরত মাওলানা আলহাজ্জ আবুল হাসান আলী মিঞা-(আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন!) বাদ সালাম মসনূন।

আপনাদের ওযর থাকা সত্ত্বেও পত্রের অপেক্ষা থাকে। ফয়সালাবাদে তো বেশ ভালই ছিলাম। সেখান থেকে দিল্লীতেও ভালোয় ভালোয় এসে পৌছুই। কিন্তু সাহারানপুর এসে কেবল শয্যাগতই নই একেবারে গোরের পারে পৌছে গেছি। চব্বিশ ঘন্টাই চারপায়ীর উপর কাটছে।

কারো সাথে মেলামেশার কোন অবকাশই নাই। নামাযও ঘরেই পড়ছি। একেকবার ভাবি, মৃত্যুই টেনে হিন্দুস্তান নিয়ে আসেনি তো। 'কাওকাব' ৫০ কপি এবং "তারীখে দাওয়াত ও আযীমত"-এর ৪র্থ খণ্ডের কপিও পেয়েছি। একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত পড়িয়ে শুনতে পারিনি। স্বাস্থ্য এতই খারাপ যাচ্ছে যে, খাওয়া দাওয়া বল্‌তে কিছুই নেই; কয়েক চামচ ওষুধই এখন আমার একমাত্র খাদ্য। আপনার পেরেশানী ও ওযরের কথা জানতে পেরে খুবই কষ্ট পেয়েছি। রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি না করার জন্য আপনার মত আরও অনেকেই বল্‌ছেন। মওলভী ইনামও বলছেন, হিজরী শতাব্দী শুরু পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু মন খুব ঘাবড়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে, সাহারানপুর আগমনের ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহ আমার চাইতে একটুও কম নয়, কিন্তু মাথার উপর বিরাজমান পরিস্থিতি বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে তকদীরের কাছে আমরা নিরুপায়। কেবল আপনার প্রতীক্ষা ঘুচাবার মানসে শুয়ে শুয়ে এ পত্রাখানা লিখাচ্ছি। বেঁচে থাকলে মুলাকাত হয়েই যাবে।

১৯ শাওয়াল, ১৪০০ হিঃ

বকল্‌মে -শাহিদ

টীকা ঃ

১. আপবীতি

২. ভাই সা'দীর পূর্ণ নাম মুহাম্মদ সাঈদ রহমতুল্লাহ্। ইনি মাদ্রাসা সাউলতিয়ার প্রথম নাযিম মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদের পৌত্র, হাকীম মুহাম্মদ নঈম সাহেব কেরানভীর পুত্র এবং উক্ত সাউলতিয়া মাদ্রাসার দ্বিতীয় নাযিম মাওলানা মুহাম্মদ সলীম সাহেবের ভাতিজা। মক্কা শরীফে সৌদী সরকারের রেজিষ্টার পদে নিয়োজিত আছেন। মক্কা শরীফের বিশিষ্ট ও অভিজাত রঈসদের মধ্যে পরিগণিত হন। ৯৩ হিঃ থেকে আমরণ হযরত শায়খ ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের অবস্থানস্থল ছিল তাঁরই বিশাল বাসভবন। ইনি পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অঙ্কবিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হাফিয মুহাম্মদ উছমান কান্দেলভী সাহেবের দৌহিত্র-যিনি হযরত শায়খের সম্পর্কে মামা হতেন। ভাই সা'দী মওলভী মিসবাহুল হাসান কান্দেলভী মরহুমের জামাতা। হযরতের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অনেকটা পিতা-পুত্রের মতো। হযরতও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। হযরত ও তাঁর বিশাল কাফেলাকে আপ্যায়িত করার ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সুন্নতে-উছমানী (রা)-এর অনুসরণ করেছেন আর এটা ছিল তাঁর বংশগত উত্তরাধিকার।

৩. সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হুশিয়ারপুরী সেসব ভাগ্যবানদের অন্যতম, যাঁরা হযরত শায়খের খাস নযরে ছিলেন। হযরতের বিশিষ্ট খাদেম এবং খলীফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। শেষ সময় পর্যন্ত নবী করীম (সা.)-এর প্রতিবেশী ও নিজপীর ও শায়খের স্নেহ ছায়া পান। শায়খের মলফুযাত, শিক্ষাবলী ও তাঁর সুস্বপ্নগুলো সম্পর্কে তাঁর একাধিক পুস্তিকা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

৪. ডাক্তার ইসমাঈল মার্চেন্ট হযরতের একজন অন্তরঙ্গ খাদেম এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে একান্তই হযরত শায়খের খেদমতের জন্যই বুঝি অন্য স্থানের সম্পর্ক ও চাকুরী থেকে মুক্ত করে মদীনায় নিয়ে আসেন। হযরত শায়খের মেযাজ মর্যী ইনি খুব ভাল বুঝতেন।

৫. মদীনা তাইয়িবার বিশিষ্ট খাদেমগণের মধ্যে মওলভী আবদুল কাদির হায়দরাবাদী, মওলবী হাবীবুল্লাহ্, মওলবী নজীবুল্লাহ্, মওলবী ইসমাঈল বদাত এবং হাকীম আবদুল কুদ্দুস সাহেব এবং ছোটদের মধ্যে মওলবী শাহেদ এবং হাফিয জা'ফরের নাম উল্লেখযোগ্য।

৬. শায়খ তাঁর আপবীতীতে এ ব্যাপারে এ লেখক ও মাওলানা ইনামুল হাসানের সাহেবের নাম উল্লেখ করেছেন।

৭. বিস্তারিত বর্ণনা বিগত অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

৮. বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন আপবীতী পৃঃ ৭/১০৬

৯. ১৯ শে জুন, ৭৭ইং তারিখে লিখিত পত্র।

১০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আপবীতী পৃঃ ৭/২৩৩-৩৪ ও ২৪৩-৪৪

১১. আপবীতি ৭ম খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত

সপ্তম অধ্যায়

ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার দাওয়াতী ও তরবিয়তী সফর

ইংল্যান্ডের প্রথম সফর

১৯৭৯ ইংরেজীর জুন মাসে হযরত শায়খ প্রথমবারের মত ইংল্যাণ্ড সফর করেন তাঁর খলীফা মওলবী ইউসুফ মাতালা সাহেবের আমন্ত্রণক্রমে। ইনি লঙ্কাশায়রস্থ হোলকম্ববারীতে "দারুল উলূম হোলকম্ববারী" নামে একটি ধর্মীয় আরবী মাদ্রাসা কয়েক বছর পূর্বেই প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিলেন। মাদ্রাসাটি গোটা বৃটেনের বৃহত্তম আরবী মাদ্রাসা ও তরবিয়তী ও দাওয়াতী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।[১] মাদ্রাসাটি কোল্টনের শহুরে জনপদ থেকে ৮/১০ মাইল দূরে "হোলকম্বহিল" নামক একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আসলে এটা ছিল একটা সিনোটেরিয়াম—যা' কোন কারণে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ১৯৭৩ ইং সালে ১লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড মূল্যে দারুল উলূমের জন্য কিনে নেয়া হয়।

হযরত শায়খ ১৯৭৯ সালের ২৪শে জুন রাত সাড়ে দশটায় মাঞ্চেষ্টারের বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। আশেপাশের এলাকাসমূহ ও দূর দূরান্ত থেকে শত শত দর্শনার্থী তাঁর অভ্যর্থনা ও সাক্ষাৎলাভের জন্য বিমানবন্দরে সমবেত হয়েছিলেন। যেখানটায় মোটর থেকে নেমে হুইল-চেয়ারের মাধ্যমে তাঁর অতিক্রম করার কথা ছিল সেখানে লোকজন রাস্তার দুইধারে কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে যান। এভাবে তাঁরা তাঁকে এক নজর দেখার সুযোগ লাভ করেন। ইশার নামাযের পর মধ্যরাত্রিতে তিনি লোকজনের সাথে মুসাফাহা করেন। এতে প্রায় আধ ঘন্টাকাল লেগে যায়। দেড়টায় শুয়ে চারটায় ফজরের নামাযের জন্য শয্যাত্যাগ করেন। তারপরই যথারীতি দৈনন্দিন কার্যসূচী শুরু হয়ে যায়। বিস্তারিত বিরবণ নিম্নরূপঃ

ফজরের নামাযান্তে যিকির-আযকার ওযীফা পাঠ, সাড়ে আটটায় নাশ্‌তা। সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত শায়খের কোন কিতাব থেকে তাসাওউফ ও

আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে পাঠ , ১টা বাজে দুপুরের আহার, সাড়ে তিনটায় যুহরের নামায, নামাযের পর খতমে খাজেগান এবং জামাআতবদ্ধভাবে দু'আ, তারপর যাকিরীনের যিকির-বিল-জেহের বা সশব্দ যিকির ও অন্যদের দরূদ ও ইস্তিগফার ও তাসবীহ্ পাঠ। ৬টা বাজে বিকালের চা। সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মাওলানা মুফতী মাহ্মুদ হাসান সাহেব গাঙ্গুহী-এর বয়ান, আটটায় আসরের নামায। নামাযান্তে সান্ধ্য আহার। পৌনে দশটায় মগরিবের নামায এবং নামাযান্তে নামাযের স্থানেই প্রায় পৌনে একঘন্টা পর্যন্ত শায়খের সাধারণ মজলিস। সাড়ে এগরাটায় ইশার নামায। সন্ধ্যা ছয়টা বাজে আশেপাশের দোকানদার ও চাকুরীজীবী শ্রেণীর লোক নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে ছুটি পেয়ে দলে দলে এসে মসজিদে পৌছতেন। এ সময়ও হাজার লোকের সমাবেশ ঘটতো। শায়খের নির্দেশে এ বিরাট সমাবেশের লোকজন কমপক্ষে জনপ্রতি এক হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করতেন। হযরত প্রথম দিনই মজলিসে বলে দিয়েছিলেন, আমাকে দেখার জন্যে জড়ো হয়ে কোনই লাভ হবে না, যা' মিলবে, তা' আপনাদের কিছু করার (আমলের) দ্বারাই মিলবে। কমপক্ষে এতটুকু তো করুন যে, প্রত্যেকে এক হাজার বার করে দুরূদ শরীফ পড়ে নিন। এ ছাড়া অন্যান্য সময়ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে অন্তর ও রসনাকে আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল রাখবেন। দুরূদ শরীফ পাঠ সম্পন্ন হলে বয়আত গ্রহণে আগ্রহীদেরকে বয়আত করা হতো। এ বয়আতে ঈমানের নবায়ন, গুনাহ্সমূহ থেকে তওবা এবং ভবিষ্যতে শরী'আতের আনুগত ও সৎ জীবন যাপনের ওয়াদা অঙ্গীকার করানো হতো। হযরত নিজ পবিত্রমুখে বয়'আতের শপথ—বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন এবং মালিক আবদুল হাফীয সাহেব মাইকে তার পুনরাবৃত্তি করে সকলকে শুনিয়ে দিতেন।

শায়খ ইংল্যান্ড ১০/১১ দিন ছিলেন। এর মধ্যে মধ্যকার এক দিন (২৮ শে জুন বৃহস্পতিবার) বৃটেনের তাবলীগী প্রচারকেন্দ্র ডিউজবারীর জন্য রাখা হয়। দারুল উলুমের বাইরে এই একদিনই বৃটেনে তাঁর বাইরের সফর ছিল। সকাল সাড়ে দশ এগারটার দিকে রওয়ানা হন। বারটায় ডিউজবারী পৌছবার কয়েক মাইল আগে বাটলী পৌছে কিছু সময় বিশ্রাম নেন। কেননা, এখানে মহিলাদের বয়'আত হওয়ার প্রোগ্রাম নির্ধারিত ছিল। ডিউজবারী থেকে তিনি যখন রওয়ানা হন, তখন তাঁর অগ্রপশ্চাতে ডিউজবারীবাসীদের অধিকাংশই প্রদীপের সাথে পতঙ্গসম চল্তে শরু করেন। ডিউজবারীর চতুর্দিক থেকে যেভাবে লোক ছুটে আসছিল তাতে চতুর্দিকে

কেবল মোটর আর মোটরই দেখা যাচ্ছিলো। তাতে ঐ পংক্তিটিরই যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছিলো ঃ

منعم بکره و دشت و بیاباں غریب نیست
هر جاکه رفت خیـمـه زدو بارگاه ساخت

ডিউজবারী ছাড়াও দারুল উলূম থেকে আট দশ মাইল দূরবর্তী বোল্টন শহর তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত যাকারিয়া মসজিদ অবস্থিত। ওখানে ১লা জুলাই রোববার ১২টা থেকে যুহর অর্থাৎ (সাড়ে তিনটা) পর্যন্ত প্রোগ্রাম ছিল। সেখানে মুফতী মাহমূদ হাসান সাহেবের বয়ান ও মহিলাদের বয়'আত সম্পন্ন হয়। দুপুরের আহারও সেখানেই সম্পন্ন হয়।

১৯৭৯ সালের ৫ জুলাই সকাল ৯টায় মাঞ্চেস্টার বিমানঘাটি থেকে রওয়ানা হয়ে ১০টার দিকে লণ্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। সেখান থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে দিল্লী যাওয়ার প্রোগ্রাম নির্ধারিত ছিল। দুইটায় বিমান উড্ডয়ন করে নির্ধারিত সময়ে দিল্লীতে পৌছেন।২

দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহাসিক রমযান

অশীতিপর বৃদ্ধ (বয়স তখন ৮৬ বছর ছিল) রোগশোকে জরাজীর্ণ শায়খুল-হাদীছের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় রমযান অতিবাহিত করার সংকল্প ছিল আল্লাহ্র কুদরত ও শায়খুল হাদীছের কারামতের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ। কেননা তখন তিনি যে কেবল চলাফেরায়ই অক্ষম ছিলেন তাই নয়। নিজ ইচ্ছায় বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন এবং আপন শয্যায় উঠে বসাও ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

এটা কী করে সম্ভবপর হলো? এর জবাব এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সেই সুদূরে অবস্থানকারী দেশের মুসলমানদের কোন পুণ্যকাজ এমনি পসন্দ হয়ে গিয়েছিল যদ্দরুন খুশী হয়ে তিনি তাঁদের কল্যাণার্থ পিপাসার্তদের কূয়োর দিকে যাওয়ার পরিবর্তে (যা'তারা তাঁদের সাধ্যানুসারে করেও থাকেন) স্বয়ং কূয়াকেই পিপাসার্তদের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। (সে এমন একটি দেশ-যা' ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের লীলাক্ষেত্র, যেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত লাখ লাখ মুসলিম সন্তানের বাস-যাঁরা আজ পর্যন্ত ধনৈশ্বর্য ও পাশ্চাত্যবাদের ফিতনার মুকাবিলায় ইসলামের পবিত্র আমানত বুকে আঁকড়ে ধরে

আছেন এবং যাঁদের মধ্যে বংশানুক্রমে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দ্বীনের ধারকবাহকদের প্রতি মমত্ববোধ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এ দীর্ঘ সফরটি একাধিক গায়েবী ইঙ্গিত ও স্বপ্নে প্রদত্ত শুভ সমাচারেরই ফলশ্রুতিস্বরূপ। এ সফরে ধর্মানুরাগী ভক্ত জনেরা যেভাবে পতঙ্গের মত ভিড় করেছিলেন, যেভাবে এক চুম্বকীয় আকর্ষণে দেশের দূরদূরান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে লোকজন ছুটে এসেছিল এবং তাঁরা যে ধর্মানুরাগের পরিচয় দিয়েছিল, তা' নিঃসন্দেহে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম তৃতীয়াংশে হযরত সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ঝটিকা সফর এবং তাঁর হজের সফর ও হিজরতের ঝটিকা সফরের উজ্জ্বল স্মৃতিকেই স্মৃতিপটে জাগ্রত করে দেয়। সেখানকার ভক্তদের মধ্যে যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জোয়ার আসে, তাতে সেসব স্বপ্ন ও সু-সমাচারের সত্যতাও যথার্থতাও প্রমাণিত হয়। স্বয়ং হযরত শায়খ তাঁর একজন খাদেমের নামে লিখিত পত্রে লিখেন ঃ

> "অনেক শুভ ইঙ্গিত ও স্বপ্নের প্রেক্ষিতে এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় রমযান কাটাবার বন্ধুবান্ধবের পক্ষ থেকে জোরদার অনুরোধ ও চাপ আসছে। ভগ্নস্বাস্থ্য ও রোগ শোকের দরুন ওয়াদা করতে সাহস হচ্ছে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শুভ ইঙ্গিতসমূহ ও স্বপ্নের আধিক্যের জন্যে শেষ পর্যন্ত সাহসে বুক বেঁধে ফেলেছি।"

শায়খ এ সফরের আহ্বায়ক ও প্রস্তাবক মওলবী ইউসুফ তাতলার সাহেবের উপর কিছু শর্ত-শরায়েতও এ সফরের ব্যাপারে আরোপ করেন। তার মধ্যে একটি শর্ত ছিল(১) আমার এবং আমার সফর সঙ্গীদের ভাড়া চুকানোর দায়িত্ব আমার নিজের থাকবে। (২) যাঁরা সর্বদাই হাদিয়া তোহ্ফা প্রেরণ করে থাকেন, তাঁদের ছাড়া অন্য কারো হাদিয়া গ্রহণ করা চলবে না। (৩) খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ লৌকিকতা চলবে না, একান্তই অনাড়ম্বর এক দু'প্রকারের খাবার পরিবেশন করতে হবে। (৪) শুভানুধ্যায়ীদেরকে এ ব্যাপারে সম্মত করবেন যেন, তাঁরা আমাকে এক দু'দিনের জন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য জেদ না ধরেন। কেননা, কোথাও যাতায়াত করা আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব ব্যাপার। বরং যাকেরীনকে একত্রিত করবেন-যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে যিকির করবেন। ঐবার আফ্রিকার অনেক পুণ্যপিপাসু ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে ভাড়া ও সফরের ব্যয় বহনের বেশ কিছু প্রস্তাব আসে, কিন্তু হযরত তা' মঞ্জুর করেন নি। নিজের এবং সঙ্গী সাথীদের ভাড়া নিজ পকেট থেকে চুকিয়ে দেন। পাকিস্তানী মুদ্রায় তার পরিমাণ ছিল দু'লাখ টাকা।

ইসলামিক সেন্টার রি-ইউনিয়নের ডাইরেকটর মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদ আঙ্গার সাহেবের আবেদনক্রমে স্টাঙ্গার যাওয়ার পথে রি-ইউনিয়ন সফরও মঞ্জুর করে নেন এবং শর্ত করে নেন যে, সেখানে খানকা প্রতিষ্ঠা ও যিকিরের ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করবেন। ৪ঠা শাবান ১৪০৩ হিজরী (৬ই জুন, ১৯৮১ইং) বুধবার মদীনা শরীফ থেকে যাত্রা শুরু হয়। মক্কা শরীফে উমরা করেন। সেখানে ৯/১০ দিন অবস্থান করে ১৬ই জুন/১৪ই শাবান তারিখে জিদ্দা থেকে রি-ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়েন। রি-ইউনিয়ন পৌছেই ঠিক সেই কর্মসূচী শুরু করে দেন যা' সাধারণত রমযান মাসে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ৩/৪ দিন সেখানে অবস্থান করে ২০শে জুন শনিবার সেন্টডেনিস (Sent Denis) থেকে সেন্টপিয়ার (Saint Piere) তশরীফ নিয়ে যান। পরের দিন ২১শে জুন ডারবান (Durban)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। সেখানে অত্যন্ত উষ্ণ সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁর আগমনের পূর্বেই লোকজন দাড়ি রাখা শুরু করে দেন। তাঁদের ধর্মানুরাগ বিস্ময়জনকভাবে বৃদ্ধি পায়। ২৯শে শাবান তারিখে তিনি তাঁর সমস্ত মেহমানদের সাথে স্টাঙ্গারের জামে মসজিদে স্থানান্তরিত হয়ে যান এবং পূর্ণ মাস ই'তিকাফের নিয়্যাত করে নেন।

ঐ সময় সে এলাকার (ভারতের বিপরীতে মকরক্রান্তি রেখার উপর হওয়ায়) প্রচণ্ড শীত পড়েছিল। কিন্তু স্টাঙ্গার একটু নীচুতে থাকায় আবহাওয়া ততটা চরম থাকে না-অনেকটা সহনীয় থাকে। স্টাঙ্গার জামে মসজিদকে অবস্থানের জন্য নির্বাচনের কারণ হলো, মসজিদটি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং তিনটি ভাগের সমন্বয়ে গঠিত। উপরের অংশে প্রায় বার শ' লোকের এবং নীচের দুই অংশে এক হাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। প্রস্রাবখানা পায়খানা উক্ত মসজিদে প্রচুর সংখ্যক রয়েছে, এছাড়া আশেপাশে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখার এবং গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা ছিল। পরিবেশ ছিল শান্ত সমাহিত।

এক বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, শনি রোববার সেখানে ৬/৭ হাজার লোকের সমাবেশ হতো। স্থান সঙ্কুলানের জন্য মসজিদের চার পাশে চারটি অতিরিক্ত প্যাণ্ডেল বানাতে হয়। শনি রোববারের বিরাট সমাবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওয়ারলেস সেট বসাতে হয়। মসজিদ সংলগ্ন একটি অস্থায়ী ইনফরমেশন সেন্টার বসানো হয়। মেহমানদের সেবাযত্নের জন্য ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি বাহিনী মোতায়েন থাকে—৫০ জন সাহ্রীর সময়ের জন্য, ৫০ জন ইফতারীর সময়ের জন্য।

রমযান শরীফে শায়খের এ সদলবলে অবস্থানে গোটা এলাকায় ধর্মানুরাগের বান ডাকে। অনেক স্থানেই যিকিরের মজলিস প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অনেক স্থানে নতুন নতুন মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। দ্বীনী মাদ্রাসা ও কুরআনী মক্তবও অনেক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সচ্ছল পরিবারসমূহেও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরকে দূরদূরান্তের মাদ্রাসাসমূহে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অপরদিকে তবলীগী তৎপরতায়ও (যা' কয়েক বছর পূর্বেই দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হয়ে গিয়েছিল) নবজীবনের সঞ্চার হয়।দূরদূরান্ত থেকে এক শ' দু'শো মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে এমনকি অন্যান্য আফ্রিকান দেশ থেকে পর্যন্ত দর্শনার্থীরা এসে ভিড় জমান। ফয়েয ও বরকতে আপ্লুত হয়ে যখন তাঁরা বিদায় নিতেন, তখন বিদায় বেলার অশ্রুসজল নয়নগুলোই তাদের মনে যে ধর্মানুরাগের কী বিপুল সাড়া জেগেছে তা' ঘোষণা করতো।

হযরত পূর্ণমাস ইতিকাফের নিয়্যাত করে নেন। দৈনন্দিন কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপঃ

বাদ যুহর খতমে খাজেগান ও দু'আ, তারপর যিকিরের মজলিস, বাদ আসর কিতাবী তা'লীম। তারপর ইফতার। বাদ মাগরিব খাওয়া-দাওয়া ও বয়'আতের পর নফল নামাযাদি। বাদ তারাবীহ ইয়াসীন শরীফের খতম ও দু'আ। তারপর ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ পাঠ। তারপর শুরু হতো আগন্তুক ও দর্শনার্থীদের সাথে মুসাফাহার পালা। তাতে প্রায় ১ ঘন্টা বা তার চাইতেও কিছু অধিক সময় ব্যয়িত হতো। ইতিকাফকারী ও দর্শনার্থিগণের কেউ কেউ নফল নামায ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করতেন, কেউ কেউ আরাম করতেন। তারপর সাহ্রীর সময় উঠে তাসবীহ-তাহ্লীলে লিপ্ত হতেন। ফজর ও ইশরাকের নামাযের পর অধিকাংশই শুয়ে থাকতেন আবার কেউ কেউ তিলাওয়াতও করতেন। প্রত্যেক দিনই ওয়াযের ব্যবস্থা থাকতো। একদিন মাওলানা মুফতী মাহমূদ সাহেব গাঙ্গুহী আর অপর দিন মাওলানা আবদুল হালীম সাহেব জৌনপুরী পালাক্রমে ওয়ায করতেন। কিতাব বিভিন্ন সময়ে মাওলানা মঈনুদ্দীন সাহেব ও মাওলানা শাহেদ সাহেব পড়তেন। তারাবীহ পড়াতেন মাওলানা সালমান সাহেব। মাওলানা আবদুল হাফীয সাহেব মক্কী সাধারণতঃ মুনাজাত পরিচালনা করতেন। এ মুনাজাত হতো বড় ব্যাপক ও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী। তাতে সারা দুনিয়ায় হিদায়াতের ব্যাপ্তি দ্বীন ইসলামের তরক্কী ও বুলন্দীর দু'আ করা হতো।

রমযানের শুরুতে ইতিকাফকারীর সংখ্যা ছিল কয়েক শ'। মাসের শেষ দিকে তা' হাজারের কোঠাকেও অতিক্রম করে যায়। স্থানীয় ইতিকাফকারিগণ মসজিদের নীচের অংশে এবং বহিরাগতগণ উপরের অংশে—যা' মসজিদের মূল অংশ বলে বিবেচিত হয়ে ই'তিকাফ করছিলেন। দর্শনার্থীদের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়তে থাকে। এমনকি শনি রোববার তাঁদের সংখ্যা তিন হাজার অতিক্রম করে ৪/৫ হাজারের কোঠায় গিয়ে উঠতো।

৪ঠা আগষ্ট ১৯৮১ইং মুতাবিক ৩রা শাওয়াল ১৪০১ হিঃ মঙ্গলবার যুহরের নামাযান্তে খতমে খাজেগান পড়ার পর মাওলানা আবদুল হাফীয সাহেব মক্কী বিদায়ী মুনাজাত পরিচালনা করলেন। মুনাজাতের মধ্যে লোকজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। ২টা পর্যন্ত সমস্ত প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি সেরে হযরত শায়খ গাড়ীতে আরোহণ করেন এবং স্টেঙ্গার মসজিদ থেকে রওয়ানা হয়ে পড়েন। পথে কয়েক জায়গায় থেকে এবং দু'আ করে সিলভার গ্লেন, রিচমণ্ড ও মারিজবুর্গ (MARTIZBURG) হয়ে ইস্পিঙ্গো বীচ (ISPINGO BEACH) যান। মারিজবুর্গে প্রায় ৩ হাজার লোক শায়খের সাথে মুসাফাহা করেন। পথে প্রত্যেক স্থানেই তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করেন। ইস্পিঙ্গো বীচে প্রায় এক হাজার লোকের সমাবেশ ছিল। এখানে জুমুআর নামায আদায় করেন। ডারবান থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল হোয়াইট রিভার বে-সরকারী বিমান বন্দর থেকে। মওলবী মুহাম্মদ গার্ডী এখানে পুরো দুটো বিমান চার্টার করে রেখেছিলেন। হোয়াইট রিভারে দর্শনার্থী জনতার প্রচণ্ড ভিড় ছিল। কিন্তু অন্য সকল স্থানের মত এখানেও পুলিশ ও মিলিটারী গার্ডের ব্যবস্থা ছিল। এখানে নওমুসলিম কৃষ্ণাঙ্গদের ভিড় খুব বেশী ছিল। আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত লোকের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আগত প্রায় ৭/৮ শ' কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান কুরআন শরীফের সবক নেন।

এখান থেকে রওয়ানা হয়ে বিমানযোগে জোহান্সবার্গ গিয়ে পৌছান। সেখানেও পূর্ববর্তী কর্মসূচী অব্যাহত থাকে। জোহান্সবার্গ থেকে যান কেপটাউনে। এখানে জামে আযহার ও সউদী আরবে শিক্ষাপ্রাপ্ত জাভাদেশীয় উলামা অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এঁরা এ এলাকায় প্রাচীনকাল ধরে বসবাস করে আসছেন। হযরত শায়খ প্রথমে কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন।৩

জাভী বংশোদ্ভূত ও মক্কায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কেপটাউনের উলামা সংগঠনের সভাপতি নযীম মুহাম্মদ সাহেব হযরতের শুভাগমনকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন। এখানকার

উলামা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে হযরতের সাথে মিশেন। কেপটাউন থেকে ফিরে আবার জোহান্সবার্গ যেতে হয়। সেখান থেকে লে-নিশিয়া। লে-নিশিয়ায় অভ্যর্থনাকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। করমর্দনে বেশ সময় লাগলো। শিশুদের 'বিসমিল্লাহ্খানি' করা হলো। এখানে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৫ই আগস্ট (১৪ই শওয়াল) লে-নিশিয়ায় অবস্থান করেন। সেখানে আরও কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। ১৬ই আগস্টও সেখানেই অবস্থান করেন। বিদায়কালে সাড়ে তিন হাজার লোকের সমাবেশ ছিল। করমর্দনে অনেক সময় লেগে যায়। ১৮ই আগস্ট (১৭ই শওয়াল) তারিখে জাম্বিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। জাম্বিয়াওয়ালারা একটি সামরিক বিমান চার্টার করে জাম্বিয়া থেকে জোহান্সবার্গ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় মুদ্রায় এর ভাড়া পড়েছিল প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা। বিমানটি ছিল ১১ আসন বিশিষ্ট। বিদায় বেলায় হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ছিল। শতাধিক মোটর গাড়ীই ছিল। যেহেতু এটা ছিল তাঁর বিদায়ের সময় তাই গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বন্ধুবান্ধব ও ভক্তজনেরা ছুটে এসেছিলেন। শোকবিহ্বল জনতা সশব্দ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পথে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মুসলমানদের একটি ছোট জনপদ চিপাতায় (CHIPATA) বিমান অবতরণ করে। অপেক্ষমান জনতার সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। চিপাতায় এক বিরাট সঙ্কট থেকে আল্লাহ্ বিমানকে রক্ষা করেন এবং বিমান নিরাপদেই ফিরে যায়। এ সফরে আহার্যে বরকত ও বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়ার এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়-যা' কেবল আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাদের জীবনেই সংঘটিত হয়ে থাকে। জুমুআর নামাযও চিপাতায় আদায় করেন এবং সেখানে একটি মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

২২শে আগস্ট (২১শে শাওয়াল) তারিখে চিপাতা থেকে লুসাকায় রওয়ানা হন। লুসাকার বিমানবন্দর লোকে লোকারণ্য ছিল। কয়েক হাজার ভক্তের সমাবেশ হয়। মুহুর্মুহু নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে গোটা বিমান বন্দর কেঁপে উঠে। এখানকার মেজবানরা প্রচুর ইন্তেজাম করে রেখেছিলেন। শামিয়ানার নীচে কয়েক হাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান হতো। হযরতের মেজবান ইবরাহীম হুসাইন লম্বাওয়ালা সাহেব গোটা লুসাকা শহরের মুসলমানদেরকে দাওয়াত করে রেখেছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার লোক হযরতের সাথে আহার্য গ্রহণ করেন। ২৪শে আগস্ট তারিখে হযরত দারুল উলূম পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার পরিচালকদের অনুরোধক্রমে মাদ্রাসাটির নামকরণ করেন 'মাদ্রাসায়ে রহমানিয়া'।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সফর

২৫শে আগস্ট ১৯৮১ইং মুতাবিক ২৪শে শাওয়াল ১৪০২ হিজরী তারিখে লুসাকা থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এটা ছিল লন্ডনে তাঁর দ্বিতীয় সফর। বিমান বন্দরে যাত্রাকালে তাঁর পশ্চাতে ছিল দেড়শ' মোটর গাড়ীর এক দীর্ঘ বহর। পুলিশের গাড়ী ছিল তার অতিরিক্ত। লুসাকা থেকে রওয়ানা হয়ে তিউনিসের বিমান বন্দরে থেকে (জামাআতের সাথে নামায আদায় করে) নিরাপদে লণ্ডনের বিমান বন্দরে গিয়ে পৌছেন। এখান থেকে জাহাজযোগে ম্যাঞ্চেষ্টার যাওয়ার কথা ছিল। এখানকার ভক্তরা পঞ্চাশ আসন বিশিষ্ট একটি জাহাজ ১৮০০ পাউণ্ড ব্যয়ে চার্টার করে রেখেছিলেন। নিরাপদেই শায়খ তাঁর সঙ্গীসাথীসহ ম্যাঞ্চেষ্টার গিয়ে পৌছেন এবং ২টা ২৫ মিনিটে দারুল উলূম বোস্টনে পৌছে সেখানে তাঁর চিরাচরিত দৈনন্দিন কর্মসূচী শুরু করে দেন। কুরআন শরীফের উদ্বোধন, খতম ও বয়'আতের সমাবেশও হতে থাকে। ২৯শে আগস্ট (২৮শে শাওয়াল) বান্ধের দিন ছিল বিধায় সমাবেশের লোকসংখ্যা ৩ থেকে সাড়ে তিন হাজার ছিল।

৩০শে আগস্ট (২৯শে শাওয়াল) তারিখ রোববার ডিউজঁবারীর তাবলীগী মরকযে যোগদান নির্ধারিত ছিল। পথে বাটলীতে কিছুক্ষণের জন্য থাকতে হয়। মসজিদে সমবেত মহিলাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু'হাজার। এঁরা আশে-পাশের হুজরাসমূহ এবং মসজিদের নীচের অংশে সমবেত ছিলেন। এসব মহিলাদের সকলেই বয়'আত হওয়ার জন্য এসেছিলেন। ১১টা ৪০ মিনিটে ডিউজবারীতে পৌছেন। সেখানে মাদ্রাসা ভবন নির্মাণাধীন ছিল। এখান থেকে বহির্দেশে কাজ করার জন্য ৩৫টি জামাআত বিদায় হয়ে যায়। এদের সাথে বিদায়ী মুসাফাহা করেন। প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ ছিল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দর্শনার্থীরা এসেছিলেন। ডিউজবারী থেকে ব্ল্যাকবর্ণ মাদ্রাসার তিন শহীদের মাযারে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে যান। এঁরা গত বছর এক দুর্ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন।

৫ ও ৬ ই যিলকাদ তারিখে দারুল উলূমে জমিয়তে উলামায়ে বরতানিয়া বা ব্রিটেন উলামা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অসুস্থতার জন্য শায়খ তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। ৬ই সেপ্টেম্বর (৬ই যিলকাদ) তারিখে ৫২ জন শিক্ষার্থীর দস্তারবন্দী হয়। সাথে সাথে বুখারী শরীফের সমাপ্তি এবং মিশকাত শরীফের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আজকের সমাবেশ ছিল অত্যন্ত জনাকীর্ণ। মাদ্রাসা ও শামিয়ানা লোকে লোকারণ্য ছিল। হযরত মঞ্চে তশরীফ আনেন। তালেব

ইল্‌মগণ তে-পায়ার উপর হাদীছের কিতাব রেখে চারদিকে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রথম হাদীছ মুসালসাল বিল আউয়ালিয়া পাঠ করা হলো। হযরত শ্রোতৃমণ্ডলীকে এর ইজাযত দান করেন। শায়খুল হাদীছ মাওলানা ইসলামুল হক সাহেব বুখারী শরীফের শেষ হাদীছটি পাঠ করেন এবং নতুন বছরের বুখারীর উদ্বোধনও করেন। তারপর মিশকাতের জামাআতের পালা এলো। তিন জন মুদাররিসকে হযরত শায়খের পক্ষ থেকে টুপী ও পাগড়ী প্রদান করা হলো। ব্রিটেনের মত দেশে এ দৃশ্যটি ছিল অভূতপূর্ব। ৫২ জন আলিম, ক্বারী ও হাফিয তৈরী হলেন। তারপর আযান ও জামাআত হলো। আজ প্রায় সাত হাযার লোকের সমাবেশ হয়। অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শে হযরতকে কয়েকদিন হাসপাতালেও অবস্থান করতে হয়।

১৬ই সেপ্টেম্বর (১৬ই যিলকাদ) ছিল সউদীয়ার সফরের দিন। বিদায় উপলক্ষে লোকের ভিড় ছিল প্রচুর। মাদ্রাসা ও আশেপাশের রাস্তাগুলো লোকে লোকারণ্য ছিল। প্রায় ৬/৭ হাজার লোকের সমাবেশ ছিল। ১০টা ২৫ মিনিটে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার বিমান বন্দরে পৌছেন। ১২টায় নিরাপদে লণ্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। সেখান থেকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে গিয়ে পৌছেন। ২টা ৪৫ মিনিটে জাহাজ আকাশে উড়ে। সঙ্গীসাথীরা ইহ্‌রাম বেঁধে নেন। অসুস্থতার জন্য শুরু থেকেই তিনি জিদ্দার নিয়্যাত করেছিলেন। ৮টা ১৮ মিনিটে নিরাপদে জিদ্দায় অবতরণ করেন।

টীকা ঃ

১. ১৯৭৬ সালের মে মাসে ইংল্যান্ডে সফরকালে এ মাদ্রাসাটি দেখার এবং তাতে একরাত্রি কাটাবার সুযোগ হয়। মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠাতা মওলবী মাতালা ও তাঁর সহোদর মওলবী আবদুর রহীম মাতালার প্রতি হযরত শায়খের নেকনজর ছিল এবং তিনি তাঁদের প্রতি খুবই প্রসন্ন ছিলেন। উভয় ভাই হযরতের খুব ঘনিষ্ঠ আপন জন বলে বিবেচিত হতেন।

২. এ তথ্যগুলো মওলবী আতীকুর রহমান সম্ভলীর আগস্ট ১৯৭৯ ইং/ রমযান ১৩৯৯ হিঃ সংখ্যা আল-ফুরকানে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সংক্ষেপে নেয়া হলো। মওলবী আতীক সাহেব ছিলেন শায়খের একজন সফরসঙ্গী এবং তাঁর এ বিবরণ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

৩. প্রিয়বর মওলবী আলী আদম নদভী (কেপটাউনবাসী) বলেছেন, এখানে ডাচ-সরকার কর্তৃক ইন্দোনেশিয়া থেকে বহিষ্কৃত অনেক আরব উলামা ও মাশায়েখের কবর রয়েছে- যাঁদেরকে ডাচ সরকার তাদের শাসনামলে রাজনৈতিক বন্দীরূপে ধরে এনে এখান ছেড়ে দিত। ঐ সব বন্দী আলিমদের অনেকেই কামিল ওলী ও সাহেবে-কারামত ছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

রোগশোক ও ওফাত

দীর্ঘ রোগভোগ ও হিন্দুস্তান সফর

হযরত শায়খের রোগভোগ চলে সুদীর্ঘকাল ধরে। অনেক সময় বছরের পর বছর ধরেই তাঁর রোগভোগ চল্‌তো। অনেক সময় ঘনিষ্ঠ ভক্তজন ও চিকিৎসকগণ পর্যন্ত তাঁর জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রচার-প্রসার, মাশায়েখ ও মুরুব্বীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণাবলীর প্রচার, তাঁদের রচনাবলীর সংরক্ষণ ও প্রসার, তবলীগী জামাআতের দেখাশোনা এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত মুরীদানকে 'কামেল' পর্যায়ে উন্নীতকরণের যে বিপুল খেদমত তাঁর জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন তা' সম্পন্ন করার জন্যে বারবার আকাশ মেঘমুক্ত হয়েছে এবং ভক্তজনরা আবার আশ্বস্ত হয়েছেন।

ব্যাধি ও দুর্বলতা নিয়েই তিনি ১৫ই মুহার্‌রম ১৪০২ হিঃ/১২ই নভেম্বর ১৯৮১ ইং তারিখে হযরত শায়খ মদীনা তাইয়িবা থেকে হিন্দুস্তানে আগমন করেন। ২০ দিন তিনি দিল্লীতে অবস্থান করেন। রোগ দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাস্থ্যের এতই অবনতি ঘটে যে, জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। ঘনিষ্ঠজনদের পরামর্শক্রমে দিল্লীর হলিফ্যামিলী হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। সেখানে যাবতীয় ডাক্তারী পরীক্ষা এক্স্‌রে প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন হলো।

চিকিৎসকরা সন্দেহ করছিলেন, ক্যান্সার হয়ে গেল কিনা। অতিরিক্ত দুর্বলতার দরুন কয়েকবার রক্তও দিতে হয়। কয়েকবারই জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। এ লেখক, মাওলানা মনযূর নু'মানী, মুহাম্মদ ছানী, মওলবী মঈনুল্লাহ্ ও মওলবী তাহেরসহ সঙ্গীসাথীদের একটি জামাআতসহ সাক্ষাৎ ও কুশলাদি জানবার উদ্দেশ্যে দিল্লী যাই। সেখানে তাঁর সঙ্গীন অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি মদীনা তাইয়িবা পৌছানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। আশঙ্কা হচ্ছিল, পাছে এমন কিছু ঘটে যায়, যদ্দরুন আজীবন আক্ষেপ করতে হয় এবং শত্রুরা হাসির সুযোগ পেয়ে যায়। জমিয়তে

উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আস'আদ মদনী সর্বক্ষণ শায়খের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছিলেন এবং প্রায়ই হযরতকে দেখতে যেতেন। তিনি এ ব্যাপারে শুধু একমতই ছিলেন না বরং আমাদের চাইতে অগ্রণী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জন সাহস করে খাদেম ও শুশ্রূষাকারীদেরকে আমাদের মতামত স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম। পরিস্থিতি লক্ষ্যে একদিনও বিলম্ব করা ঠিক মনে হচ্ছিল না। কিন্তু শুশ্রূষাকারী সেবকগণ (বিশেষত শায়খের বিশিষ্ট খাদেম আলহাজ্জ আবুল হাসান সাহেব) এতে দ্বিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এখনও শায়খের সাহারানপুর যাওয়া এবং তথায় অবস্থান বাকী রয়েছে। শায়খ এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন এবং কয়েকবার সেদিকে ইঙ্গিতও করেছেন। আমাদের আর এর চাইতে বেশী করার মত ছিল না। তাঁদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে চুপ করে রইলাম।

হলি ফ্যামিলী থেকে শায়খ হাকিম কারামত আলী সাহেবের কুঠিতে নীত হলেন। সেখানে আরাম ও চিকিৎসার সমুদয় সুবিধা ছিল। ৪ঠা সফর ১৪০২ হিঃ (২রা ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং) তারিখে সাহারানপুর তশরীফ নিয়ে যান। এ সময় আমরা পুনরায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে দিল্লীর তুলনায় স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করি। কিন্তু তবুও আমরা চিন্তামুক্ত ছিলাম না।

মদীনা তাইয়িবায় প্রতাবর্তন

অবশেষে আল্লাহ্ শায়খের শেষ আকাঙ্ক্ষা এবং ভক্ত অনুরক্তদের দু'আ কবুল করলেন এবং শায়খ তাঁর বিশিষ্ট খাদেমবর্গ ও সঙ্গীসাথীসহ ১৮ই রবিউল আউয়াল ১৪০২ হিঃ (১৬ই জানুয়ারী ১৯৮২ ইং) তারিখে করাচীর পথে জিদ্দা রওয়ানা হয়ে পড়লেন এবং সেখান থেকে নিরাপদেই মদীনা তাইয়িবা পৌছে গেলেন। চিকিৎসা অব্যাহত ছিল। হিন্দুস্তানের ভক্তগণ কখনো তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির সংবাদে উদ্বেগাকূল আবার কখনো বা একটু উন্নতির সংবাদে আশ্বস্ত হচ্ছিলেন।

অন্তিম সাক্ষাৎ

এ সময় ২৯শে রবিউল আউয়াল ১৪০২ হিজরী (জানুয়ারী ১৯৮২ইং) তারিখে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর উচ্চতর মসজিদ পরিষদ ও ফিকাহ্‌বিদ সম্মেলন (আরবী নাম المجلس الاعلى للمساجد ও المجمع الفقهى)–এর অধিবেশনে

যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি মওলবী মঈনুল্লাহ্ নদভী নায়েবে নাযিম, নদওয়াতুল উলামাসহ মক্কা মুয়ায্যামায় হাযির হই। সৌভাগ্যক্রমে হযরত শায়খও তখন মক্কা মুয়ায্যমায় ভাই সা'দী সাহেবের বাটীতে অবস্থান করছিলেন এবং আমারাও তাঁরই সংলগ্ন ডক্টর মওলবী আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভীর বাড়ীতে উঠেছিলাম। মাত্র কয়েক গজের ব্যবধানে আমরা হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন আচরণ করেন। শারীরিক দুর্বলতা খুব বেশী ছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক তখনো অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয় ছিল। আমার সাথে মদীনা শরীফে যেরূপ স্নেহ বাৎসল্যপূর্ণ আচরণ সর্বদা করতেন এখানেও তার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। ভাই আবুল হাসান সাহেবকে বলতেন, আলী মিয়াকে মদীনা তাইয়িবায় যে খামীরা খাওয়াতেন তাই দৈনিক খেতে দেবেন। ঠাণ্ডা পানির প্রয়োজন কি না বার বার ফিরে ফিরে জিজ্ঞাসা করতেন এবং প্রয়োজনীয় হিদায়ত দিতেন। এ সময় দারুল উলূম দেওবন্দের কলহ তাঁর মনমগজকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। দিনে দুইবার দেখা করতে যেতাম। প্রত্যেকবারই দারুল উলূমের সর্বশেষ খবর কি জান্তে চাইতেন। একটি সাক্ষাৎও এমন ছিল না যাতে তিনি দারুল উলূম সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠার কথা প্রকাশ করেননি। আমি প্রিয়বর মুহাম্মদ ছানীর একটি পত্র তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, অবসর সময়ে হযরত দেখে নেবেন। বললেন, না এক্ষুণি শুনবো এবং এর জবাবও লিখাবো। যতদূর মনে পড়ে মওলভী তালহা সাহেব চিঠিখানা পড়ে শুনালেন। তখন কে জানতো যে, মাত্র দুই আড়াই মাসের ব্যবধানে খাদেম ও মখদূম মুরীদ ও মুর্শিদ উভয়েই আল্লাহ্‌র দরবারে পৌছে যাবেন।

একটি স্মরণীয় শোকপত্র

ফেব্রুয়ারীতে আমরা উভয়েই বোম্বে পৌছলাম। এখানে হিন্দুস্তান পৌছতেই প্রিয়বর মুহাম্মদ ছানী মরহুমের প্রাণান্তকর মৃত্যু সংবাদ মনমস্তিষ্ককে আহত বরং প্রতিটি স্নায়ুকে পর্যন্ত আন্দোলিত করে তুললো। দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৬ই ফেব্রুয়ারীর এগার-বারোটার দিকে। ঐদিনই আসরের নামাযের পূর্বে মদীনা শরীফে শায়খকে টেলিফোনে তা' অবহিত করা হয়। হযরত তাঁর মৃত্যুতে আমার নামে যে শোক-পত্র লিখেন তা' একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক পত্র। পত্রখানিতেই হযরতের প্রত্যুৎমতিত্ব, সুতীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাঁর নিজের যাত্রাও যে আসন্ন সে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটিও তাতে নিহিত ছিল। সে পত্রটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করছি ঃ

باسمه سبحانه

আল–মখদুমুল মুকার্‌রম হযরত আলহাজ্জ আলী মিয়া সাহেব! (আল্লাহ্ আপনার মর্যাদা বর্ধিত করুন,)

বা'দ সালাম মস্‌নূন, কাল ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ইং যুহরের পর প্রিয়বর মওলভী হাবীবুল্লাহ্ প্রাণান্তকর শোকসংবাদটি জানালেন যে, যুহরের পূর্বে আমি যখন নিদ্রিত ছিলাম, তখন নূরওলী সাহেবের কর্মচারী এসে খবর দিয়ে গেল যে, আজ দিন সাড়ে এগরাটার "মুহাম্মদ ছানী হাসনী"–এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

انا لله و انا اليه راجعون - اللهم اجرنا فى مصيبتنا و عوضنا خيرا منها - لله ما اخذ وله ما اعطى و كل شئ عنده بمقدار -

ان العين تدمع و القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا و انا بفراقك يا محمد لمحزون-

অর্থাৎ– চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয়, অন্তর মর্মাহত হয়
কিন্তু আমরা তা–ই বল্‌বো যা' আমাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে।
আর তোমার বিরহে আমরা কাতর হে মুহাম্মদ!

আলী মিঞা,

হযরত ইমাম শাফিঈ (র.)–এর সেই কবিতাটি মনে পড়ছে–যা' তিনি হযরত ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহ্‌দীকে তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ

انى معزيك لا انى على ثقة * من الحياة ولكن سنة الدين
فما المعزى بباق بعد ميته * ولا المعزى و لو عاشا الى حين

শোকবার্তা পাঠাই আমি সুন্নতেরই পায়রবীতে,
এই ভরসায় নয়কো কভু রইবো বেঁচে পৃথিবীতে।
শোকবার্তার প্রাপকও তো মৃতের পরে রয় না বেঁচে,
প্রেরকও তো যাবেই চলে যদিও ক'দিন রয়ও বেঁচে।।

আলী মিঞা! প্রাণান্তকর দুঃসংবাদটি শুনে অন্তরে যে কী আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা' ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। এদিকে আপনার বার্ধক্যও

উপর্যুপরি দুর্ঘটনার সংবাদগুলোও অন্তরে বড্ডই কষ্টকর ঠেকছে। কিন্তু কেবল কষ্ট পেয়ে তো যারা চলে যায় তাদেরও কোন উপকার হয় না, আর যারা বেঁচে থাকে তাদেরও শান্তি জুটে না। আমি তো খবর পেয়েই আমি আমার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সবাইকে ঈসালে-ছওয়াব ও মাগফিরাতের দু'আর জন্য তাগিদ দিতে থাকি। আমার মতে এটাই প্রকৃত শোক প্রকাশ। আর এর অনেক ঘটনাও আমার "আপবীতী" এর মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মরহুমকে মাগফিরাত করুন এবং উত্তম প্রতিদান দিন এবং বিরহ কাতর আত্মীয়স্বজনকে বিশেষত: আপনাকে সব্‌রে জমীল বা সর্বোত্তম ধৈর্যের তওফীক দান করুন!

এ সময় রয়ে রয়ে মরহুমের গুণাবলী ও কথাসমূহ মনে পড়ছে। সাথে সাথে আপনার কথাটিও ভাবছি, না জানি আপনার প্রাণে সে বেদনা কীভাবেই না বাজছে!

কুরবান যান নবী করীম (সা.)-এর উপর যে প্রতিটি ব্যাপারে আমাদের করণীয় আমল সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিন সে সব সাহাবা ও মুহাদ্দিছীনকে-যাঁরা ঐসব বর্ণনা আমাদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন। এখন আমি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে লিখিত সেই শোকপত্রখানা উদ্ধৃত করিয়ে দিচ্ছি-যা' তিনি হযরত মু'আয-এর পুত্র বিয়োগকালে তাঁকে লিখিয়েছিলেন ঃ

من محمد رسول الله الى معاذ ابن جبل سلام الله عليك فانى احمد الله الذى لا اله الا هو -

-আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে মু'আয ইব্‌ন জাবালের প্রতি-আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ তোমার প্রতি বর্ষিত হোক্-আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি-যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

اما بعد ، فعظم الله لك الاجر والهمك الصبر و رزقنا و اياك الشكر

পর- আল্লাহ্ তোমার এ বিপদের প্রতিদানকে বড় করুন! তোমাকে সবরের তাওফীক দিন এবং আমাকেও তোমাকে শুকরিয়া জ্ঞাপনের তওফীক প্রদান করুন!

ثم ان انفسنا و اموالنا و اهالينا و اولادنا من مواهب الله عز و جل الهنيئة و عواريه المستودعة متعك الله له فى غبطة و سرور و قبضه بأجر كبير-

তারপর (বক্তব্য হচ্ছে), নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণসমূহ, আমাদের ধনৈশ্বর্য ও পরিবারপরিজন ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ্ তা'আলারই দান এবং তাঁরই গচ্ছিত আমানত স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন চেয়েছেন তোমার খেয়ালখুশী মত তা থেকে উপকৃত হতে এবং তা' উপভোগ করতে দিয়েছেন; এখন তিনি তা উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তার বড় প্রতিদান তিনি দেবেন।

الصلوة و الرحمة و الهدى ان احتسبته

আল্লাহ্র আর্শীবাদ, রহমত ও তাঁর পক্ষ থেকে হিদায়তের সুসংবাদ দিচ্ছি –যদি তুমি ছওয়াব ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় ধৈর্যধারণ করে থাকো।

يا معاذ فاصبر ولا يحبط جزعك اجرك

হে মু'আয! ধৈর্যধারণ কর, পাছে তোমার বিলাপ ও হা–হুতাশ যেন তোমার প্রাপ্য প্রতিদানকে নষ্ট করে না দেয়।

فتندم على ما فاتك

আর যা হারাবে তার জন্যে তোমাকে লজ্জিত হতে হয়–

و اعلم ان الجزع لا يرد ميتا ولا يرفع حزنا

জেনে রাখ, বিলাপের দ্বারা কোন মৃতব্যক্তি ফিরে আসে না, আর অন্তরের ব্যথাও প্রশমিত হয় না।

فليذهب اسفك على ما هو نازل بك فكان قد

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা' আসবার তা এসেই যাবে বরং এসেই গেছে।

والسلام

ওয়াস্সালাম!

আর এ হাদীছটি খুবই মশহুর ঃ

ما يزال البلاء بالمؤمن و المؤمنة فى نفسه و ولده و ماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة

"ঈমানদার পুরুষ ও নারীকে সর্বদাই তার জানমাল ও সন্তানসন্ততির ব্যাপারে বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয় আর তারা আল্লাহ্র সাথে এমনি অবস্থায় গিয়ে মিলিত হয়ে যে, তাদের মাথার উপর গুনাহ্র বোঝা থাকে না।

তারপর ঃ

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الا مثل فالا مثل ، يبتلى الناس على قدر دينهم

মানব জাতির মধ্যে সবচাইতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় নবী-রসূলগণকে। তারপর যারা তাঁদের যত ঘনিষ্ঠ হন, তাঁদের পরীক্ষা ততই কঠিন হয়। মানুষের পরীক্ষা হয়ে তাদের দীনদারীর মাত্রা অনুসারে।

فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه

যার দীনদারী যত উচ্চ পর্যায়ের তার পরীক্ষা তত কঠিন হয়।

و من ضعف دينه ضعف بلاؤه

আর যার দীনদারী যত দুর্বল ও নিম্নমানের হবে, তার পরীক্ষাও তত নিম্নমানের হবে।

و ان الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشى فى الارض ما عليه خطيئة

আর মানুষ সব সময় পরীক্ষা- নিরীক্ষার ভেতর দিয়েই চলে, এমন কি (এভাবে তার গুনাহ্ মাফ হতে হতে এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় যে) সে পৃথিবীর উপর বিচরণ করে, অথচ তার গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকে না।

এটাও আপনার এবং আপনাদের পরিবারের অবস্থার সাথে সঙ্গতিশীল।

অসুস্থ ও ওযরগ্রস্ত অবস্থায় এ সংক্ষিপ্ত পত্রখানি লিখিয়ে দিলাম। এ পত্রখানিই প্রিয় মরহুমের আম্মা, তার সহধর্মিণী এবং বাচ্চাদেরকে এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠদেরকে পড়িয়ে নেবেন। প্রত্যেকের নামে ভিন্নভিন্নভাবে পত্র লিখানো আমার বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সর্বশেষে ঐ বেদুঈনের দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত করে পত্রখানির ইতি টানছি যা' সে হযরত ই'বন আব্বাসকে তাঁর পিতা হযরত আব্বাসের মৃত্যু উপলক্ষে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে শুনিয়েছিল ঃ

اصبر نكن بك صابرين فانما * صبر الرعية بعد صبر الرأس

خير من العباس أجرك بعده * و الله خير منك للعباس

"সবুর কর আমরা তখন করবো সবুর সাথে তোমার,
প্রজাগণে সবুর করে দেখে সবুর তাদের রাজার।

আব্বাসেরও চাইতে তোমার ধৈর্যরই ফল অনেক বাড়া
তোমার চেয়ে আব্বাসেরও খোদার ছায়া অনেক বাড়া।

(অর্থাৎ আব্বাস বেঁচে থাকলে আপনার যতটুকু না উপকার হতো, তার চাইতেও ঢের বেশী উপকৃত হবেন তাঁর মৃত্যুজনিত বিরহ কষ্টে ধৈর্যধারণ করে আর আব্বাস বেঁচে থাকলে আপনার যে সেবাযত্ন বা আনুকূল্য পেতেন, তার তুলনায় আল্লাহ্‌র দয়া ও আনুকূল্য তার জন্যে অনেক বেশী উপাদেয় হবে। সুতরাং বিলাপ ছেড়ে ধৈর্যধারণ করুন। তা' উভয়েরই জন্য মঙ্গলজনক। –অনুবাদক)

প্রিয়বর হামযা ও তার আম্মাকে এবং আমার প্রিয় মুহাম্মদ রাবে' মুহাম্মদ ওয়াযেহ্, মাওলানা মুঈনউল্লাহ সাহেব, মওলবী সাঈদুর রহমান সাহেব ও অন্যান্য প্রিয়জনদেরকেও সালাম মসনুন পর আমার ঐ একই বক্তব্য। ইতি। ওয়াস্‌সালাম।

হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেব– ব–কলমে হাবীবুল্লাহ্,
মদীনা তাইয়িবা ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ ইং

রোগের প্রাবল্য ও জীবন–সায়াহ্নের দিনগুলো

মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত হযরত শায়খের সুস্থতা ও অসুস্থতা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী খবরাদি আস্‌তে থাকে–যেমনটা বেশ কয়েক মাস পূর্ব থেকেই আসছিলো। ১৯৮২ সালের মে মাসের প্রথম দিকে এ লেখককে প্রিয়বর সায়্যিদ সালমান নদভীসহ শ্রীলঙ্কার সফরে যেতে হয়। সেখান থেকে ফিরবার এক রাত আগে সম্ভবত ১৪ বা ১৫ই মে তারিখে স্বপ্নে দেখলাম, হযরত শায়খ বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন ঃ আলী মিঞা, তুমি বুঝি আমার এত অসুস্থতার কথা জানতে পাওনি? কই, আমাকে তো দেখতে এলে না? আমি আরয করলাম ঃ হযরত! আমি তো তা' আদৌ জানতে পারিনি। আমি তো এতদিন কোন পত্র পাইনি।

আমি আরো আরয করলাম, আমাদের গোটা পরিবারে এজন্য হৈ চৈ পড়ে গেছে। বিশেষত: মুহাম্মদ ছানীর আম্মা অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছেন। তারপরেই চেয়ে দেখি শায়খ আর সেখানে নেই। আক্ষেপ করতে করতে সেখানে মাথা ঠুক্‌তে লাগলাম এবং আসন্ন বিপদের আশংকায় অধীর হয়ে উঠলাম। দিল্লী এসেই জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত শায়খ কেমন আছেন? কোন তারবার্তা বা খবরাখবর এলো? আমাদের মেজবান হাফিজ কারামত আলী সাহেব বললেন, এই গতকাল ভাই সাদীর

টেলিফোন এসেছে যে, অবস্থা সন্তোষজনক নয়। মাঝে মাঝেই শায়খ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছেন। চিকিৎসকগণও তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগমুক্ত নন। তারপর আমি থাকতে থাকতেই আবার টেলিফোন এলো, এখনো উদ্বেগজনক অবস্থা চল্ছে এবং স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

বজ্রপাততুল্য সংবাদ

১৮ই মে তারিখে আমরা লক্ষ্ণৌ ফিরে আসলাম। ২৫শে মে ১৯৮২ ইং /২রা শা'বান ১৪০২ হিঃ তারিখে দিল্লী থেকে টেলিফোনযোগে এবং মদীনা তাইয়িবা থেকে সেখানে তখন অবস্থানরত মওলভী সাঈদুর রহমানের তারবার্তা মারফত আকস্মিকভাবে বজ্রাঘাততুল্য দুঃসংবাদটি কানে এলো।

ايها النفس اجملى جزعا * ان الذى تحذرين قد رقعا

ওরে অবুঝ মনরে আমার বিলাপ করো সংগোপনে,
ঘটেই গেল সেই অঘটন ভেবেছিলে যাহা মনে।

অন্তিম সময়

শায়খের মৃত্যু সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা হযরত শায়খের একান্তই ভক্ত অনুরক্ত খাদেম ও তাঁর সার্বক্ষণিক চিকিৎসক বন্ধুবর ডাঃ ইসমাঈল সাহেবের পত্র থেকে উদ্ধৃত করে, স্বয়ং তাঁরই ভাষায় লিখে দিচ্ছি–যা' তিনি ঘনিষ্ঠজনদেরকে লিখিত পত্রে লিখেছিলেন। তিনি লিখেন ঃ

হযরত আকদাস (র.)–এর রোগশোক তো বেশ কয়েক বছর ধরেই চল্ছিল। ১২ই মে বুধবারের পূর্ব পর্যন্ত স্বাস্থ্য তুলনামূলকভাবে ভালই ছিল খাওয়া–দাওয়াও করতেন, কথাবার্তাও ঠিকমতো বলতেন। পরামর্শ চাইলে সবসময়ের মতো পরামর্শও দিতেন। মাওলানা আকীল সাহেব মুসলিম শরীফের তাকরীরের যে ইল্মী কাজ করছিলেন, দৈনিক তার ঐদিন লিখিত অংশটি বাদ ইশা হযরতকে যথারীতি শুনাতেন। হযরত তা' অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় পরার্মশও দিতেন। অনেকটা স্বাস্থ্য ভালই ছিল বলা যায়। অবশ্য শরীর খুব দুর্বল ছিল। এ জন্য হেরেম শরীফে কেবল এক ওয়াক্ত নামায পড়তে যেতেন। প্রথম প্রথম যুহরের নামাযে যেতেন। তারপর রৌদ্রের তাপ বৃদ্ধি পেলে কেবল ইশার নামাযে হেরেমের জামাআতে শামিল হতেন।

১২ই মে বুধবার হযরতের শরীরের তাপমাত্রা ১০২" ডিগ্রীতে উঠলো। ওষুধপত্র খাওয়ায় জ্বর তো কমে গেল, কিন্তু দুর্বলতা অনেকগুণ বেড়ে গেলো এবং হেরেম শরীফে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তন্ময়তা বা নির্জীব অবস্থায় পড়ে থাকার ভাবটা অনেক বেড়ে গেল। ১৪ই মে জুমুআয় হেরেম শরীফের জামা-আতে মাদ্রাসা উলূমে শরইয়্যার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে শামিল হন। হেরেম শরীফের জামাআতের সারি ঐ পর্যন্ত চলে যায়। জ্বর হওয়ার পর খাওয়া-দাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। পানীয় গ্রহণ অল্প অল্প তখনো চলছিল। ১৪ই মে শুক্রবার থেকে সকাল-বিকাল দু'বেলা শিরায় গ্লুকোজের ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছিলো। ইন্তিকালের দিন পর্যন্ত তা' অব্যাহত ছিল। ইঞ্জেকশন প্রভৃতি চিকিৎসাও তখন চলছিল।

১৫ই মে শনিবার চোখে ও প্রস্রাবে পাণ্ডুরোগের লক্ষণ ধরা পড়লো। রক্ত পরীক্ষা করিয়ে যকৃত ও মুত্রাশয়ে রোগ পাওয়া গেল এবং উক্ত দু'টি অংগের বৈকল্যও ধরা পড়লো। ১৬ই মের রাত কাটে অর্ধচেতন অবস্থায়। পরদিন ফজর থেকে একেবারেই অচৈতন্য অবস্থা শুরু হয়। রোববার পূর্ণ দিনই পূর্ণ অচেতন অবস্থায় অতিবাহিত হয়। যে পার্শ্বের উপর শোয়ানো হতো সে পার্শ্বের উপরই শায়িত থাকতেন। কোনরূপ সাড়াশব্দ, নড়াচড়া এমনকি একটু কাশিও ছিল না। নাড়ি ও রক্তচাপ দেখে মনে হতো শীগ্গীরই তেমন কোন সংকটের আশঙ্কা নেই। ওষুধপত্র ও নানারূপ তদবির অব্যাহত ছিল। রোববার সন্ধ্যায় বুখারী শরীফের খতম শুরু করানো হলো -যা' রবি সোম দু'দিনে সম্পন্ন হয়! খতম-অন্তে সাহেবজাদা মাওলানা তালহা সাহেব অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় কাতরতাসহ মুনাজাত পরিচালনা করলেন। মক্কা মুকার্রমায় শায়খ মুহাম্মদ উলুভী মালেকীর ওখানেও ইয়াসীন শরীফের খতম পড়া হয়।

১৭ই মে সোমবার অচেতন অবস্থা ছিল বটে, কিন্তু পূর্বদিনের মত নয়। বরং অনেকটা অস্থিরতা ছিল। সকালের দিকে "আল্লাহ্, আল্লাহ্" এবং যুহরের পর থেকে "ইয়া করীম, ইয়া করীম" "ও করীম ও করীম", আবার কখনো কখনো "ইয়া হালীম, ইয়া করীম" উচ্চারণ করছিলেন। "ইয়া করীম" এর এই ধ্বনি শেষ পর্যন্তই মাঝে মাঝে উচ্চারণ করছিলেন। চিকিৎসার ব্যাপারে এ অধীন অন্যান্য ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করছিলাম। পরামর্শদাতা ডাক্তারদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ আশরাফ, ডাঃ আইয়ূব, ডাঃ সুলতান, ডাঃ

মনসূর, ডাঃ আবদুল আহাদ প্রমুখ। রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষায় ডাঃ ইনসিরামুল হক সাহেবের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। যকৃত ও মুত্রাশয়ের দুর্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। রক্ত প্রস্রাব দেখানো ও চিকিৎসা এবং অন্যান্য তদবির যথারীতি চল্‌তে থাকে। খাবার প্রায় বন্ধই ছিল। বোতলের মাধ্যমে গ্লুকোজ পানি ইত্যাদি শিরায় দেওয়া হচ্ছিল। ২১ শে মে জুমুআর নামায হেরেমের জামাআতে মাদ্রাসা উলূমে শরইয়্যার সদর দরজায় আদায় করেন।

২৩ শে মে রোববার পর্যন্ত বাহ্যত স্বাস্থ্য কিছুটা ভালই ছিল। ঐদিন যুহরের পর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। কালবিলম্ব না করেই তাৎক্ষণিকভাবে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। মাগরিবের আধ ঘন্টা পূর্বে আমি যখন ফার্মেসীতে কর্মরত ছিলাম, এমন সময় হযরতের খাদেম মওলভী নজীব উল্লাহ্‌ টেলিফোনে হযরতের শরীর খুবই খারাপ বলে জানালে সাথে সাথেই আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম। লক্ষ্য করলাম শ্বাসকষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। আমি পরীক্ষা করে ইঞ্জেকশন দিতেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্বাসকষ্ট কমে গেল এবং শ্বাস–প্রশ্বাস স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এলো। ইশার পর আমার ঘরে যাওয়া পর্যন্ত অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। ২৪ শে মে ফজরের সময় ও অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। হযরত কিছু কিছু কথাও বলছিলেন। অবশ্য দুশ্চিন্তার একটা কারণ ছিল, গতকাল যুহরের পর থেকে একবারও প্রস্রাব হয় নাই। সকাল আটটায় পুনরায় শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। তার জন্য এবং প্রস্রাবের জন্য ব্যবস্থা দেয়া হলো। ফলে যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে প্রস্রাব তো হলো, কিন্তু শ্বাসকষ্টের জন্য ইঞ্জেকশন ও অক্সিজেন দেওয়া সত্ত্বেও দুপুর বারটা পর্যন্ত অস্থিরতা থাকে। কখনো বলছিলেন, বসাও, কখনো বলছিলেন, শোয়াও। আবার কখনো বলছিলেন, ওষুধ আন। সময় সময় সশব্দে 'ইয়া করীম" "ও করীম" বলে আর্তনাদ করছিলেন। আমি অধম যেহেতু সর্বক্ষণ পাশে বসা ছিলাম, মাঝে মাঝে আমার হাত ধরে জোরে চাপ দিচ্ছিলেন। এগারটার দিকে যখন আলহাজ্জ আবুল হাসান বালিশ উঁচু করলেন, তখন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "ডাক্তার সাহেব আছেন?" আবুল হাসান বললেন ঃ 'জী হাঁ, এই তো ডাক্তার ইসমাঈল।" এ কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। এই ছিল তাঁর জীবনের অন্তিম আলাপ। তারপর যুহর পর্যন্ত কেবল "ইয়া করীম" "ও করীম" বলছিলেন। যুহরের পর সেই যে চুপ হলেন, শেষ পর্যন্ত এ

অবস্থাই চলতে থাকে। আমি অধীন বার বার নাড়ির স্পন্দন ও রক্তচাপ প্রভৃতি দেখছিলাম। ইন্তিকালের সামান্য পূর্বে সাহেবজাদা মাওলানা তাল্হা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটাই কি অন্তিম সময়? আমি মাথা নেড়ে ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি উচ্চস্বরে "আল্লাহ্, আল্লাহ্" বলতে শুরু করলেন। এ সময় হযরত দু'বার জোরে-জোরে শ্বাস টেনে চির জীবনের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। চক্ষুদ্বয় আপনা আপনি বন্ধ হয়ে এলো আর আত্মা চিরশান্তির ধামে প্রস্থান করলো। তখন ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা চল্লিশ মিনিট অর্থাৎ মগরিবের তখন ঠিক দেড় ঘন্টা বাকী ছিল।

انا لله و انا اليه راجعون ـ اللهم اجرنا فى مصيبتنا و عوضنا خيرا منها
و انا بفراقك يا شيخ لمحزونون

যে মহাত্মার গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে সুন্নতেরই পায়রবী করে, প্রাকৃতিকভাবে তাঁর ইন্তিকালও নির্ধারিত হলো মহানবীর মহান সুন্নতের অনুসরণে সোমবার আসর ও মগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।

ঐ সময়ে উপস্থিত আত্মীয় স্বজন ও ভক্ত-খাদেমদের অবস্থা কী ছিল, তা' ভাষায় বর্ণনাতীত। তখন পাশে ছিলেন সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদ তাল্হা সাহেব, মাওলানা আমীন সাহেব, তাঁর পুত্র জা'ফর আলহাজ্জ আবুল হাসান, মওলবী নজীব উল্লাহ্, সূফী ইকবাল, মাওলানা ইউসুফ মাতালা, হাকীম আবদুল কুদ্দুস, মওলবী ইসমাঈল, মওলবী নযীর, ডাঃ আইয়ূব, হাজী দিলদার আস'আদ, আবদুল কাদির ও এই অধম (ডাঃ ইসমাঈল)। কালবিলম্ব না করেই দাফন-কাফনের ইন্তেযাম শুরু হলো। ডাঃ আইয়ূবকে হাসপাতালের সার্টিফিকেট আনবার জন্য তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সাহেবজাদা মুহাম্মদ তালহা সাহেব, মাওলানা আকীল সাহেব ও অন্যান্য ভক্ত ও খাদেমদের মধ্যে তখন এ নিয়ে পরামর্শ হচ্ছিল যে, দাফন ইশার পরে হবে নাকি ফজরের পরে? কেননা, কোন কোন ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের মক্কা শরীফ থেকে আসার ছিল। তাঁদের আসার সময়টা যেহেতু জানা ছিল, তাই ইশা পর্যন্ত তাঁদের পৌছে যাওয়াটা অনেকটা নিশ্চিত ছিল। তাই ফজরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত না করে ইশার সময়ই জানাযা হওয়াই স্থিরীকৃত হলো। এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেয়াও হলো। কিন্তু চিরদিন এ আফসোস থেকেই যাবে যে, যে প্রিয়জনদের জন্য

অধীরভাবে অপেক্ষা করা হয়েছিল, পথে গাড়ী বিকল হয়ে যাওয়ায় সময়মত তাঁরা এসে পৌছতে পারেন নি, আর যেহেতু ইশার সময়ের কথা এলান করা হয়ে গিয়েছিল, তাই ঐ সময় আর পরিবর্তন করাও ছিল অসম্ভব ব্যাপার। সর্বত্র টেলিফোনে খবর দিয়ে দেয়া হলো। মগরিবের পর লাশ গোসল দেয়া হলো। এ ব্যাপারে তদারক করলেন মাওলানা আকীল সাহেব ও মাওলানা ইউসুফ মাতালা সাহেব। গোসল প্রদানের সময় ভক্ত খাদেমদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই এ পুণ্য কাজে অংশ গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। উপস্থিত ভক্তও ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন মাওলানা ইউসুফ মাতালা, আলহাজ আবুল হাসান, মওলভী নজীব উল্লাহ্, হাকীম আবদুল কুদ্দুস, প্রিয়বর জা'ফর, মাওলানা শাহ্ আতাউল্লাহ্ বুখারী–তনয় শাহ্ আতাউল মুহায়মেন, সূফী আসলাম, মওলবী সিদ্দীক, মওলবী ইহ্সান, কাযী আবরার, আবদুল মজীদ প্রমুখ।

ডাঃ মুহাম্মদ আইয়ুব সেই যে হাসপাতালের ছাড়পত্রের জন্য গিয়েছিলেন, পূর্ণ দু'ঘন্টা পর ফিরে এসে জানালেন যে, হাসাপাতালের ছাড়পত্র নেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা আইনের জটিলতা আছে। এজন্য সাহেবজাদা তাল্হা সাহেবকেই যেতে হবে। তাই মাওলানা তাল্হা সাহেবকেও সাথে যেতে হলো। কবরস্থানের লোকজনের কবর খুঁড়বার জন্যে বললে তাঁরা জানালো যে, হাসপাতালের ছাড়পত্র ছাড়া কবর খুঁড়তে পারবে না। এ সময় ইশার মাত্র পৌনে এক ঘন্টা বাকী ছিল। দ্বিতীয়বার উপরোক্ত পরামর্শকারিগণ পরামর্শ করলেন যে, এত কম সময়ের মধ্যে যেহেতু কবর খুঁড়ে তৈরী করা নামায কঠিন হবে, সুতরাং ফজরে জানাযার নামায পড়াই উত্তম হবে। এর একটু পরেই সায়্যিদ হাবীব সাহেব আসলেন। তিনি বললেন, আমি নিজে গিয়ে কবরের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে এসেছি। কবর খনন শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রায় বিশ মিনিট পর হাসপাতালের ছাড়পত্রও এসে গেল এবং কবর প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে বলেও খবর এলো। এছাড়া কবরস্থানওয়ালারা তাদের বিশেষ মুর্দা বহনের খাট নিয়ে হাযিরও হয়ে গেল অর্থাৎ ইশার পনের মিনিট পূর্বেই জানাযার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেল। সুতরাং পূর্বতন পরামর্শ অনুযায়ী জানাযার খাট (শবদেহ) 'বাবুস সালাম' নামক তোরণ দিয়ে হেরেম শরীফে নীত হলো। ইশার ফরযের পর পরই এখানকার প্রথা অনুযায়ী হেরেম শরীফের

ইমাম শায়খ আবদুল্লাহ্ যাহিম জানাযার নামাযে ইমামতি করলেন। নামাযান্তে বাবে-জিব্রীল দিয়ে বের হয়ে জান্নাতুল বাকীতে লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। শবযাত্রায় লোকের প্রচুর ভিড় ছিল। এমন ভিড় অন্য কারো জানাযায় দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। কবর হযরতের বাসনা অনুসারে আহ্‌লে বায়তের সীমানায় এবং হযরত সাহারানপুরী সাহেবের কবরের পাশেই দেওয়া হয়। সাহেবজাদা মাওলানা তাল্‌হা ও আলহাজ্জ আবুল হাসান কবরে নামেন এবং তা বন্ধ করেন। এভাবে হযরতের সুদীর্ঘকালের বাসনা পূর্ণ হলো।

একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম, ইন্তিকালের একদিন পূর্বে হযরত এক এক করে প্রত্যেককে কে কি করছেন, জানতে চান। সূফী ইকবাল সাহেব, আলহাজ্জ আবুল হাসানকে ও আমাকে নিজেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন। সাহেবজাদা মাওলানা তালহা পাশে অন্য কামরায় ছিলেন। তাঁর কাছে খাদেমকে এই বলে পাঠালেন যে, হযরত জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি এখন কোন কাজে আছেন? সকলেই কিছু না কিছু পড়ার, যিকির করার বা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত প্রভৃতির কথা বললেন। শুনে তিনি চুপ করে রইলেন। এ অধমকে যখন প্রশ্ন করলেন, তখন আলহাজ্জ আবুল হাসান আমার জবাব দেবার আগেই বললেন, ইনি তো এখন ফার্মেসীতে গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করবেন! শুনে হযরত বললেন, এও একটা কাজ হলো নাকি? এতে বুঝা গেল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত তাঁর সংশ্লিষ্ট লোকদের ব্যাপারে তাদের আমলের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন।

দাফন-কাফনের পর হযরতের জনৈক খলীফা দেখলেন, কে যেন বলছেন ঃ

فتحت له ابواب الجنة الثمانية

'তাঁর জন্য জান্নাতের আট দরজাই খুলে দেয়া হয়েছে।"

অপর একজন পরদিন হুযূর পাক (সা.)-এর রওযা মুবারকে যিয়ারত করতে গিয়ে অনুভব করলেন, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেন বলছেন ঃ তোমাদের শায়খকে ইল্লীনের সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দেয়া হয়েছে। এমন মানুষ লাখ-লাখ, কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে দু'এক জনই হয়ে থাকে।

হুলিয়া

শায়খ অত্যন্ত সৌম্যদর্শন পুরুষ ছিলেন। সৌন্দর্যের সাথে সাথে আল্লাহ্ তাঁকে

দান করেছিলেন চেহারার গাম্ভীর্য। গৌরবর্ণ মিশ্রিত সাদা ছিল তাঁর দেহের রঙ। চেহারা গোলাপের মত প্রস্ফুটমান। দেহ কোমল ও অনেকটা মাংসল। আকৃতি মধ্যম। যখন আরবী মুসাল্লাজ পরতেন ও মাথায় আমামা বাঁধতেন, তখন হাজার-হাজার লোকের মধ্যে তাঁকে অনন্য মনে হতো। আমার স্মরণ আছে, মেওয়াতের এক জলসায় (যতদূর মনে পড়ে মালিব-এর জলসায়) ডক্টর যাকির হোসেন খান মরহুম (ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি) তাঁকে প্রথমবারের মতো দেখে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ "শায়খ বড় শানদার আদমী দেখছি।" শেষ বয়সে রোগশোকের দরুন দেহের স্থূলতা হ্রাস পায়। এতদসত্ত্বেও চেহারার ঔজ্জ্বল্য কমেনি। হৃদয় ও মস্তিষ্ক সর্বদাই সজাগ ও প্রাণবন্ত ছিল।

উত্তরাধিকারী ও সন্তানসন্ততি

মৃত্যুকালে হযরত শায়খুল হাদীছ তাঁর সহধর্মিণী, এক পুত্র মওলভী তাল্‌হা সাহেব এবং পাঁচ কন্যা রেখে যান। তাঁদের বিশদ বর্ণনা নীচে দেয়া হলো ঃ[১]

১. হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবের সহধর্মিণী-১৩৩৮ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৯২০ইং) তাঁর জন্ম হয়। হযরত তখন হযরত সাহারানপুরী (রহ) -এর সাথে জীবনের প্রথমবারে মতো হিজায সফরে ছিলেন। ৩রা মুহার্‌রম, ১৩৫৪ হিঃ (৭ই এপ্রিল, ১৯৩৫ইং) তারিখে তাঁর বিবাহ হয়। মওলবী মুহম্মদ যুবায়র তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

২. হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সহধর্মিণী--১৩৪৭ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয়। ২১ জমাঃউলা, ১৩৬৫ হিঃ (২২শে এপ্রিল, ১৯৪৬ইং) তারিখে তাঁর বিবাহ হয়ে মওলভী সাইদুর রহমান ইব্‌ন মাওলানা লুৎফুর রহমান কান্দেলবীর সাথে। ১৯শে শাওয়াল ১৩৬৬ হিঃ তারিখে মওলভী সাইদুর রহমানের ইন্তিকাল হয়ে যায়। ১৯ রবিউছ ছানী ১৩৬৯ হিজরী (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ইং) তারিখে রোজ বুধবার তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর কোন সন্তান হয়নি।

৩. মাওলানা আল্‌হাজ্জ হাকীম মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব ইব্‌ন মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আইয়ূব সাহেব)-এর সহধর্মিণী-৯ই যিলকাদ ১৩৫২ হিঃ (১৯শে মার্চ ১৯৩৪ ইং) তারিখে এঁর জন্ম হয়। ১৯ শে রবিউছ ছানী ১৩৬৯ হিঃ বুধবার তাঁর বিবাহ হযরত মদনী (রহ) মোহরে ফাতেমী মোহর নির্ধারণ করে পড়ান। মওলবী

মুহাম্মদ শাহেদ, হাফিজ মুহম্মদ রাশেদ, হাফিজ মুহম্মদ সুহায়ল ও মুহম্মদ সাজিদ তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

৪. মওলভী মুহাম্মদ তালহা সাহেব–ইনি হযরতের দ্বিতীয় সহধর্মিণীর গর্ভজাত দ্বিতীয় সন্তান। ২রা জমাঃউলা ১৩৬০ হিঃ (২৮ শে মে, ১৯৪৭ ইং) শনিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে কুরআনে পাক হিফয করেন ১৬ই রজব, ১৩৭৫ হিঃ তারিখে হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদির রায়পুরী সাহেবের মজলিসে তাঁর খতম সম্পন্ন হয়।

২রা জমাঃউলা ১৩৭৬ হিঃ (৫ই ডিসেম্বর ১৯৫২ ইং) তারিখে সাহারানপুরে ফার্সী শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। ১৩৭৬ হিজরীর ১লা শা'বান তারিখে ফার্সী শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর আরবী শিক্ষা শুরু করার জন্য নিযামুদ্দীন (দিল্লীতে) যান। সেখানে বিভিন্ন উস্তাদের কাছে আরবী শিক্ষা করে ১৩৮১ হিজরীতে সাহারানপুর ফিরে আসেন এবং জামেয়া মাযাহিরুল–উলূমে ভর্তি হয়ে 'শরহে জামী', 'হিদায়া আউয়ালায়ন,' 'মকামাতে হারীরী' প্রভৃতি পড়েন। হাদীছ পড়েন মাদ্রাসায়ে কাশেফুল উলূমে ১৩৮৩ হিজরীতে। বুখারী তিনি হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবের কাছে, তাহাবী হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের নিকট, তিরমিযী ও মুসলিম শরীফ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সাহেবের নিকট এবং আবূ দাউদ শরীফ মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেবের নিকট পড়েন।

দ্বীনী শিক্ষা অর্জন সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত রায়পুরী সাহেবের হাতে বায়আত হন এবং তারপর তাঁর সর্বজন শ্রদ্ধেয় আব্বার পৃষ্ঠপোষকতায় কায়মনোবাক্যে যিকির ও শোগলে লিপ্ত হন। ১৩৯১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত তাঁকে ইজাযতে–বায়আত বা খিলাফত দান করেন। হযরতের ইন্তিকালের পর শাওয়াল ১৪০২ হিজরীতে মাযাহিরুল উলূমের পৃষ্ঠপোষকরূপে হযরতের স্থলাভিষিক্ত হন।

৫. মাওলানা মুহাম্মদ আকীল সাহেবের সহধর্মিণী–এঁর স্বামী মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আইয়ূব সাহেবের পুত্র। হযরতের এ কন্যাটি হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয় সহধর্মিণীর গর্ভজাত প্রথমা কন্যা। ৬ই রমযান ১৩৬৬ হিঃ (২৫শে জুলাই ১৯৫৪ ইং) তারিখে এর জন্ম হয়। ৮ রবিউছ ছানী, ১৩৮১ হিঃ (১৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ ইং তারিখে এর বিবাহ হয়। হযরত রায়পুরী (রহ) বিবাহে থাকবেন এই উদ্দেশ্যে বিবাহটি হয় রায়পুরে। মোহ্রে ফাতেমী মোহর ধার্য করে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব বিবাহ

পড়ান। হাফিয মুহাম্মদ জা'ফর, হাফিয মুহাম্মদ উমায়ের, মুহাম্মদ আদিল, মুহাম্মদ আসিম এঁরই গর্ভজাত সন্তান।

৬. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান (ইব্‌ন মাওলানা মুফতী ইয়াহ্ইয়া) সাহেবের সহধর্মিণী–২৯শে সফর ১৩৭০ হিজরীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ২১ শে যিলকাদ ১৩৮৬ হিঃ (১৩ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ ইং) তারিখে মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব মোহরে ফাতেমীর মোহর নির্ধারণ করে বিবাহ্ পড়ান। হাফিয মুহাম্মদ উছমান, হাফিয মুহাম্মদ নু'মান তাঁরই সন্তান।

হযরত (রহ)–এর জামাতাগণ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব, হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব, মাওলানা হাকীম ইলিয়াস সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ আকীল সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব, প্রত্যেকেই এক একজন জাঁদরেল আলেম, কৃতী মুদাররিস ও শিক্ষক এবং গ্রন্থ প্রণেতা। প্রথমোক্ত দু'জন সম্পর্কে কিছু লিখার প্রয়োজন নেই। এজন্যে যে, প্রথমোক্ত জন হযরত মাওলানা ইউসুফ তাঁর নিজ আল্লাহ্প্রদত্ত কামালাত দ্বারা গোটা বিশ্বে সুপরিচিত। তাঁর সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র সুবিশাল গ্রন্থই 'সাওয়ানিহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্দেলবী (মাওলভী সাইয়িদ মুহাম্মদ ছানী হাসনী মরহুম–কর্তৃক রচিত) রয়েছে। দ্বিতীয়োক্ত মাওলানা ইনামুল হাসান (আল্লাহ্ তাঁর আয়ূ–বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর সাধ্য সাধনায় বরকত দান করুন!) বিশ্বজোড়া তবলীগী আন্দোলনের আমীর ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে কর্মরত রয়েছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব মাযাহিরুল উলূমের পাশ করা বিশিষ্ট আলেম। ১৩৭১ হিজরীর শা'বান মাসে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হয়। বুখারী শরীফ ইনি হযরত শায়খের কাছে পড়েন। ইনি একটি ইল্‌মী ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান "কুতুবখানা ইশা'আতুল উলূম "নামে প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক ধর্মীয় পুস্তকের ইনি প্রকাশক। হযরত শায়খের অনেক দুর্লভ রচনা তাঁরই হাতে প্রকাশিত হয়, হযরত শায়খের বিখ্যাত রচনা لامع الدراری (লামেউদ দেরারী), اوجز المسالك (আওজাযুল মাসালিক) الكوكب الدری (আলকাওকাবুদ দুরী) প্রভৃতির প্রথম সংস্করণ তাঁরই মাধ্যমে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

অপর জামাতা মাওলানা মুহাম্মদ আকীল সাহেব ১৩৮০ হিজরীতে মাযাহিরুল উলূম থেকে পাশ করে বের হন। বুখারী শরীফ হযরত শায়খের কাছে পড়েন। অত্যন্ত মেধাবী, কৃতী ও উঁচু দরের আলেম তিনি। ১৩৮১ হিজরীতে মাযাহিরুল

উলূমের উস্তাদ নির্বাচিত হন। ১৩৮৭ হিজরীতে দাওরায়ে হাদীছের উস্তাদ হয়ে প্রথমবার আবূ দাউদ শরীফ পড়ান। সেই থেকে আবূ দাউদের অধ্যাপনা তাঁরই উপর ন্যস্ত রয়েছে। শায়খের পক্ষ থেকে ইজাযতে বায়আত বা খিলাফতও ইনি লাভ করেন। শায়খের কিতাবাদি রচনার কাজে তিনি সহকারীরূপেও কাজ করেছেন। "আল কাওকাবুদ্ দুররী আলা জামি'ইৎ তিরমিযী" কিতাবের শুরুতে তাঁর একটি দীর্ঘ ভূমিকা রয়েছে–যা' ১৩৯৪ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব ১৩৮৬ হিজরীতে দাওরায়ে হাদীছ পড়েন। দরসে বুখারীতে হযরতের ক্লাসে সাধারণত ইনিই হাদীছের মতন (Text) পড়তেন। ১৩৮৭ হিজরীর শাওয়াল মাস থেকে এঁর শিক্ষক জীবনের সূচনা হয়। ১৩৯৬ হিজরীতে হাদীছের উস্তাদতালিকায় তাঁর নামও যুক্ত হয়। মিশকাত শরীফের দরস তাঁরই উপর ন্যস্ত রয়েছে। শায়খের লিখিত আরবী কিতাবাদির বিন্যস্ত করার কাজে মাওলানা মুহাম্মদ আকীল ও মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব সহকর্মীরূপে কাজ করেন। রমযানে শায়খের ই'তিকাফের সমাবেশসমূহে কুরআন শরীফ শুনানো তথা তারাবীহ্র ইমামতীর দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুভাবেও কৃতিত্বের সাথে ইনিই পালন করতেন।

হযরতের বয়ঃপ্রাপ্ত দৌহিত্রদের সকলেই মাদ্রাসার শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেছেন। এঁদের সকলেই মাশাআল্লাহ্ আলিম–ফাযিল এবং এঁরা সকলেই ইলমী খেদমত ও জ্ঞানচর্চায় মশগুল রয়েছেন। এঁদের মধ্যে হযরতের দৌহিত্র ও মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের পুত্র মাওলানা মুহম্মদ শাহেদ সাহেব মাযাহেরী উল্লেখযোগ্য। ইনি জাঁদরেল আলিম, তেজ–কলম তরুণ লেখক এবং গবেষণা কর্মে ইনি উৎসাহী। "মকতুবাতে ইল্মিয়া," "উলামায়ে মাযাহিরুল উলূম আওর উন কি ই'লমী ও তাসনীফী খেদমাত", "তারীখে মাযাহিরুল উলূম জিল্দে দুওম) প্রভৃতি তাঁরই তাসনীফী খেদমতের উজ্জ্বল নমুনা। হযরত শায়খ তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাঁরই চেষ্টায় হযরত শায়খের বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ও পত্রাবলীসংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

হযরতের অপর দৌহিত্র মওলভী মুহাম্মদ যুবায়র সাহেব (ইব্ন মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব)–ও মাযাহিরুল উলূম থেকে পাশ করেন। লেখাপড়া শেষে হযরত শায়খের তত্ত্বাবধানে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় শায়খ তাঁকে খিলাফতও দান করেন। তিনি তাঁর মহিমান্বিত পিতার তত্ত্বাবধানে

নিযামুদ্দীনস্থ তাবলীগের মরকযে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে এবং সেখানকার কাশিফুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়ু বৃদ্ধি করুন।

অন্যান্য দৌহিত্ররা এখনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং তাঁরা সকলেই হিফযে কুরআন সম্পন্ন করে দ্বীনী ইল্ম অর্জনে ব্যাপৃত রয়েছেন। এঁদের মধ্যে হাফিয মুহাম্মদ জা'ফর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত শায়খের অন্তিম হিজায সফরের সময় ইনিও হযরতের সঙ্গে ছিলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারার অন্তিম দিনসমূহে ইনি হযরতের খেদমতে সর্বক্ষণ হাযির ছিলেন। بارك الله فى حياتهم আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে দীর্ঘায়ু করুন ।

হযরতের জীবদ্দশায় তাঁর যে সব সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তাঁর পরকালের সঞ্চয় হয়ে রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. সাহেবজাদী যাকিয়া মরহুমা–৪ঠা শা'বান ১৩৩৭ হিঃ (৫ই মে, ১৯১৫ ইং) সোমবার রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন হযরতের সর্বপ্রথম সন্তান। ৩রা মুহার্‌রম ১৩৫৪ হিঃ (৭ই এপ্রিল ১৯৩৫ ইং) তারিখে মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় সময় তাঁর বিবাহ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সাথে দেওয়া হয়। ১২ই রবিউল আউয়াল, ১৩৫৫ হিঃ (৩রা জুন, ১৯৩৯ ইং) তারিখে বাদ আসর রুখসতী হয়। দীর্ঘকাল যক্ষায় ভুগে ২৯শে শাওয়াল ১৩৬৬ হিঃ (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ ইং) সোমবার মাগরিবের নামায আদায়কালে সিজদার অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। মাওলানা হারূন মরহুম এঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২. মুহাম্মদ মূসা–১৩৪৩ হিজরীর রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করে ৭/৮ মাস মাত্র বেঁচে ৯ই রবিঃছানী '৪৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৩. সাহেবজাদী শাকেরা মরহুমা–ইনি ছিলেন হযরতের তৃতীয়া কন্যা। '৪৫ হিজরীর সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯শে জমাঃ আউয়াল ৬৫ হিজরী (২২শে এপ্রিল, ৪৬ ইং) সোমবার স্ববংশীয় মওলভী আহ্মদ হুসায়ন কান্দেলবীর সাথে বিবাহ হয়। হযরত মদনী (রহ) মোহ্‌রে –ফাতেমী মোহর ধার্য করে বিবাহ পড়ান। '৬৯ হিজরীর ১৪ই রজব (১লা মে, ১৯৬০ ইং) সোমবার ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সময়কার অবস্থা হযরত শায়খ লিখেছেন এভাবে ঃ

"ঘটনাচক্রে মাওলানা ইউসুফ সাহেব সেবার সাহারানপুরে এসেছিলেন। আমিও তাঁর সাথে ঘরে গেলে মরহুমা তাঁকে ইয়াসীন শরীফ পাঠের ফরমাশ করলেন।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব সে অনুসারে ইয়াসীন পড়তে শুরু করলেন। তিনি যখন سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন কী এক অজ্ঞাত কারণে তিনি উক্ত আয়াত অত্যন্ত জোশের সাথে তিনবার পড়লেন। তৃতীয়বারের মধ্যেই আমার মরহুমা কন্যার রূহ প্রস্থান করলো।"

৪. মুহাম্মদ হারূন–১৩৪৯ হিজরীর রজব মাসে জন্মগ্রহণ করে স্বল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫. খালেদা মরহুমা–২৮শে জিলহজ ১৩৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে শৈশবেই মারা যান।

৬. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া–৬ জমাঃছানী '৫৬ হিজরীতে জন্ম ও শৈশবেই ইন্তিকাল হয়।

৭. সফিয়্যা–প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত শেষ সন্তান। জন্ম ১৩৫৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে এবং ইন্তিকাল এক বছর পর ২১শে মুহার্‌রম, ৫৬ হিজরীতে হয়।

৮. আবদুল হাই–দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত প্রথম পুত্র। ১৮ই রবিউস ছানী, ১৩৫৮ হিজরীতে জন্ম হয় এক মাসের মত বেঁচে ২৮শে জমাঃউলা তারিখে মারা যান। পরম ব্যস্ততার জন্য হযরত এঁর জন্ম বা মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দিল্লীতে যেতে পারেননি।

হযরতের একমাত্র সহোদরার নাম ছিল 'আইশা খাতুন। ৯ই সফর ১৩৩৭ হিঃ (১৪ই নভেম্বর, ১৯১৮ ইং) তারিখে জনাব মামুন শুয়াইবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। ১৬ই জিলহজ ৬১ হিঃ (২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ ইং) তারিখে কান্দেলায় তাঁর ইন্তিকাল হয়। মৃত্যুকালে বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। তাঁর গর্ভজাত একমাত্র কন্যাটি হচ্ছেন মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের সহধর্মিণী। (অর্থাৎ মাওলানা মুহাম্মদ সালামান ও মওলভী মুহাম্মদ খালেদের মা)

মওলভী মুহাম্মদ তালহা

প্রিয়বর ও মান্যবর সাহেবজাদা মওলভী মুহাম্মদ তালহা শায়খের জীবদ্দশায়ই হাফিয, আলিম, যাকির, শাগিল ও সাহেবে–ইজাযত (মানে আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণতা ও খিলাফতপ্রাপ্ত) হয়ে যান। জীবনের প্রারম্ভেই হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদির রায়পুরী সাহেবের নেকনযরে ছিলেন। কোন কোন সময় এমনও দেখা গেছে যে, তাঁর খাতিরেই হযরত তাঁর সফরের প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছেন এবং

বলেছেন ঃ "তাল্হা আমাকে যেতে দিল না।" এমনিতেই সাধারণভাবে শায়খের কাছে যাতায়াতকারী আলিম-উলামা ও পুণ্যবান লোকদের তাঁর প্রতি বিশেষ নেকনযর ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমনি ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা, ভারসাম্য, বিনয়, সেবা পরায়ণতা ও সুষ্ঠু বিবেকবুদ্ধি দান করেছিলেন, যা' তাঁর পৈত্রিক উত্তরাধিকারও বটে। হযরত শায়খের সাহারানপুরে রমযান অতিবাহিত করবার উদ্যোগ শেষ দিকে প্রধানতঃ তাঁরই পক্ষ থেকে হতো। শায়খের ভক্ত-অনুরক্ত ও প্রিয়জনদের তিনিই সবচাইতে বেশী চিনতেন এবং তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের সাথে আচরণ করতেন। হযরত নিজে তাঁর তরবিয়ত বা চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন এবং সাহেবজাদা হওয়ার অহমিকায় যেন তিনি আক্রান্ত হন, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। এজন্য তাঁর সফরে যাওয়া বা শায়খের মুরীদানের মধ্যে যাতায়াত করা তিনি আদৌ পসন্দ করতেন না। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করে চল্তেন। শায়খের জীবনের অন্তিম দিনগুলাতে মদীনা বাসের সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর আম্মাজানসহ হযরত শায়খের কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং তাঁর খেদমত করার পূর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করেন। শায়খের ওফাতের পর তাঁর ধৈর্যস্থৈর্য ও গম্ভীরতার সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলার প্রশংসনীয় অবস্থা অন্যদের ধৈর্যধারণ ও সান্ত্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি করতেন হযরত শায়খ তাঁর আপন জীবদ্দশায়।

اطال الله حياته و نفع به المسلمين

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়ু দীর্ঘ করুন এবং মুসলিম জাতিকে তাঁর দ্বারা উপকৃত করুন!

টীকা ঃ

১. হযরত শায়খের উত্তরাধিকারীবর্গ এবং তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণকারী সন্তানদের বিশদ বর্ণনা এ লেখকের অনুরোধে হযরতেরই দৌহিত্র মাওলানা মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব লিখে দেন। ঈষৎ পরিবর্তন করে হুবহু তা-ই তুলে দেয়া হলো।

নবম অধ্যায়

আল্লাহ্প্রদত্ত কামালাত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী

আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে মাহাত্ম্য দান ও মর্যাদার উচ্চাসনে আসীন করেন, এমন কোন বুযুর্গ ব্যক্তির কামালাত ও বৈশিষ্ট্যাবলী লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, বরং প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, রূহানী কামালাত ও বাতেনী হালতসমূহ এবং আব্দ ও মা'বূদ তথা বান্দা ও আল্লাহ্র মুয়ামেলাত-এর সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই জানা থাকে না।

کراما کاتبین را هم خبر نیست

— "কেরামান কাতেবীনও জানে না সে
গোপন খবর।"

কিন্তু যে সমস্ত দিক দিবালোকের মত উজ্জ্বল এবং অল্পদর্শী লোকরাও যা' সহজেই দেখতে পায়, সেগুলির আলোচনায় অসুবিধা কোথায়? অতি সংক্ষেপে সে সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করছি।

উচ্চতর ধী-শক্তি

শায়খের যে গুণ তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত করেছে তা' হচ্ছে তাঁর উচ্চতর ধী-শক্তি ও অনন্যসাধারণ মেধা। বড় বড় জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাঁর সে উচ্চতর ধী-শক্তির প্রশংসা করতেন। হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী রহমতুল্লাহি আলায়হি কয়েকবারই হযরত শায়খ ও মাওলানা ইউসুফ সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "আমাদের যেখানে গিয়ে শেষ, তোমাদের যাত্রা শুরুই হয় সেখান থেকে।" কখনও কখনও বলতেন, "এই চাচা-ভাতিজার (মাওলানা ইলিয়াস ও হযরত শায়খের) কথাই আলাদা।" একদা তিনি বলেন ঃ "হযরত গাঙ্গুহীর 'নিসবত' শায়খুল হাদীছের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে।" হযরত ইলিয়াস (র.) শায়খের সাথে তাঁর একজন প্রিয়জন ও আপন সন্তানের মতো

আচরণ যতটুকু না করতেন, তার চাইতে বেশী তাঁকে তিনি মানতেন একজন শায়খ ও বুযুর্গ হিসাবে। তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরই স্বহস্থ লিখিত পত্র পাঠে–যা সৌভাগ্যক্রমে এ দীন লেখকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, চিঠিপত্র সাধারণতঃ তিনি অন্যেদের দিয়ে লেখাতে অভ্যস্ত হলেও এ পত্রখানি নিজের হাতেই তিনি লিখেছিলেন। চিঠিখানি হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করছি ঃ

"আস্‌সালামু আলায়কুম ও রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

আমার প্রতি আপনার সুধারণাকে আমি নিজের জন্য সৌভাগ্য এবং আল্লাহ্‌র দরবারে একটা বড় আশার ব্যাপার বলে মনে করি। আল্লাহ্ আপনাকে সুখী রাখুন এবং আমার প্রতি আপনাকে প্রসন্ন রাখুন এবং একনিষ্ঠভাবে ও প্রশান্ত হৃদয়ে 'নিসবতে–মুহাম্মদীয়া" নসীব করুন! আল্লাহুম্মা আমীন!

মন চাইছিল যে, রমযানুল মুবারক আপনার মধুর সান্নিধ্যে কাটুক। কিন্তু মনের যে একাগ্রতা তোমার কাম্য, তা ব্যতিক্রম করা চাই না। আপনার মত উঁচু পর্যায়ের ধী–শক্তি সম্পন্নদের পরিবার–পরিজন কর্তৃক বিঘ্নিত বাধাগ্রস্ত হওয়াটা মন মেনে নিতে নারাজ। কিন্তু আল্লাহ্ চাহেতো উত্তম সেটাই হবে–যে দিকে মনের গতি হয়। বাহ্যিক কার্য কারণ যাই হোক্ না কেন।

রমযানুল মুবারকে বান্দাও দু'আপ্রার্থী। ভুলবেন না কিন্তু। এ বান্দার জন্য আপনার অস্তিত্ব উভয় জাহানের পুঁজি স্বরূপ। তা' হলে দু'আটা তো মন প্রাণ থেকে আশা চাই। কিন্তু আফসোস্, মনপ্রাণ কোন্ অজানার দেশে কিছুই জানি না। হে আল্লাহ্! তুমি রহম কর! হে আল্লাহ্ তুমি দয়া কর! ঘরের সবাইকে দু'আ রইলো।

প্রিয়বর হাকীম আউয়ুবকে সালাম বলে বলে দেবেন যেন হিম্মত রাখেন, গাফলতি না করেন। আপনার রমযানের দৈনন্দিন কর্মসূচী লিখে জানাবেন। ইতি ওয়াস্‌সালাম। –বান্দা মুহাম্মদ ইলিয়াস

১৪ই ফেব্রুঃ' ১৯২৯ ইং

(ডাকখানার শীল মোহরের তারিখ)

উচ্চ সাহস ও উচ্চাকাঙক্ষা হচ্ছে সেই কেন্দ্রবিন্দু যাকে কেন্দ্র করে হযরত শায়খের গোটা জীবন আবর্তিত হয়েছে। তাঁর চরিত্রের এ মৌলিক গুণের বহিঃপ্রকাশ ও বিকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁর গ্রন্থাদি রচনায়, ইবাদত–বন্দেগীতে

সেবা ও অতিথিপরায়ণতায়, সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ততা ও আল্লাহ্-নির্ভরতায়, তথা তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ধনৈশ্বর্যকে তিনি কোনদিনই গুরুত্ব দেন নি। উচ্চবেতনের চাকুরী ও কত সুবর্ণ সুযোগকেই না তিনি পদাঘাত করেছেন! ঝিনজানার এক বিশাল পৈত্রিক জামিদারী—যা' অতি সহজেই তার করায়ত্ত হতে পারতো এই বলে হেলায় হাতছাড়া করে দিয়েছেন যে, এজন্যে কিছু করবার বা ভাববার মতো সময় আমার নেই। এমন সিংহহৃদয় ছিলেন বলেই প্রিয়জনদের প্রয়োজনেও তিনি বিরাট অংকের ঋণ করতে একটুও দ্বিধা করতেন না। মাওলানা ইউসুফ সাহেব মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের ইন্তিকালের পর যখন সপরিবারে হজ্জ করতে যান, তখন তিনি ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা কর্জ নিয়ে তাঁকে দিয়ে দিলেন![১] তাঁর এ অভ্যাসের দরুন কখনো কখনো তাঁর ঋণের পরিমাণ ষাট হাজার (৬০,০০০) টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বারই সে ঋণভার লাঘব করে দিয়েছেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

তাঁর সে সিংহহৃদয়ের পরিচায়ক একটি ঘটনা বর্তমান যুগে বলতে গেলে অকল্পনীয় বরং অনেকের কাছে অবিশ্বাস্যই বলতে হবে যে, একবার এমন একজন বুযুর্গ আলিমের ইন্তিকাল হলো—যাঁর সাথে সহকর্মীরূপে একত্রে শায়খ দীর্ঘকাল কাজ করেছিলেন এবং যাঁর কাছে তিনি কিছু পড়েছিলেনও। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন ও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থার জন্য যখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও উত্তরাধিকারীরা সমবেত হলেন, তখন তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁর ঋণ শোধে অপারগতা প্রকাশ করলেন। মৃত্যের ঋণের পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার টাকা (ভারতীয়)। শায়খ নির্দ্বিধায় সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আপন কাঁধে নিয়ে নিলেন এবং যথারীতি তা শোধও করে দিলেন।

অতিথিদের সংখ্যাধিক্য, ব্যয়বৃদ্ধি, যাতায়াতকারীদের ভিড়, নানা প্রকার বর্ধিত দুশ্চিন্তা, উপর্যুপরি প্রাণান্তকর ও বিয়োগান্ত ঘটনাবলী, প্রাণাধিক প্রিয় কনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের ইন্তিকালে মর্মবেদনা বিশেষতঃ ভাতিজাবৎসল চাচা মাওলানা ইলিয়াস সাহেব এবং প্রাণাধিক প্রিয় ও শত গর্বের ধন ভাই ও জামাতা মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের আকস্মিক ইন্তিকালের মত হৃদয় বিদারক ঘটনাবলী সহ্য করা এবং এতদসত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনের নির্ঘন্ট যথারীতি পালন ও প্রসন্ন হৃদয়ে থাকা এবং অতিথিআপ্যায়নে একটুও ব্যতিক্রম দেখা দেওয়া বা ভাটা না পড়াটা তাঁর অনন্য সাধারণ ধী-শক্তি ও আল্লাহ্প্রদত্ত হিম্মত ছাড়া সম্ভবপর হতো না।

শায়খের দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা ও তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌নির্ভরতাও তাঁর উঁচু হিম্মতেরই পরিচায়ক। তিনি পার্থিব কার্যকারণের দিকেও কোনদিন নিজে খেয়াল করতেন না। ভাড়ার এমন একটি বাড়িতে তিনি বসত করা শুরু করলেন যার সম্পর্কে মশহুর ছিল যে এ বাড়ির বাসিন্দাগণ বাঁচেন না। সত্যি সত্যি এ বাড়িতে পর পর কয়েকটি মৃত্যুই সংঘটিত হলো। প্রথমে আব্বাজান, তারপর আম্মাজান, অবশেষে অনুজ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শায়খের সে বাড়ি ছাড়াবার নামটিও নেই। কোনদিন সে বাড়িটি কিনবে এমন কোন চিন্তাভাবনাও ছিল না। কিন্তু গায়েব থেকে এমন ব্যবস্থাই হলো যে, বাড়িটি কিনতেই হলো। ঘরখানা আধা-কাঁচা ছিল। বাড়ির সদর-অন্দর দু'দিকেই স্থান সঙ্কুলানের অভাবে বাইরে লোকজনের বসার এবং ভিতরে থাকবার জায়গার অসুবিধা হতো। অনেক ভক্তজন এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও 'দুনিয়া কয়দিনের' বলে তিনি তা এড়িয়ে যেতেন। বাইরের যে কক্ষে থাকতেন, তার ছাদ পুরনো ও ভাঙ্গা ছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত একটি স্তম্ভের উপর কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল। অবশেষে তাঁর ম্যানেজার মওলবী নসীরউদ্দীন একবার তাঁর রায়পুর অবস্থানকালে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগালেন। তিনি হযরত রায়পুরীকে লিখলেন ঃ আমি ঘরের কাজ ধরিয়েছি। আপনি শায়খকে এক সপ্তাহকাল বেশী আপনার কাছে ধরে রাখবেন। হযরত নানা বাহানায় তাঁকে রায়পুরে ধরে রাখলেন। সে সুযোগে কামরাটি পাকা করে দেওয়া হলো। বৃষ্টি থেকে রক্ষা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য ছাদের সাথে পাকা কার্ণিশও বানিয়ে দেওয়া হলো। শায়খ ফিরে এসে কার্ণিশ দেখে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং একে একটি অপচয় বলে আখ্যায়িত করে নিজেই তা ভেঙ্গে ফেলেন এবং তার স্থলে সেই পুরনো টিনের শেড আবার সেখানে লাগিয়ে দিলেন। যখন মেহ্‌মানদের বসার স্থান আর রইলো না, তখন ঐ কামরার বিপরীত দিকে একটি ছাদযুক্ত খোলা ঘর বানিয়ে দেওয়া হলো- যেখানে সাধারণতঃ মেহমানদের দুপুরের খানা পরিবেশন করা হতো।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঘরের আসবাবপত্রের ব্যাপারে এবং ব্যক্তিগত সমস্ত ব্যাপারেই তিনি স্বল্পে তুষ্ট, নির্লিপ্ত, আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী, বে-পরোয়া এবং স্বাধীনচেতা, লোকে কিছু বলে বা বলবে, তার ধারও ধারতেন না তিনি কোনদিন। সাজগোঁজ বা পরিপাট্যের কোন তোড়জোড় ছিল না তাঁর জীবনে।

ব্যাপকতা

আল্লাহ্ তা'আলা শায়খের জীবনে এমনি ব্যাপকতা দান করছিলেন যে, তাঁর জীবনে অনেকবারই আগুন ও তুলা কাঁচ ও লোহার একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে একাধারে পরস্পর বিরোধী গুণাবলী যে বিরাজ করতে পারে তা' তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। একাগ্রচিত্ততা ও নির্জনতাপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন পথ ও মতের মেহমানদের আতিথ্যের হক আদায় করা, তাদের সেবাযত্ন ও সম্মান করা, ইল্ম ও আমলের চাহিদাগুলোকে একই সাথে পূরণ করে যাওয়া, বিভিন্ন মতেরই কেবল নয়, একেবারে পরস্পর সংঘাতমুখী মতাদর্শ ও আন্দোলনের ধারকবাহকদের আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধাভাজন থাকা এবং একই সাথে তাদের সকলের স্বীকৃতি দেওয়া ও তাদের পক্ষ থেকে সাফাই দেওয়ার সুকঠিন কাজটি শায়খ যেভাবে সাফল্যের সাথে পারতেন, তাতে তাঁর সমকক্ষ লোক পৃথিবীতে খুবই বিরল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের চরম বিরোধ, থানাভবন ও দেওবন্দের চরম দূরত্বের যুগেও উভয় মহলের কাছেই তিনি সমান প্রিয় এবং শ্রদ্ধা ও আস্থার পাত্র ছিলেন এবং তিনি সকল বিরোধ ও তিক্ততার উর্ধ্বে ছিলেন। হযরত রায়পুরী ও তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের গড়া "জামাআতে আহ্রার" এবং তার নেতা মাওলানা আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী মরহুম এবং মাওলানা হাবীবুর রহমান লুধিয়ানবী মরহুম ঠিক তেমনি তাঁর ঘরকে তাঁদের নিজেদের ঘর এবং তাঁর সত্ত্বাকে তাঁদের অত্যন্ত শুভাকাঙক্ষী ও মঙ্গলকামী সত্ত্বা বলে বিশ্বাস করতেন, যেমনটা মনে করতেন মাওলানা আশেক এলাহী মীরাটী সাহেব ও হযরত থানবীর খলীফা ও মুরীদগণ।

হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র)-এর সাথে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরফ আলী থানবী (র.)-এর প্রতি তাঁর অটুট ভক্তি তাঁদের মধ্যে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক বিরোধের যুগেও সর্বজনবিদিত ছিল। তাঁর রচিত الاعتدال فى مراتب الرجال। তাঁর সেই মধ্যমপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ মিলনধর্মী রুচির এক উজ্জ্বল নমুনা-যা' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দান করেছিলেন এবং যা' অনেকবারই সেসব ধর্মীয় গ্রুপকে একত্রিত ও সমন্বিত করেছিল-যাঁরা একই কেন্দ্র ও একই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে রয়েছিলেন। তাঁর এই চরিত্রমাহাত্ম্যের জন্যই বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসারী ও বিভিন্ন শায়খের মুরীদগণ তাঁদের ইল্মী ও আমলী যেকোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁরই দ্বারস্থ হতেন এবং তাঁরা সন্তোষজনক সমাধানও তাঁর কাছ থেকে লাভ করতেন।

হৃদয়বৃত্তি ও বিনয়

শায়খের ইল্‌ম্‌, কিতাবাদি রচনার ব্যস্ততা, গাম্ভীর্য ও সৌম্যতা এবং সংযম ও সহিষ্ণুতার ফানুসের মধ্যে প্রেম–প্রীতি ভালবাসার যে অগ্নিশলাকা বিরাজমান ছিল, ওয়াকিফহাল মহলের চোখে তা' গোপন ছিল না। তাঁর সৃষ্টি উপাদানসমূহের মধ্যে যেন প্রেমপ্রীতির ভাগটাই একটু বেশী পড়েছিল। তাঁর অবস্থা কবি সওদার ভাষায় ঃ

آدم کا جسم جب کہ عناصر سے مل بنا
کچھ آگ بچ رہی تھی سو عاشق کا دل بنا

"সব উপাদানে বনী আদম
বাড়তি কিছুটা আগুন রয়
সেই না অনলে গড়িল বিধাতা
প্রেমিক–হৃদয় আগুনময়।"

ইশ্‌ক ও মহব্বতের সেই জওহর, প্রেমের সেই অগ্নিস্ফূলিংগ তখনই চোখে পড়তো, যখন ইশ্‌কে এলাহী, নবী করীম (সা)–এর প্রসঙ্গ বা আল্লাহ্‌র দরবারে যাঁরা পৌছে গেছেন, সেসব বুযুর্গ মনীষিগণের প্রসঙ্গ উঠতো। এ দীন লেখক তার প্রথম হিজায সফরের সময় মদীনার পথ ঘাটের বিবরণ ও কিছু না'তিয়া কবিতা সম্বলিত একটি পত্র মদীনা শরীক থেকে পাঠালে তা'[২] হাতে পেতেই শায়খের মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরা বর্ণনা করেন যে, একজন সুকণ্ঠী খাদেমের প্রতি সুর করে না'তিয়া কবিতাগুলো শুনাবার নির্দেশ হলো। কালটা ছিল গ্রীষ্মকাল। রমযানের মাস। তখন ইতিকাফ চলছিল। কয়েকজন খাদেম শায়খের হাত–পা টিপছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, কবিতা আবৃত্তির সময় শায়খ জোশ ও আবেগে আপ্লুত হয়ে বারবার বিঘৎ পরিমাণ লাফিয়ে উঠছিলেন! গা টিপায় রত খাদেমগণ লক্ষ্য করেন যে, এ সময় বারবার তাঁর দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যাচ্ছিলো। কোন মতেই তিনি তাঁর অবস্থা গোপন করতে পারছিলেন না। এ দীন লেখক বহুবার দেখেছেন যে, তিনি তাঁর একটি পাণ্ডুলিপি[৩] থেকে হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার কিছু বিবরণ হযরত রায়পুরীকে শুনাচ্ছেন। শায়খ পার্শ্বেই একটি চৌকিতে উপবিষ্ট ছিলেন। বিবরণ শুনে তাঁর শরীরে এমনি কম্পন সৃষ্টি হলো যে, গোটা চৌকিটা অহরহ কাঁপছিলো। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবসহ যে হজ্জ করেন, সে হজ্জ থেকে ফিরে এমনিভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন, যেমনটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুরা কাঁদে তাদের মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করলে।[৪]

সেই পবিত্রভূমি ও হাবীবের দেশের সাথে তাঁর হৃদয়ের যে সম্পর্ক ছিল এবং তার বিরহে তাঁর হৃদয় যে কীভাবে মথিত হতো, তার কিছুটা আঁচ করা যাবে নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে–যা তাঁর জনৈক একনিষ্ঠ খাদেম এ লেখকের নামে লিখেছিলেন। তিনি তাতে লিখেন ঃ

"তায়েফ থেকে ফিরে উমরা করে (জায়িরানা থেকে ইহ্রাম বেঁধে) পরদিন জেদ্দা রওয়ানা হন। হেরেমের শেষ সীমায় অবস্থিত কূয়াটির কাছেই মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে গেল। নামাযান্তে গাড়িতে আরোহণের প্রাক্কালে হযরতের ভীষণ কান্না পেলো। জেদ্দায় পৌছে মুহাম্মদ আলী সাহেবের বাসায় রাত্রি কাটালেন। সারা রাত এক অদ্ভুত অধীরতার মধ্যে কাটলো। হযরতের খেদমতে আমি ছিলাম আর ছিলেন জনাব আবুল হাসান সাহেব। অন্যান্য খাদেমগণ হযরতজীর সাথে পাশের কামরাগুলিতে ছিলেন। হযরত বারবার উঠে বসছিলেন। আমরাও টের পেয়ে জেগে উঠতাম। আবার কখনো শুয়ে থাকার ভান করতাম এবং চুপে চুপে লক্ষ্য করতাম যে হযরত কী করেন। এ অধমের বিগত ২২ বছরের মধ্যে কয়েকবারই দীর্ঘদিন ধরে হযরতের খেদমতে থাকার সুযোগ হয়েছে। হযরত সফরেই হোন, আর বাড়িতেই হোন, পরিবারের কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠদের মৃত্যুর শোকগ্রস্ত অবস্থায়, রমযানের রাতসমূহে, হজের সফরে, আরাফাতের সফরে প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় হযরতের উদ্বেগাকুল ও আবেগঘন মুহূর্ত সময় দেখার সুযোগ অনেকবারই জুটেছে; কিন্তু এমন অবস্থা আর কখনও দেখতে পাইনি। কখনো খিড়কী দিয়ে মুখ বের করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন আর মুখে বল্ছেন ঃ আবুল হাসান, আজই আরবকে আরো একটু দেখে নাও। আগামীকাল চলেই যেতে হবে। পরদিন বিমানবন্দরের ওয়েটিং রুমে বসা ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ বসতে হলো। হজের মওসুম। সাথে পাকিস্তানযাত্রী সঙ্গী সাথীর ভিড়। জেদ্দায় বিদায় সম্বর্ধনাকারীদের নিকট থেকে বিদায় নিতেও বেশ দেরী হলো। এ দীন সেবক হযরতকে জীবনে কাঁদতে দেখেছি বহুবারই। অধিকাংশ সময়ই অপরিচিত লোকেরা তাঁর কান্নায় অবস্থা টের পেতো না। কিন্তু একটু গভীরভাবে তাকালে দেখা যেতো যে, হযরত কাঁদছেন। কোন কোন সময় নামায, তিলাওয়াত প্রভৃতির সময় হযরতের কান্না টেরও পাওয়া যেতো। কিন্তু চোখে এত পানি দেখা যেতো না। সাধারণতঃ এমন অবস্থায় কোন সাক্ষাৎকারী সাক্ষাৎ করতে আসলে অথবা হাসিখুশীর কোন প্রসঙ্গ এসে যাওয়ায়

একটু হাসিমুখ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে বা কাউকে ধমক টমক দেওয়ার দরকার হলে বাহ্যিকভাবে তখন তিনি পরিস্থিতির চাহিদা মুতাবিক নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য বদলে নিতেন ।

সেই বিদায়ের দিনটি ছিল অভূতপূর্ব। হযরত বসা ছিলেন। তাঁর চারদিকে জনতার বেশ ভিড় ছিল, কিন্তু তিনি এমনভাবে নিরিবিলি বসা ছিলেন, যেন সম্পূর্ণ একাকী, কারো সাথে একটু কথাও নেই। আপন মনে কেঁদে চলেছিলেন। দু' চোখ বেয়ে অশ্রুর ঢল নামছিল। গায়ের জামা চোখের পানিতে ভিজে চলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন পানির কোন নলের নীচে বসে আছেন। সে কান্নায় কোন শব্দ ছিল না। হযরত হাত ঢিলা করে বসে ছিলেন। লোকজন একের পর এক মুসাফাহা করে যাচ্ছিলো। এক ভয়াতুর গম্ভীর পরিবেশ। এভাবেই লোকজন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এ ধরনের অবস্থা যেহেতু সর্বদাই গোপন করে চলতেন, তাই নিজ চোখে না দেখলে এ বিবরণ আমার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতো। আর দেখেছি বলে এখন এ বিবরণকেও যথেষ্ট মনে করতে পারছি না।'[৫]

তাঁর এই মহব্বত ও আন্তরিকতা তাঁর দরস, তাঁর রচনাবলী, এবং তাঁর সাথে বয়'আত ও ভক্তির সম্পর্ক প্রত্যেকটি ব্যাপারকে এমনি মহিমান্বিত করে তুলেছিল যা' কেবল 'আহ্‌লে ইশ্‌ক' বা প্রেমিক ভুবনের লোকদের জন্যই নির্ধারিত।

আল্লাহ্‌প্রদত্ত তাঁর সমস্ত কামালাত ও কৃতিত্ব এবং গুরুস্থানীয় সমস্ত শায়খ ও ওলীআল্লাহ্‌গণের নিকট এত আদরণীয় ও স্নেহভাজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন এবং নবী করীম (সা.)–এর দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

(হে আল্লাহ্! আমাকে নিজ চোখে ছোট ও লোকজনের চোখে বড় কর) তাঁর জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছিল, তার কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে নীচের উদ্ধৃতিগুলো থেকে–যা' তাঁর লিখিত সেসব পাত্র থেকে নেয়া যা' তিনি হিজাযের ঠিকানায় এ দীনকে লিখেছিলেন।

"বাদ সালাম মসনুন। রায়বেরিলীর কাগজটি হস্তগত হলো। রওয়ানা হওয়ার আগে সাক্ষাত তো আমার মনও চাচ্ছিলো। কিন্তু সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ। এত সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে আপনার তশরীফ আনা কষ্টকর হবে। আমাকেও মওলবী

ইউসুফ সাহেব আজকালকের মধ্যে ডাকছেন। এক্ষুণি গিয়ে শীগগিরই পুনরায় যাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। আমি তো তাঁকে লিখেছি যে, এখন না ডেকে তখন ডাকালেই বরং ভাল হতো। আপনি একথা লিখেননি যে, দিল্লী থেকে কবে রওয়ানা হচ্ছেন; নাকি সাহারানপুরের পথেই রওয়ানা হবেন। দিল্লীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করেছি, কিন্তু সেখান থেকে জবাব পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যাই হোক, যদি দেখা একান্তই না হয়, তবে প্রথমে নিজের যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। দ্বিতীয়ত ঃ

جاتے ھو تو جاؤ پر اتنا سن جاؤ

یاد جو آجائیں ، تو مرنے کی دعا کرنا

"যেতে চাও যাও চলে, শুনে যাও একটি বচন
দু'আ দিও মরণের যদি কভু হয়গো স্মরণ।

নবীজীর দরবারে পৌঁছে যদি স্মরণ পড়ে যায়, তবে আরয করে দেবেন একটা পাপীতাপী ভারতীয়ও সালাম আরয করেছিল। দু'একটি তাওয়াফও যদি এ অকর্মণ্যের পক্ষ থেকে করে ফেলেন তবে আপনার মতো বদান্যশীল পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে তা' খুব বোঝা হবে না আশা করি। এ অকর্মন্য ও অপদার্থের জন্য বড় তবর্রুক হচ্ছে এগুলোই। কোন তবর্রুক আনার মোটেও কোন চিন্তা করবেন না। ঘনিষ্ঠতা থাকায় আমি নিজেই নিজের পসন্দনীয় তবর্রুকের কথা বলে দিয়েছি। খেজুর ও যমযম প্রভৃতির তবর্রুকের তুলনায় দু'আ ও তাওয়াফে খুশীও বেশী হবো এবং এগুলোর কাঙালও আমি বেশী।

ইতি—ওয়াস্ সালাম।
যাকারিয়া, মাযাহিরুল উলূম
২৩শে রজব, ৬৬ হিঃ।

রওযায়ে আতহারে করজোড়ে সালাত ও সালাম

বাদ সালাম মসনূন। ১৩ই রমযানের আপনার পত্রখানি মাহে রমযানুল মুবারকের ২০ তারিখে পৌঁছেছে। যদি ও ইচ্ছা থাকলেও এ মুবারক মাসে পত্র লিখার সময় হয়ে উঠে না, কিন্তু আপনার প্রতীক্ষার দরুন কয়েক ছত্র লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

আপনার পত্রখানি গ্রীষ্মের এ রমযান শরীফে এক অগ্নিশলাকা জ্বালিয়ে তুলেছে। এছাড়া আর কীইবা বলতে পারি ঃ

هنيئا لارباب النعيم نعيمهم

রাস্তার অবস্থা ও দৃশ্যসমূহের কথা লিখে আপনি পুরনো স্মৃতি ও ঘটনাবলী আবার মানসপটে জাগরুক করে দিলেন। আপনি কতদিন পর্যন্ত মদীনা তাইয়িবায় থাকবেন, সে ব্যাপারে কিছুই লিখেননি—যাথেকে ঈদের পরবর্তী পত্রাদি কোন্ ঠিকানায় পাঠাতে হবে জানতে পারা যেতো। মাহে মুবারক এখন সমাপ্তির পথে। এ কম সময়ের মধ্যে অন্য কোন পত্র যে পৌঁছবে না তা' বলাই বাহুল্য। তারপর এক নাগাড়ে প্রায় দশ দিন কেটে যাবে রায়পুর প্রভৃতি স্থানের সফরে। রওযা পাকে সবিনয় সালাত ও সালাম পৌঁছানের দরখাস্ত রইলো। উপস্থিত সকলের খেদমতে পুনর্বার এ আরয করছি।

যাকারিয়া (নিযামুদ্দীন)

২২শে রমযান, ১৩৬৬ হিঃ

"বাদ সালাম মসনূন। ধারণা বরং দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দিল্লীতে অবশ্যই বিদায়ী সাক্ষাৎ হবে এবং আপন দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে কিছু প্রার্থনার দরখাস্ত করবো। এবার আমার দিল্লী সফরের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যই ছিল আপনার সংগে সাক্ষাৎ করা, কিন্তু ভ্রমণ-ব্যবস্থা এমনি গোলমেলে হয়ে গেল যে, আমি মাওলানা মওলবী মনযূর সাহেব নু'মানীর মাধ্যমে বলে পাঠাতে বাধ্য হলাম যে, আপনি সোজা চলে যাবেন। কিন্তু সাক্ষাৎ না হওয়ায় অবশ্যই মনে ব্যথা পেয়েছি এবং এ ব্যথা ভুলবার মতোও নয়। এখন এ ছাড়া আর কীই বা করতে পারি যে, এ লিপিখানার মাধ্যমে আপনি দুর্দশার কথা ব্যক্ত করছি। আপনি নিজেই একটু আন্দাজ করুন তো, এর চাইতে হতভাগ্য আর কে হতে পারে–যার হযরতে আক্দাস ও আপনার মত সফরসঙ্গী জুটতেও এবং ভাড়ার জন্য তার কোনই অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও এবং বাহ্যিক কোন ওযরও না থাকা সত্ত্বেও সে বঞ্চিত থাকে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে এছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে যে, এ হতভাগ্যের পাপতাপের জন্যই তাকে হাবীবের দেশে হাযির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এখন আপনার সমীপে পরম বিনীত দরখাস্ত হচ্ছে, মুলতাযাম এবং নবী করীম (সা.)-এর মাযারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এ নাপাকের জন্য যা করতে পারেন, একটু করবেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করবেন। আর এখানকার

মুসলমানদের জন্য যে কী বলতে হবে তা তো আপনার দরদী অন্তর আমার চাইতেও ভাল জানে। . . . . ইতি

ওয়াস সালাম

যাকারিয়া,

মাযাহিরুল উলূম

১৪ই যিলকাদ,' ৬৯ হিঃ

সেই সম্পর্ক, বাতেনী অবস্থা এবং রূহানী ইশ্‌ক বা আধ্যাত্মিক প্রেমের একটু ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে তাঁর কয়েকটি পত্রের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি যা' তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে এদীন লেখককে তার দুইটি হজ্জের সময় (১৯৪৭ ও ১৯৫০ইং) হিজাযের ঠিকানায় লিখেছিলেন ঃ

ہمارا نام لے کر آہ بھی ایک کھینچیو قاصد

جو وہ پوچھیں تو کہہ دینا یہ پیغام زبانی ہے

নামটি আমার নিয়ে কাসেদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে নিও–

শুধাইলে আমার কথা মোর এ বাণী বলে দিও।

বাদ সালাম মসনূন–করাচী থেকে আপনার দু'খানা পত্র পেলাম, একখানা বিস্তারিত খাম, অপরখানা সংক্ষিপ্ত কার্ড। কিন্তু সেখানে জবাব দেবার অবকাশ ছিল না। আপনি এ নাপাকের সাহচর্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এ সাক্ষাৎ নাপাক সে পাকভূমির যোগ্য কোথায়? দু'বার হাযির হয়েছি, কিন্তু এক পবিত্র ও পবিত্রকারী ব্যক্তিত্বের পিছু পিছু কিৎমীর[৬] হয়ে গিয়েছিলাম, বরং আদেশ হয়েছিল পিছনে যাওয়ার জন্যে তাই যেতে পেরেছিলাম। এখন আর তেমন কোন পবিত্র সত্ত্বাকে আর পাচ্ছিনা যিনি সমুদ্রের মতো সকল নাপাককেই পাক করে নেবেন। হায় আফসোস! জানি না আপনি কোন ভুলের মধ্যে আছেন। আমার অবস্থা হচ্ছে ঃ

كان ظنى بان الشيب يرشدنى * اذا اتى فاذا غى بـه كثر

ভেবেছিলাম বার্ধক্যই আমায় বুঝি শুধ্‌রে নেবে

কে জান্‌তো বৃদ্ধ হলে পাপের মতি বেড়েই যাবে।

বরং এখন বাস্তব অবস্থা হচ্ছে ঃ

كنت امرأ من جند ابليس فارتقى * بى الدهر حتى صار ابليس من جندى

فلو مات قبلى كنت احسن بعده * طرائق فسق ليس يحسنها بعدى

ছিনু আমি শয়তানেই দলের মাত্র একটি সেনা,
(এখন) উন্নতিতে আমিই পতি শয়তান হলো আমার সেনা
মরে যদি শয়তান আগে আমি হবো সত্যি সেরা–
মরলে আমি সাধ্য কি তার জানবে পাপের চুল ও চেরা।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যতের সাত্তারী (পাপ গোপন করার) গুণের দরুন এ অপবিত্র সম্পর্কে আপনি নেহাতই ভুল ধারণার বশবর্তী থাকায় আপনার এ পাপীর সাথে যে ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতাটুকু রয়েছে তার প্রেক্ষিতে দরখাস্ত রইলো, বরকতপূর্ণ মাসের বরকতপূর্ণ রাতগুলোতে, বরকতপূর্ণ স্থানসমূহে দু'আ করে যদি একটু অনুগ্রহ করেন তবে সেই পবিত্র সত্তা, অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, সর্বশক্তিমান যিনি জুলায়হকে[৭] উমরে রূপান্তরিত করেন, তাঁর জন্যে এ নাপাককে পাক আর পাপীকে পুণ্যবান বানিয়ে ফেলা মোটেই বিচিত্র নয়। কবির ভাষায় ঃ

چشمه فیض سے اگر ایك اشارہ هو جائے * لطف هو آپ کا اور کام همارا هو جائے

'ফয়েযেরই ঝর্ণা থেকে এক ইশারা হলে তবে
সেতো হবে তোমার দয়া মোর আশাও পূর্ণ হবে।'

আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। বাহ্যতঃ সময় ঘনিয়েই এসেছে অথচ অবস্থা হচ্ছে ঃ

آئی تھی کچھ لینے کو * اور بھول چکی کچھ اور

کیا دکھاؤں گی اپنے پیا کو * میرے خالی دونوں هاتھ

কী বা নিতে এসেছিলাম ভুলে গেলাম আত্মভোলা
খালি হাতেই চলছি ফিরে পিয়াকে মোর কীযে বলা!

دیتے هیں موئے سفید افسوس پیغام اجل

نفس سنتا هی نهیں هر چند کهتا هوں سنبهل

পক্ক কেশই দেয় ঘোষণা নেই দেরী আর মৃত্যু আসার
যতই বলি সংযমী হ' মানে না মন পাপী আমার।

নিজের দুরাবস্থার বারমাসী আর কত শুনাবো আর এ মুনাফিকসুলভ লেখা দ্বারা আপনার মুবারক সময় আর কত নষ্ট করবো? এ ছত্র ক'টি শুধু এজন্যেই লেখা যে, যদি আপনার মনে একটু কষ্টও হয় তবে সেই পাক দরবারে হয়তো কিছু নিবেদন করবেন–যার পাক চরণের জুতাসমূহের প্রতিটি অণুপরমাণুর ব্যাপারেও

لو اقسم على الله لا بره

হাদীছ বাণীটি প্রযোজ্য।

নেহাৎ আদবের সাথে সালাত ও সালাম দিয়ে আরয করবেন যে, এ নাপাকের সালাম ঐ পাক দরবারের আদৌ উপযোগী নয়, কিন্তু তুমি রহমতুললিল 'আলামীন, এ নাপাকের জন্য তোমার দয়ার নযর ছাড়া কোন ঠিকানা নেই ঃ

نه آخر رحمة العالمينى * ز محروما چرا فارغ نشينى

দয়া যদি না–ই করেন রহমাতুল্লিল আলামীনি,
এ দুর্দশার কবল থেকে বাঁচতে পারে কে--ই বা শুনি?

এও আরয করে দেবেন যে, কিছু আরয করবার মুখই নেই, তাই কী আর আরয করবো? ইতি।

ওয়াস্‌সালাম
যাকারিয়া, মাযাহিরুল উলূম
২২ শে শা'বান,' ৬৬ হিঃ

"একটি বিশেষ দরখাস্ত আপনার খেদমতে এই যে, 'মুলতাযামে' একটি বার এ নাপাকের জন্য প্রার্থনা করবেন ঃ

من نگويم كه طاعتم بپذير
قلم عفو بر گنا هم كش

—বল্‌ছিনা আমি বন্দেগী করি চাই তার বিনিময়
বরং চাইছি ক্ষমা তব কাছে ও গো খোদা দয়াময়–!

এমনও তো হতে পারে যে, গুনাহ্‌মুক্ত পূণ্যবান লোকের পবিত্র মুখ কোন নাপাক পাপীর পরিত্রাণের উপলক্ষ হয়ে যাবে। যে ব্যাপারটির জন্য আমি গর্বিত ও আশাবাদী, তা' হচ্ছে সেই শৈশব থেকে এই বার্ধক্য পর্যন্ত আল্লাহ্‌র একটি

বিরাট দান আমার উপর এই ছিল যে বড় বড় পুণ্যাত্মা আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গানের অফুরন্ত স্নেহ মমতা পেয়েছি। এজন্য আমি যতই গর্ব করি না কেন তা' কমই হবে। কিন্তু যখন কিয়ামতের সেই ঘোষণা

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (পাপীরা আজ পুণ্যবানদের মধ্য থেকে সরে পৃথক হয়ে যাও)–এর কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় তখন সকল গর্ব সকল আনন্দ মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। হায়, যদি আপনাদের—ঘনিষ্ঠজন ও সুধারণা পোষণকারীদের–জোর সুপারিশ এ নাপাকের মসীলিপ্ত আমলনামাকে ধুয়ে মুছে ফেলে, তা'হলে তা' আপনাদের কত বড় দান হবে এ হতভাগ্যের উপর! নতুবা কাল কিয়ামতে যখন আমার নাপাক অবস্থা আপনাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হবে, তখন আপনার এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য আক্ষেপ হবে–যে সম্পর্কের কথা আপনি আপনার বোম্বে থেকে লিখিত বিস্তারিত পত্রে লিখেছেন . . . .।

ইতি—ওয়াস্ সালাম
যাকারিয়া, মাযাহিরুল উলূম
২৬ শে যিলকাদ,' ৬৯ হিঃ

ধর্মের ব্যাপারে আপোষহীনতা ও বিশুদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারার হিফাযত

আল্লাহ্ তা'আলা শায়খের চরিত্রে ধর্মের ব্যাপারে নিরাপোষ দৃঢ়তা এবং আপন পূর্বসূরি ও উলামায়ে হকের (যাঁরা সর্বদাই মুজাদ্দেদী ও ওলীআল্লাহী সিল্‌সিলার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন) মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকার গুণ দান করেছিলেন। এর কিছুটা ছিল তাঁর সহজাত এবং কিছুটা তাঁর বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এর ব্যতিক্রম বা অন্যথা তিনি কোনক্রমেই বরদাশত করতে পারতেন না। যখনই ভারতবর্ষে ইসলামের অস্তিত্ব ও মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র বা সংকট তিনি আঁচ করেছেন, তখনই তিনি অধীর ও ব্যথাতুর হয়েছেন। নিজে সে ষড়ন্ত্রের মুকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে সে ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আকুল আহবান জানিয়েছেন।

ইংরেজ আমলে যখন প্রথমবার বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের আইন প্রণীত হলো, তখন শায়খ সে সংকট আঁচ করতে পেরে "কুরআনে আযীম ও জবরিয়া তা'লীম" (কুরআন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা) শিরোনামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এ আইন প্রথমে দিল্লীতে কার্যকরী করা হয়। পুস্তিকাটি ১৩ই মুহার্‌রম ১৩৫০

হিজরীতে রচিত হয়। তাতে গ্রন্থকারের নামের পূর্বে "মর্মাহত" শব্দটি লিখে স্বাক্ষর করেছিলেন–যাতে তাঁর মর্মবেদনার কথাটি ব্যক্ত হয়েছিল। স্বাধীনতাউত্তর ভারতে (১৯৪৮–৪৯ সালে) যখন পুনরায় সেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর জোর দেয়া হলো, তখন শায়খ পুনরায় সক্রিয় হন। তিনি এ আইনের অন্তর্নিহিত সুদূরপ্রসারী বিষয়ের কথা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এ দীন লেখকের নামে ৩রা জমাঃ ছানী (৬ই এপ্রিল, ১৯৪৯ ইং) তারিখে লিখিত পত্রে তিনি লিখেনঃ

'পরিস্থিতির ক্রমাবনতির দরুন সব সময়ই চিন্তা হয়, কেউ মুসলমান থাকতে চাইলেও বুঝি থাক্তে পারবে না। এর কোন সমাধানও খুঁজে পাচ্ছি না। আজকাল আমার সবচাইতে দুর্ভাবনার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের মক্তবগুলো। সর্বত্রই বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য লোকে জোর দিচ্ছে মক্তবের শিশুদের উপর। এ ব্যাপারে যদি কিছু আলাপ করতে চাইও তবে কার সাথে আলাপ করবো, কী আলাপ করবো, কিছুই ঠাউরে উঠতে পারছি না। যাদের উপর এব্যাপারে আশা করা যেতে পারতো, তাদের সাথে যখন এ প্রসঙ্গে কথা বলি তখন তাঁরা বেশ জাঁকালো বক্তৃতা করে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, মক্তবের এ পদ্ধতিটা নিছক সময়ের অপচয়। শিশুদের মূল্যবান সময়ের এভাবে অপচয় করার কোন মানেই হয় না। জাতীয় শিক্ষা বিশেষতঃ হিন্দী শিক্ষা ধর্মীয় প্রয়োজনেও এতটা জরুরী বলে তাঁরা বুঝাতে চেষ্টা করেন, স্যার সৈয়দ ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বোধ হয় এতটুকু কোনদিন চিন্তা করেননি।

و الله المستعان আল্লাহ্ই সহায়।

অনুরূপভাবে তিনি তওহীদ, ইত্তেবায়ে সুন্নত ও রদ্দে বিদআতের যে শিক্ষা ও উত্তরাধিকার তাঁর পূর্বসূরি পিতৃপুরুষ এবং উস্তাদ ও শায়খদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন, তার সমর্থন ও সংরক্ষণে সদা তৎপর থাকতেন। দেশ বিভাগের পর রাজনৈতিক প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক আলিম মুসলমানদের একত্রে সমাবেশ ও এদেশে বেঁচে থাকার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাই তাঁরা স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া উরুসের ও পুনর্জীবন দানকেও সমর্থন জানাতে থাকেন–যাতে করে মুসলমানরা পরস্পরে সাক্ষাৎ ও ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ পান। এ সংবাদ পেয়ে শায়খ অত্যান্ত মর্মাহত হন। এক পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"আল্লাহ্র শান, যুগের পরিবর্তন ও নিজেদের দুষ্কর্মের ফলই বলতে হবে যে, যে–দেওবন্দী জামাআত সর্বদা উরুস বন্ধের জন্য চেষ্টিত ছিলেন, আজ তাঁরাই

উরুসের উন্নতি বিধানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন! যাঁদের বাপ-দাদারা নিযামুদ্দীনের উরুসের সময় বস্তি ছেড়ে কয়েকদিনের জন্য বাইরে চলে যেতেন, তাঁরাই আজ মনে করেন উরুসের ওসিলায় পাকিস্তান থেকে আসার সুযোগ পাওয়া বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য উরুসই হচ্ছে এক সুবর্ণ সুযোগ!"

১৯৪৯ ইংরেজিতে একবার শায়খের নজর পড়লো "আল-জমিয়ত" পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনের উপর। তাতে "শায়খুল হিন্দ্ পঞ্জিকার" ঘোষণা ছিল। পত্রিকার একটি সংখ্যায় উক্ত পঞ্জিকার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লিখলেন ঃ "পঞ্জিকার গুরুত্ব বর্ধিত করেছে শায়খুল ইসলাম মাওলানা মাদানীর ছবি। গোটা পঞ্জিকার মূল্য ঐ এক ছবিতেই উঠে যায়।" শায়খ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি একটি বারের জন্যও ভাবলেন না যে, আল-জমিয়ত হচ্ছে উলামায়ে দেওবন্দের মুখপত্র এবং জমিয়তে উলামার নেতৃত্ব তাঁরই প্রিয় সম্মানিত বুযুর্গদের হাতে। সেই আলোচনাটি দেখেই এ দীনকে লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখলেন ঃ

"একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনার ও মাওলানা মনযূর নু'মানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। "শায়খুল হিন্দ জন্তরী" নামে নাকি একটি পঞ্জিকা বেরিয়েছে-যা এখানো আমি দেখিনি। কিন্তু তার বিজ্ঞাপন জমিয়তের কাগজসমূহে বিশেষতঃ জমিয়ত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। যদি এখনো না দেখে থাকেন, তবে জমিয়ত সংখ্যায় অবশ্যই তা' দেখে নেবেন। এ সম্পর্কে আল-জমিয়ত পত্রিকার ১৯শে এপ্রিল সংখ্যায় আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মদনীর (আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন) ছবির প্রশংসায় লিখিত হয়েছে ঃ "একথা বললে এতটুকু আতিশয্য হবে না যে, উক্ত পঞ্জিকার মূল্য ঐ এক ছবিতেই উঠে যায়।" আলেম সমাজের মুখপত্রের জন্য এটা অত্যন্ত অশোভনীয়। এঁরা যদি ছবি অংকনকে নিন্দা করতে একান্তই অপারগ হন, তবে কমপক্ষে তার প্রশংসাকীর্তন থেকে বিরত থাকা উচিত। অসঙ্গত বিবেচনা না করলে আল-ফুরকান' ও 'তা'মীর' পত্রিকার এর সমালোচনা হওয়া চাই।

(২৭ শে জমাঃছানী ৬৮ হিঃ/১৯৪৯ ইং)

অনুরূপভাবে শায়খ একবার শুনতে পেলেন যে, একজন শ্রদ্ধেয় দেওবন্দী আলেম ১২ই রবিউল আউয়ালের এক মীলাদুন্নবী জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। এ সম্পর্কে শায়খ এ দীনহীনকে লিখলেন ঃ

"মাত্র ক'দিন আগে খবরের কাগজে রবিউল আউয়ালের মীলাদী জলসায় ... ... এর অংশ গ্রহণের ওয়াদার খবরটি পড়লাম। সেই অবধি ভাবছি, যে ব্যাপারে আমাদের গুরুজনগণ এতই নাক সিটকালেন, আজ 'আল-জমিয়ত পত্রিকা স্বয়ং তারই প্রচারণার জন্য যেন ওয়াক্ফ হয়েই রয়েছে।" (১১ই রবিঃ আউয়াল ৭৪ হিঃ তারিখের পত্র)

এ চেতনার ফলশ্রুতিতেই শায়খ আমাকে অত্যন্ত তাগিদের সাথে হযরত মাওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদের "তাকভীয়াতুল ঈমান" গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করতে আদেশ দেন। (উক্ত কিতাবখানি উক্ত জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গীর মুখপত্র স্বরূপ। নির্ভেজাল তাওহীদের এমন বলিষ্ঠ দাওয়াতের দৃষ্টান্ত বিরল।) ১৩৯৩ হিজরীর জিলহাজ্জ মাসে (ডিসেম্বর ১৯৭৩ ইং) যখন এ লেখক মদীনা তাইয়িবায়, তখন তিনি আমাকে কিতাবখানির আরবী অনুবাদ করতে বলেন। আমি ওয়াদা করলাম, কিন্তু তিনি তাতে নিশ্চিন্ত হলেন না বরং আমার সফরসঙ্গী প্রিয়বর সায়্যিদ মুহাম্মদ ওয়াযেহ্ নদভীকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে, মদীনা ত্যাগের পূর্বেই মসজিদে নববীতে বসে যেন কাজ শুরু করেই তবে যাই। সে মতে আমি ঠিক বিদায়ের দিন ২৯ অথবা ৩০শে যিলহাজ্জ পূর্বাহ্নে হাজীদের পূর্ণ ভিড় ও যিকির, তসবীহ ও দুরূদের শোরগোলের মধ্যে বাবে জিব্রীল ও বাবে রহমতের মধ্যখানে বসে পুস্তকের ভূমিকার প্রথমাংশ লিখি এবং তৎক্ষণাৎই ওয়াযেহ নদভী বাবে-উমরে উপবিষ্ট শায়খকে গিয়ে তা' শুনিয়ে দেন। শায়খ তাতে অত্যন্ত প্রীত হয়ে অনেকক্ষণ দু'আ করেন এবং এজন্য মুবারকবাদ দেন। ১৩৯৪ হিজরীর শেষদিকে বইয়ের অনুবাদকর্ম শেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় পাদটীকাও জুড়ে দেই। একটি দীর্ঘ ভূমিকা এবং লেখক-পরিচিতিও আমি তাতে সংযোজিত করি।[৮] মুদ্রিত হওয়ার পর শায়খ প্রচুর সংখ্যায় তা' ক্রয় করে বন্ধুবান্ধবও ভক্ত খাদিমদের মধ্যে বিতরণ করেন।

ধর্মীয় মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন রাখার এ প্রেরণাই তাঁকে মদীনা তাইয়িবায় এমন একটি ব্যাপারে কলম ধারণে উদ্দীপ্ত করে-যা' একটা ব্যাপক ও সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ব্যাধিটি হচ্ছে শ্মশ্রুমুণ্ডন। তিনি দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তিকাটি আরবীতেও অনূদিত[৯] হয়ে আরবদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। আরব-সমাজে এ গাফলতিটি ব্যাপকভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর উক্ত প্রেরণাই তাঁকে জামাতে ইসলামীর চিন্তাধারা ও তার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর রচনাবলীর সমালোচনা, পর্যালোচনা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ করতে বাধ্য করে। যখন তিনি জানতে ও দেখতে পেলেন যে, তাঁরই পূর্বসূরী ও মাশায়েখের বহু সাধনায় প্রজ্জ্বলিত এ উপমহাদেশের মহব্বতে এলাহী ও এশকে-রসূলের অগ্নিশিখা এবং জনমনে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রেরণাকে (যার বাহন ছিল সাধারণতঃ তাসাওউফ বা সূফীবাদ) বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চল্‌ছে এবং নিজের দরস, দীক্ষা ও রচনাবলীর আলোকে কোন বিশেষ ফেক্‌হী মতবাদ (হানাফী-শাফেয়ী-মালেকী-হাম্বলীর কোন একটি অনুবাদক) আবশ্যিকভাবে অবলম্বন ও অনুসরণের যে তীব্র প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করছিলেন এবং যে পন্থায় প্রত্যেকেরই 'মুজতাহিদ' বনে যাওয়ার বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী প্রবণতারোধ হয়েছিল এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন (বা মযহাব প্রবর্তক) ইমামগণের প্রতি, বিশেষভাবে ও সল্‌ফে সালেহীন বা প্রাচীন যুগের পূর্বসূরী মহাত্মাগণের প্রতি সাধারণভাবে যে শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠেছিল তা' মওদুদী-রচনাবলীর দ্বারা বিনষ্ট হচ্ছে এবং খোদাভক্তি ও উবুদিয়তের অনুভূতি, পরকাল-চিন্তা, ঈমান ও এহ্‌তেসাবের উপর দ্বীনের রাজ-নৈতিক ও সাংগঠনিক ধারণাই প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সাথে সাথেই তিনি তাঁর এক পুরনো বন্ধু ও সহকর্মীর[১০] নামে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেন, তা' তাঁর অনুপস্থিতিতে পরবর্তীকালে "ফিৎনায়ে মওদুদীয়ত" নামে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার প্রকাশের সময় শায়খ পুস্তকটির নামকরণ করেন "জামাতে ইসলামী ঃ এক লমহায়ে ফিকরিয়া" (জামাতে ইসলাম ঃ একটি প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার)।

মিসরের প্রেসিডেন্ট ও নেতা জামাল আবদুন নাসের যখন আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হয়ে মিসর তথা গোটা মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় চেতনা ও নবী করীম (সা.) ও ইসলামের সাথে আরবদের সংযোগ ও ঘনিষ্ঠতাকে বিঘ্নিত করে তুল্‌ছিলেন এবং কয়েকটি সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপে তাঁর সাফল্যের দরুন ভারতবর্ষের আলিমদের একটি বিরাট অংশ ও কিছু সংখ্যক ধর্মীয় সংগঠন জামাল নাসেরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন[১১] তখন এই ধর্মীয় চেতনাই শায়খকে তাঁর প্রতি বিরূপ করে তোলে। এ সময় শায়খের দরবারে জামাল আবদুন্ নাসেরের বিরুদ্ধে খোলাখুলি সমালোচনা হতো এবং শায়খ তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন। এমনকি রমযানুল মুবারকের ব্যস্ত সময়ে ইশার পর এক ভরা মজলিসে

হযরত শায়খ উর্দু সাপ্তাহিক "তা'মীরে হায়াতে" প্রকাশিত মুহাম্মদ মিঞা মরহুমের একটি কঠোর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ উচ্চৈঃস্বরে পড়ে শুনানোর ব্যবস্থা করেন। উপস্থিত কেউ কেউ তাতে আহত বোধ করলেও শায়খ তাতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি।

যিকির ও রূহানীয়ত এবং যুগবরেণ্য বুযুর্গানের প্রতি ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ

হযরত শায়খ নিজে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও নিজের ভক্তদের দৃষ্টি যুগবরেণ্য শায়খদের বিশেষতঃ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদির রায়পুরীর দিকে তাগিদ সহকারে আকৃষ্ট করতেন। এটা তাঁর চরম লিল্লাহিয়ত ও নিঃস্বার্থ মনেরই পরিচয় বহন করে। আমার নামে লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"রায়পুর সম্পর্কেও আমি তাগিদ দিয়েই আরয করবো যে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে একটু সময় বের করে নেবেন। চাচাজান[১২] তো চলেই গেলেন। মওলানাও এখন সাহ্রীর প্রদীপতুল্য (মানে আর বেশী দিন নেই), ব্যস্ততা তো মানুষের থাকেই, ব্যস্ততামুক্ত কবেই বা হওয়া যায়? [১৩-১৪]

অপর এক পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"জনাবের রায়পুর সফরের গুরুত্ব এ বান্দার নিকট অনেক বেশী। বারবার আর তা' কি বলবো! বান্দা তো যোগ্য ব্যক্তিদের সেখানে যাওয়াকে খুবই জরুরী বিবেচনা করে থাকে। যখনই সময় পাওয়া যায়, একাগ্রতার সাথে কয়েকদিন সেখানে গিয়ে কাটিয়ে আসবেন।"

এই বারবার তাগিদের কারণ হচ্ছে এই যে, শায়খ সমস্ত দ্বীনী, ইল্মী ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজের জন্য এমন কি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের জন্যও ইখলাস ও লিল্লাহিয়ত—কেবল আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য কাজ করার প্রবণতা। হারারাতে–কুল্বী ও বাতেনী উত্তাপের উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁর মতে এটা হচ্ছে স্টীম বা বাষ্পতূল্য–যা' ব্যতিরেকে দ্বীনের গাড়ি চল্তেই পারে না। একটি পত্রে (২৬শে যিলকাদ, ৬৪ হিজরীতে লিখিত) তিনি লিখেন ঃ

"ইঞ্জিনে আগুনের প্রয়োজন হয় আর লিল্লাহিয়তের আগুন ঐসব দরবারেই কেবল পাওয়া যায়।"

অপর এক পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"আমার এটা নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) যে, সর্ববিধ ফিতনার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিকির, আর সে বিশ্বাসের তাগিদেই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেননা, খানকাহ্ তো দুনিয়া থেকে লোপ পেয়েই বসলো।"[১৫]

তাঁর মতে কমপক্ষে আল্লাহ্‌ওয়ালাদের ব্যাপারে হৃদয়ে কোন প্রকার ক্লেদ বা বিরূপ ভাব থাকা চাই না।এ বক্তব্যটি তাঁর অনেক রচনায়ই বারবার ব্যক্ত হয়েছে। কু-ধারণা, বিরূপভাব এবং তাঁদের প্রতি আপত্তির ভাব অন্তরে পোষণ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত বই الاعتدال فى مراتب الرجال। (আল-ই'তেদাল ফী মারাতীবির রিজাল)-এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

"আমি আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারিগণের (মুরীদানের) দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি এবং তা' সর্বদাই করতে থাকবো যে, তাঁরা যেন আল্লাহ্‌ওয়ালাদের ব্যাপারে মনে কোনরূপ ক্লেদ বা বিরূপভাব পোষণ না করেন। অন্যথায় তাঁরা যেন আমার সাথে সম্পর্ক না রাখেন।"

শায়খের এই পরামর্শ কেবল তাঁর ভক্ত ও ছোটদের প্রতিই ছিল না, তিনি নিজেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে রায়পুর গিয়ে হাযির হতেন এবং দীর্ঘ কয়েক দিন উপর্যুপরি কয়েক বেলা সেখানে থাকতেন। হযরত যখন হযরত সাহারানপুরের ভট হাউসে দীর্ঘকাল ধরে অবস্থান করছিলেন, তখন শায়খ প্রতিদিনই আসরের পর সেখানে গিয়ে হাযির হতেন। হাযিরীতে দেরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে এ সময় তিনি সান্ধ্যকালীন চা-পানের অভ্যাস ছেড়ে দেন, অথচ এটা ছিল তাঁর আজীবন অভ্যাস। হযরত রায়পুরী তা' জানতে পেরে খাদেমদেরকে ভট হাউসে তাঁর চা-পানের ব্যবস্থা করার তাগিদ দেন। কিন্তু শায়খ বারবার বলে সে ব্যবস্থা রহিত করিয়ে দেন। শায়খ তাঁর হিন্দুস্তান অবস্থানের শেষ যুগে সফর তাঁর জন্য বিরাট কষ্টকর ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার সন্ধ্যায় রায়পুর চলে যেতেন এবং সোমবার ভোরে ফিরতেন।[১৬]

অনুরূপ অবস্থা হতো হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মদনীর (র) শুভাগমনে। খবর পেলে রাত জেগে স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং একজন শায়খ ও বুযুর্গের প্রাপ্য সম্মান তাঁকে প্রদর্শন করতেন। হযরত মাওলানা যখন দেওবন্দে অবস্থান করতেন, তখন প্রায়ই সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও কুশালাদি বিনিময় করতেন।

ধর্মীয় কাজে ও জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দান

হযরত শায়খকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি মহান হৃদয় এবং দীনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের কাজে উৎসাহদানের মত উদারতা দান করেছিলেন যে, দীনের জন্য উপাদেয় যে কোন কাজে তিনি সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করতেন। তবলীগী জামাআত, কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী মাদ্রাসা (মাযাহিরুল উলূম, দারুল উলূম দেওবন্দ, নদওয়াতুল উলামা) সমূহের কথা ছাড়াও কোথাও কোন দীনী বা সংস্কারমূলক তৎপরতার কথা জানতে পারলে প্রাণ খুলে তিনি তার প্রশংসা করতেন এবং উৎসাহ দিতেন। আমার আমেরিকায় প্রদত্ত ভাষণসমূহের সংকলন "নঈ দুনিয়া আমেরিকা মেঁ সাফ সাফ বাতেঁ" শায়খ যখন পড়িয়ে শুনলেন, তখন সাথে সাথেই আমাকে পত্রে লিখলেন ঃ

> "আপনার আমেরিকার বক্তৃতাগুলো খুবই ভাল লেগেছে। খুবই মনোযোগ সহকারে শুনেছি, কিন্তু আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না যে, আমেরিকাবাসীরা এ দ্বারা কিভাবে প্রভাবান্বিত হবে! আপনি লাউডস্পীকারে বক্তৃতা করে দিয়েছেন, গুণগ্রাহীরা কিছু সংখ্যক কপি ছেপে দিয়েছেন। আমার অভিমত তো হচ্ছে এই যে, এগুলোকে আরবী ও ইংরেজী ভাষার প্রচুর সংখ্যায় ছেপে প্রচার করতে পারলে খুবই উত্তম হতো। এগুলোর বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। আপনি যদি এ ব্যাপারে কিছু চিন্তা করে থাকেন তবে অবশ্যই জানাবেন। আমার তো মনে হয়, বিত্তবান লোকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে লাখ খানেক কপি ইংরেজী, আরবী ও উর্দুতে ছেপে লোকজনের মধ্যে বিতরণ করা দরকার। লক্ষ্ণৌতে যদি উর্দু সংস্করণ ছাপেন, তা'হলে এক হাজার কপি আমার লাগবে, খরচ যা পড়ে আমি পাঠিয়ে দেবো। ছাপার পর আমার এক হাজার কপি হাজী ইয়াকুবের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"[১৭]

হযরত শায়খ যখন জানতে পারলেন যে, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখনি লিখলেন ঃ

> "শিক্ষক প্রশিক্ষণের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাতে বরকত দিন! এই বরকতপূর্ণ সমাবেশ (অর্থাৎ প্রশিক্ষণরত শিক্ষকগণ) যদি মওজুদ থাকেন, তবে সবাইকে সালাম মসনূন।"[১৮]

অক্টোবর-নভেম্বর, '৮৫ ইং সালে যখন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার ৮৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়, যাতে আরব দেশসমূহের অনেক আলিমউলামা, গুণী ও পদস্থ ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তখন শায়খ শুধু সে সম্মেলনের সাফল্যের

জন্য দু'আ করেই ক্ষান্ত হননি বরং সম্মেলন সাফল্যের সাথে সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ মনোযোগ এদিকেই লেগে ছিল। যাঁরাই সেখানে গিয়েছেন বা সেখান থেকে এসেছেন, তাঁদেরকেই তিনি সেখানকার খবরাখবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। লোকমুখে শুনেছি, শায়খ শোবার সময়ও তাঁর লোকজনকে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে শোনা গেছে। সম্মেলন শেষ হতেই তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানিয়ে পত্র লিখেন–যাতে ভবিষ্যতের জন্য কিছু পথনির্দেশও ছিল। কোন কোন খাদিমকে তিনি এও বলেছেন, তোমরা জানো, এ সম্মেলন কে করিয়েছে? এ সম্মেলন আমি নিজে করিয়েছি।

শুধু কি তাই? যে কোন উপাদেয় ইল্‌মী কাজে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য ও উৎসাহদান ছিল তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থ "নুযহাতুল খাওয়াতির"–এর ৭টি খণ্ড "দায়েরাতুল মা'আরিফ হায়দ্রাবাদ" কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। ৮ম খণ্ডের অনেক স্থানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুসন ও রচনাবলীর স্থান অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের ইন্তিকাল হয়ে যাওয়ায় অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। এ অপূর্ণ স্থানগুলোকে পূর্ণ করে পুস্তকটি রচনার কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব বর্তায় তাঁর দায়িত্বশীল উত্তরাধিকারীদের উপর। কিন্তু কাজটি ছিল দুঃসাধ্য। কেবল লেখকের মৃত্যুর পর যাঁরা ইন্তিকাল করেছিলেন, (অথচ লেখক তাঁদের নামও পুস্তকে তালিকাভুক্ত করে রেখেছিলেন, তাঁদের নামই ছিল কয়েক শ'। এ দীন লেখক দায়েরাতুল মা'আরিফের পরিচালক ডঃ আবদুল মুঈদ খানের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে এ কাজে হাত দেই এবং এ ব্যাপারে জ্ঞানীগুণীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। পত্র-পত্রিকায় এ ব্যাপারে ঘোষণা দেই এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেককেই চিঠিপত্র লিখি। কিন্তু খুব কম পত্রেরই জবাব পেয়েছিলাম এবং খুব স্বল্পসংখ্যক লোকই এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে আমি হযরত শায়খের সাথেও যোগাযোগ করি। মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর সন তারিখ প্রভৃতি লিখে রাখার তাঁর অভ্যাস ছিল। এছাড়া তাঁর "তারীখে কবীর" গ্রন্থেও যথেষ্ট উপাদান মওজুদ ছিল। আমার পত্রের জবাবে তিনি যে পত্র লিখেন তার একটি উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করছি ঃ

> 'আমার মন চায়, 'নুযহাতুল খাওয়াতির' এর পূর্ণতা বিধানের জন্য যেটুকু খেদমত করা যায় সে সৌভাগ্যটুকু হাত ছাড়া না করি। কেননা, এটা হচ্ছে একটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি তো আপনার কাছে নিবেদন করতাম যে, যাঁদের মৃত্যুর তারিখ প্রভৃতি জানতে চান তার একটি তালিকা আমার কাছে

পাঠিয়ে দিন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, চোখ দু'টি সাথে সাথে পা' দু'টি আমাকে এমনি অকর্মণ্য করে দিয়েছে যে, না পারি নিজের গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলো খুঁজে দেখতে, না পারি মাদ্রাসায় যেতে . . . . । 'নুযহা' মুদ্রণের ব্যাপারে আমার আগ্রহের সীমা নেই। আল্লাহ্ করুন, যেন আমার জীবদ্দশায়ই এর মুদ্রণকাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ যদি কোন পড়ে শুনানোর লোকও দান করেন, তবে তা' অবশ্যই পড়িয়ে শুনবো। 'আরকানে আরবাআ'[১৯] পুস্তকখানিও অবশ্যই পাঠাবেন। আল্লাহ্ করুন, পড়ে শুনানোর মতো কোন লোকও যেন জুটে যায়।[২০]

এর পূর্বে লিখিত আর একটি পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"নুযহাতুন খাওয়াতির"-এর ব্যাপারে জনাবের মনোনিবেশ করার জন্য বিশেষভাবে শোকারিয়া আদায় করছি। আল্লাহ্ তা'আলা শঘ্রীই তা' আমাদের হাতে পৌছিয়ে দিন! আমি তো এমনতর বস্তুসমূহেরই রোগী।"

উপাদেয় সমাজ সংস্কারমূলক ও দীনী কিতাবসমূহের ব্যাপারেও তাঁর আচরণ এরূপই থাকতো এবং নিজের হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও এগুলো শুনবার জন্য সময় বের করে নিতেন। এ অধমের নামে লিখিত এক পত্রে তিনি লিখেন ঃ

আপনার "তারীখে দাওয়াত ও আযীমত" গ্রন্থটি এমন এক সময়ে আমার কাছে পৌছেছে যখন আমি একেবারেই গোরের পাড়ে ছিলাম। তখন আমার পক্ষে বসাও মুশকিল ছিল, শুনাও মুশকিল ছিল। কিন্তু আপনার সকল কিতাবের ব্যাপারেই আমার ঐকান্তিকতা থাকে। এজন্যে ৬/৭ দিনের মধ্যেই গোটা গ্রন্থটি শোনা হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন! উম্মতকে এর দ্বারা উপকৃত করুন! বিশেষতঃ সিলসিলাসমূহের যে বিশদ বিবরণ আপনি দিয়েছেন, তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ্ তাআ'লা আপনাকে দীর্ঘায়ু ও নিরোগ স্বাস্থ্য দান করুন![২১]

অনুরূপভাবে যখন প্রিয়বর সায়্যিদ সালমান হুসায়নী নদভী তাঁর জারাহ ও তা'দীল"-এর শব্দাবলী ব্যাখ্যা সংক্রান্ত থিসিসটি-যা' জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদে পেশ করা হয়েছিল-শায়খের খেদমতে পেশ করেন, তখন তিনি আমাকে লিখেন ঃ

প্রিয়বর সালমানের কিতাখানা আমার শিয়রে রেখে দিয়েছি। সময় পেলেই দু'এক পৃষ্ঠা শুনে নিই। গোটা থিসিসটি শুনবার আগ্রহ রয়েছে। আমার পক্ষ থেকে তাঁকে অবশ্যই মুবারকবাদ দেবেন।"

মান্যবর সায়্যিদ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান সাহেব এম. এ. পরিচালক, দারুল মুসান্নিফীন–এর "বযমে–সূফিয়া" সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ

সায়্যিদ সাহেবের "বযমে সূফিয়া" কিতাবখানা দেখে আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবখানাকে জনপ্রিয় করুন এবং পাঠকদেরকে তা থেকে সর্বাধিক উপকৃত করুন! আমি ফরমান পাঠিয়েছি যেন আমার নামে এক কপি ভিপি যোগে পাঠিয়ে দেয়া হয়।২২-২৩

অন্য এক পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"বযমে–সূফিয়া" কিতাখানি পৌছে গিয়েছে এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও অতি কষ্টে তা' পড়িয়ে শুনেছি।"

নির্ভুল মতামত, দূরদর্শিতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি

শায়খের পরিচিত মহলে বরং দেওবন্দী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণকারী মহল, মাদ্রাসাসমূহ এবং সমকালীন শায়খদের মধ্যে তাঁর নির্ভুল মতামত, দূরদর্শিতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির কথা একবাক্যে স্বীকৃত। সংকটজনক ও নাজুক মুহূর্তে তাঁর মতামতকেই সিদ্ধান্তকরী রায় বলে মেনে নেয়া হতো। এ লেখককেও নিজের ব্যক্তিগত ও দারুল উলূমের অনেক সংকটময় মুহূর্তে শায়খের মূল্যবান পরামর্শ চাইতে হয় এবং তাঁর নির্ভুল মতামত ও প্রত্যুৎমতিত্ব প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়।

তাঁর এই নির্ভুল মতামত প্রদানের ক্ষমতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে তবলীগী জামাআতের আমীররূপে মাওলানা ইনামুল হাসানকে মনোনয়ন দান। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের ইন্তিকালের পর একটি মহলের চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কলিজার টুকরো দৌহিত্র মওলবী মুহাম্মদ হারূনকে তাঁর দাদা ও আব্বার স্থলবর্তী করে আমীর পদে মনোনীত করেননি। (অথচ মেওয়াতবাসীদের একটা আবেগের সম্পর্ক তাঁর সাথে ছিল।) এ যুগের নাজুক পরিস্থিতি ও ফিতনা–ফাসাদের প্রেক্ষিতেই তিনি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের প্রাক্তন সহকর্মী ও দক্ষিণহস্ত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবকে আমীর মনোনীত করেন। জ্ঞানবুদ্ধি, বয়স ও অভিজ্ঞতায় কেবল তিনিই পারতেন জামাআত ও তার কার্যধারার সঠিক পথনির্দেশ দিতে। শায়খের এ মনোনয়নের বিরুদ্ধে কেউ কেউ প্রতিবাদও করেছেন এবং দিল্লীর কিছু উচ্চপদস্থ লোক শায়খের এ সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করারও চেষ্টা করেন, কিন্তু শায়খ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা এবং

তবলীগের বর্তমান বিশ্বজনীয় প্রসার ও উন্নতি তাঁর সে মনোনয়নের [২৪] নির্ভুলতাই প্রমাণ করছে।

এছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর নির্ভুল পথনির্দেশ, তীক্ষ্ণদর্শিতা ও দূরদর্শিতা জামাআতকে অনেক সঙ্কটজনক মুহূর্তে বিভিন্ন ফিতনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করেছে।

মাদ্রাসা মাযহিরুল উলূমের পরিচালকগণ সর্বদাই তাঁর নির্ভুল ও দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁরই দূরদর্শিতার জন্যে অনেক অকারণ সংকট এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। ভুল ও তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের ফলে এসব ক্ষেত্রে নানা সমস্যার উদ্ভব হতে পারতো। এ বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর 'আপবীতী'র পৃষ্ঠাসমূহে ছড়িয়ে রয়েছে।

অতিথি পরায়ণতা

অতিথিপরায়ণতা যদিও সকল বুযুর্গান ও মাশায়েখেরই প্রতীকধর্মী গুণ, এবং তাঁদের দস্তরখানসমূহের বিস্তৃতির কথা নিজ নিজ যুগে প্রবাদ বাক্যের মতই মশহুর ছিল এবং স্বয়ং শায়খের যুগেই বিভিন্ন খানকাহ ও ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহে সর্বদাই মেহ্–মানের ভিড় লেগেই থাকতো, এতদসত্ত্বেও শায়খ মশহুর হাদীছ ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ

–"যে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উচিত মেহ্মানের সম্মান এ সমাদর করা।"–এর উপর যেভাবে আমল করতেন তার নযীর মেলা ভার। তিনি অতিথিপরায়ণতাকে ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং সদাচার ও মনস্তত্ত্বের একটি বিজ্ঞানের রূপ দান করেন।

হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকূব সাহেব মুজাদ্দেদী ভূপালী (র.) একদা বলেন, "দু'টি কাজ ছিল বড় ইবাদত, একটি বিবাহ, অপরটি আহার। এখন উক্ত দু'টি ব্যাপার থেকেই দ্বীন ও শরী'আতের বিধিনিষেধ এবং ঈমান ও ইহ্তেসাবের রূহ বিদায় নিয়েছে। আহারের মাহাত্ম্য এবং তার ইবাদত হওয়ার ধারণাটি শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের এখানে তখনো অবশিষ্ট রয়েছে দেখলাম। একদিন দুপুরের ভোজনে আমি তাঁর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। সিল্সিলা ও মাশায়েখের আত্মীয়তাবন্ধনের এক আত্মীয় আগন্তুক আহারের সময় কোন একটি মামলা বা আদালতের রায়ের প্রসঙ্গ তুলতেই শায়খ বললেন, এখন খান তো, তারপর ওসব শুনা যাবে খন।"[২৫]

শায়খের দরবারে মেহমানের সংখ্যাধিক্য ও রকমারি খাবারই কেবল থাকতো না, তিনি প্রিয় অতিথিদের সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাঁদের প্রিয়খাবার সম্পর্কে জানবার এবং তা সরবরাহের চেষ্টা করাকেও জরুরী বিবেচনা করতেন। তাঁর অনেক প্রিয় ও সম্মানিত মেহমানেরই সে অভিজ্ঞতা থাকার কথা। লেখক তাঁর নিজ অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করছেন। শায়খের দরবারে আমার যাতায়াত যখন থেকে শুরু হলো এবং শায়খ আমার প্রিয় আহার্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে জানতে পারলেন–যা' সাধারণতঃ আমি নিজ বাড়িতে খেয়ে থাকি–আমার আগমনের পূর্বেই সেগুলো সংগ্রহ শুরু হয়ে যেতো। দস্তরখানে সেগুলো হাযির থাকবে না, তা যেন ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। একবার ভুলবশতঃ আমি লিখে জানিয়েছিলাম যে, নাসিকারোগের জন্য গোশ্ত খাওয়া আমার জন্য নিষিদ্ধ। শায়খ পত্রখানি পড়েই নিজামুদ্দীনের জনৈক হোটেল মালিক বাবু আয়াযকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেবল তরিতরকারী দিয়ে কতরকমের ব্যঞ্জন তৈরী হতে পারে? ঘটনাচক্রে বাবু আয়ায তখন শায়খের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন ২/৪ প্রকার হতে পারে। শায়খ নিজ ঘরে তাঁর মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা ৮/১০ রকমের ব্যঞ্জনের কথা বললেন। শায়খ অত্যন্ত খুশী হলেন এবং সব রকমের ব্যঞ্জনই তৈরী করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। সর্বোপরি, আজীবন গোশ্তে অভ্যস্ত শায়খ আমি যে কয়দিন ছিলাম নিজেও গোশ্ত বাদ দিয়ে কেবল শাকসবজী খেয়েই দিন কাটান। এতো গেল খাদেমদের সাথে তাঁর আচরণের কথা। মাশায়েখ ও বুযুর্গানের কেউ তাঁর মেহমান হলে তিনি যে কী করতেন তা' সহজেই অনুমেয়।

মেহ্মানদের সংখ্যা কখনও কখনও শত শত এবং রমযানে হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। কিন্তু তাতে কোনই অসুবিধা বা পেরেশানী বা বিশৃংখলা দেখা দিত না, আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য তাঁকে মাওলানা নসীরুদ্দীনের মতো একজন অকপট সহায়ক সহকর্মী দান করেছিলেন। ইনি সকল প্রকার আহার্যের ব্যবস্থা করতেন। খানা পাক হয়ে আসতো মাদ্রাসার বাবুর্চীখানা থেকে। বিশিষ্ট মেহ্মানদের জন্য কিছু খানা ঘর থেকেও পাক হয়ে আসতো। শায়খ গোটা দস্তরখানের দেখাশোনা করতেন। মেহ্মানদেরকে তাদের মর্যাদা–অনুপাতে انزلوا القوم منازلهم (প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুপাতে আচরণ কর") অনুসারে বসাতেন। তাদের প্রিয় আহার্য বস্তু তাদের সম্মুখে রাখতেন। যদিও তিনি আগাগোড়া দস্তরখানে বসা থাকতেন, এক এক জামাআতে (শায়খের পরিভাষায় এক এক পিড়ি) খেয়ে উঠতেন, অপর জামাআত খেতে বসতেন। শায়খ খাওয়ার সময় তাদের সবাইকেই পূর্ণ সময় সাহচর্য দিতেন এবং বাহ্যতঃ মনে হতো, সবাইর সাথে বুঝি তিনি

খাচ্ছেন, কিন্তু একটু গভীরভাবে শায়খের প্রতি যাঁরা খেয়াল করতেন, বুঝতে পারতেন শায়খ আসলে খুব অল্পই আহার করছেন।

সেই দস্তরখানের একটা আদব ছিল এই যে, যার সামনে যে আহার্য বা চায়ের পেয়ালা রাখা হতো তার জন্য তা' অন্যের দিকে বাড়িয়ে দেয়া চলতো না। কেননা, তাতে পরিবেশকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকতো। তারা ভাবতেন, একজন বুঝি খেয়ে সেরেছেন, অথচ আসলে হয়তো তিনি তা' অপরকে দিয়ে দিয়েছেন, অথচ খাদেমরা তা হয়তঃ টেরও পাননি। এরূপ ক্ষেত্রে শায়খ বলতেন, এখানকার ব্যবস্থাপনা এখানকার লোকদের হাতে, আপনারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে চাইলে নিজ ঘরে গিয়ে তা' করবেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শায়খের এ কড়াকড়িই ছিল যুক্তিসঙ্গত। অনেক সময় তাঁর এ কড়াকড়ি অনেক সময় আমীরানা মেজাজের লোকদের মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ হয়ে যেতো। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে শায়খ তাঁদের এ অসন্তুষ্টির পরোয়া করতেন না।

দীনী মাদ্রাসাসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা

শায়খের শিক্ষাদীক্ষা, চরিত্র গঠন, কামালত অর্জন 'সবই সম্পন্ন হয়েছে (এক আরবী দীনী) মাদ্রাসায়, মাদ্রাসার পরিবেশে এবং মাদ্রাসার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বুযুর্গানেরই কোলে। আর তিনি একটি আদর্শ মাদ্রাসার সেই স্বর্ণযুগ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যখন মাদ্রাসার শিক্ষক পরিচালকগণ ইখলাস ও লিল্লাহিয়ত, ত্যাগ-তিতিক্ষা তাকওয়া পরহেযগারীর মূর্ত প্রতীক এবং শিক্ষার্থিগণ সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসু, পরিশ্রমী এবং ভক্তি ও আনুগত্যের মূর্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন। এজন্য মাদ্রাসাই ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা এবং আশা আকাঙক্ষার কেন্দ্র এবং আত্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্র। তিনি এই মাদ্রাসাকেই ধর্মীয় শিক্ষার সংরক্ষণ, মুসলমানদের ধর্মীয় পথনির্দেশ দান এবং বিকৃত আকীদাবিশ্বাস থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় বলে বিবেচনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর "আপবীতী"-এর পুস্তক সিরিজ মাদ্রাসার সেই যুগের স্মৃতিকে জাগ্রত ও সেসব বৈশিষ্ট্যকে পুনর্জাগ্রত করার লক্ষ্যেই প্রণীত। উক্ত গ্রন্থগুলির অধিকাংশ পৃষ্ঠাই এ বিষয়টি জুড়ে রয়েছে।

এ জন্যেই বিশুদ্ধ মতাদর্শ ও চিন্তাধারায় প্রচলিত প্রতিটি মাদ্রাসার জন্যই তাঁর অন্তরে ছিল অফুরন্ত দরদ। এগুলোর মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য বা অন্তর্কলহ ছিল তাঁর কাছে একান্তই অসহনীয়। আর এ জন্যই কবীরা গুনাহ্সমূহের পর যে কর্মটি তাঁর কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত ও ক্রোধসঞ্চারকারী ছিল তা' হচ্ছে কোন ধর্মীয় মাদ্রাসায় ধর্মঘট।[২৬]

কিন্তু সেই যে কোন আরবী কবি বলেছিলেন ঃ

ما كل ما يتمنى المرأ مدركه
تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن

"মানুষ যা' চায় সবকিছুই হয় না তাহার অনুকূলে
কত বায়ু যায় না বয়ে নৌকা–পালের প্রতিকূলে।

যুগের হাওয়া ও অরাজকতার প্রভাব থেকে দীনী মাদ্রাসাগুলোও আত্মরক্ষা করতে পারলো না। তাই এ মাদ্রাসাগুলোতেও প্রতিবাদ, ধর্মঘট, শোভাযাত্রা শুরু হয়ে গেল। ১৩৮০ হিজরী/১৯৬০ ইং সালে দারুল উলূম দেওবন্দে ধর্মঘট শুরু হলো। দীর্ঘকাল ধরে এ বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা চলতে থাকে। পরিস্থিতির এ পতন লক্ষ্যে শায়খ মজলিসে শুরা থেকে ইস্তেফা দিয়ে দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আর তাতে শামিল হননি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ১৩৮২ হিজরী/১৯৬২ ইং সালে স্বয়ং মাযাহিরুল উলূমে ধর্মঘট হলো। শায়খ তাতে অত্যন্ত মর্মাহত হন। এ সময় তিনি প্রায়ই উর্দু কবিতার একটি পংক্তি আওড়াতেন এবং ঘনিষ্ঠজনদের কাছে লিখিত পত্রে উদ্ধৃত করতেন। সে পংক্তিটি হলো ঃ

وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے
کہ جو منزل بہ منزل اپنی محنت رائگاں دیکھے

অর্থাৎ– আশাহত আকাশ পানে চায় না কেন উদাস চোখে?
যে না তাহার শ্রমের ফসল প্রতি পদে নষ্ট দেখে!

কেবল মাদ্রাসা মাযাহিরুল উলূমই নয়, যেকোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হলে তিনি তা অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং ধর্মঘটে নেতৃত্বদানকারীদের প্রতি কোন দিনই তিনি প্রসন্ন হতে পারতেন না। এ জাতীয় ছাত্রদেরকে তিনি কোনরূপ ধর্মীয় মর্যাদা লাভের উপযুক্ত বিবেচনা করতেন না। ১৯৭০ ইংরেজীর মে মাসের মধ্যভাগে (১৩৯০ হিঃ) যখন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার ধর্মঘটের খবর পেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং যারা এ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছ বলে কোন সূত্রে খবর পেয়েছেন তাদের প্রতি আর কোন দিনই প্রসন্ন হননি।

শিক্ষার্থিগণকে হাদীছের সিলসিলাভুক্ত করা বা ইজাযত দান কালেও কোন কোন সময় লিখে লাগিয়ে রাখা হতো বা ঘোষণা করে দেয়া হেতো যে, যারা কোন মাদ্রাসার ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা এ তালিকায় গণ্য হবেন না, ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হবেন। খিলাফত বা ইজাযত প্রদান করলেও সর্বদাই তিনি এদিকে

খেয়াল রাখতেন যে, যে ব্যক্তি কোন দিন কোন ধর্মঘটে অল্পবিস্তর অংশগ্রহণ করেছে, তাকে কোনমতে যেন এ সম্মান প্রদান করা না হয়; বরং এমন ব্যক্তিকে মুরীদরূপে বয়'আত করতেও তিনি সম্মত হতেন না। এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ এমন বীরপুঙ্গবদের সাথে আমি বয়'আতের সম্পর্ক রাখতে চাইনা।[২৭]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হযরত শায়খের জীবনের অন্তিম পর্যায়ে দারুল উলূম দেওবন্দের মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা তাঁর অন্তরে একটি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে তাঁর হেজাযে অবস্থানকালেও তিনি এ নিয়ে কত চিন্তিত ছিলেন। এ বিরোধ তার শেষপ্রান্তে উপনীত হওয়ার প্রাক্কালে একটি পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"দেওবন্দ ও সাহারানপুরের ব্যাপারটি নিয়ে অহরহ ভাবি যে, আমার মুরুব্বীদের দু'টি বাগান। কত শলাপরামর্শ, পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা মুরুব্বীগণ তা লাগিয়েছিলেন! আর আমরা অযোগ্য উত্তরসূরিরা কিভাবেই না তা বরবাদ করতে লেগে গেছি! فالى الله المشتكى আল্লাহ্‌রই কাছে ফরিয়াদ!

মুরুব্বীগণ বলতেন যতদিন ইখলাস বা নিয়্যাত পরিচ্ছন্ন থাকবে, ততদিন তা' ফলেফুলে পল্লবিত হতে থাকবে, আর যখন তাতে ভাটা পড়বে, তখন তা উজাড় হয়ে যাবে। সে দৃশ্যই আজ চোখে পড়ছে![২৮]

তারপর ২৪শে রমযান, ১৪০০ হিজরী তারিখের পত্রে লিখেন ঃ

আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং দেওবন্দের ব্যাপারে আলাপ করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। এদিকে কেউ আসলে সে কথা জিজ্ঞাসা না করে পারি না। শুনে বড়ই ব্যথা পাই। হায়, যদি এঁরা হযরত নানুতবী (র.), হযরত গাঙ্গুহী প্রমুখ বুযুর্গানের জীবনীগুলো পড়েই দেখে নিতেন তবে কতই না উত্তম হতো! আমার তো ইচ্ছে হয় যে এরা যেন ঐ হযরতগণের জীবনী ছাড়া আর কিছুই না পড়েন!

হিজাযে অবস্থানের শেষ পর্যায়ে হিন্দুস্তান থেকে কেউ আসলে বা এমন কোন ব্যক্তি যার উক্ত মাদ্রাসাসমূহের সাথে সামান্যতম সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল দেখা পেলেই তিনি সর্বপ্রথম দেওবন্দের পরিস্থিতি সম্পর্কেই জানতে চাইতেন। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, তাঁর জীবদ্দশায় বিষয়টির সন্তোষজনক সমাধান হয়নি নতুবা তিনি কতই না খুশী হতেন। আশা করা যায়, তাঁর আন্তরিক দু'আসমূহের সুফল শীগগিরই ফলবে এবং দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতাদের সদুদ্দেশ্য ও তার মুখলিস

কর্মচারীদের সংকল্প অনুযায়ী দীনের কাঙ্ক্ষিত খিদমত ও ইল্‌মে দীনের প্রচার প্রসারের সংবাদ পেয়ে ওপার থেকে তাঁর পবিত্র 'রূহ' শান্তি ও আনন্দ লাভ করবে।'

গুরুজন ও উস্তাদ–মাশায়েখের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ–মমতা

হযরত শায়খের একটি অন্যতম গুণ ছিল আপন সিল্‌সিলার মাশায়েখ ও মুরব্বীদের পূর্ণ আনুগত্য, তাঁদের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসার এবং তাঁদের ইলমী ও দীনী ফয়েযসমূহকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার সযত্ন প্রচেষ্টা। এ যুগে এ ব্যাপারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

তাঁর উক্ত প্রেরণাই তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে হযরত গাঙ্গুহীর বুখারী শরীফের যে তকরীরসমূহ তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর সাথে একটি জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা ও পাদটীকা জুড়ে দিয়ে 'লামেউদ্‌দেরারী' (لامع الدرارى) নামে অত্যন্ত শানশওকতের সাথে প্রকাশ করতে। আরব দেশসমূহে কিতাবখানিকে পরিচিত করার মানসে তিনি এই অধমকে দিয়ে কিতাবখানার একটা পরিচিতি ও ভূমিকা লেখান।

অনুরূপভাবে হযরত গাঙ্গুহীর তিরমিযী শরীফের যে তকরীরসমূহ মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, সেগুলিকে "আল কাওকাবুদ দুর্‌রী 'আলা জামিইৎ–তিরমিযী (الكوكب الذى على جامع الترمذى) নামে প্রকাশ করেন এবং তার ভূমিকা লেখার জন্য আমাকে আদেশ করেন।

মাওলানা খলীল আহমদ সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ "বাযলুল মজহূদ" (بذل المجهول) ছাপার জন্য তিনি এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, মনে হচ্ছিলো এ কিতাবখানা ছাপা ছাড়া তিনি কোনমতেই স্বস্থি পাবেন না। যাঁরা এ কাজে শায়খের সামান্যতম সহাযোগিতা করতেন, শায়খ তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হতেন এবং দু'আ করতেন। এটা মুরব্বীদের প্রতি তাঁর প্রাণের টানেরই পরিচায়ক এবং শায়খের উন্নতি ও মক্‌বুলিয়তেরও যে এটা একটা অন্যতম হেতু ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মুরব্বীগণের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসার ছাড়াও তিনি তাঁদের জীবনী প্রণয়ন ও প্রচারেও পূর্ণ সচেষ্ট থাকতেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রিয়বর মওলবী মুহাম্মদ আলী নদভীকে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেবের একটি জীবনী পুস্তক আধুনিক আঙ্গিকে রচনার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ

তওফীক দানও করেন এবং তিনি "হায়াতে খলীল" নামক গ্রন্থটি ১৩৯৬ হিঃ/১৯৭৬ ইং সনে লিখে শেষ করেন, লেখক তা' কিছু কিছু করে লিখে হযরত শায়খের খেদমতে পাঠিয়ে দিতেন। হযরত শায়খ তাঁকে লিখেন ঃ

"বাদ সালাম মসনূন। তোমার সংকলিত "হায়াতে খলীল"-এর পাণ্ডুলিপি মদীনা শরীফে পৌঁছে আনন্দ দান করে। আমি তা পড়িয়ে শুনে শুনে সেখান থেকেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেই। আল্লাহ্ তোমার এ শ্রমকে কবুল করে উভয় জাহানে তোমাকে তরক্কী দান করুন। মাশাআল্লাহ্! তুমি বেশ পরিশ্রম করে অনেক গবেষণা অনুসন্ধান করে জীবন-বৃত্তান্ত সংকলিত করেছো।"[২৯]

আমার হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.) ও হযরত মাওলানা আবদুল কাদির সাহেব রায়পুরী (র.)-এর জীবনী রচনায়ও হযরত শায়েখের ইঙ্গিত, পরামর্শ ও নির্দেশনা আগাগোড়া সক্রিয় ছিল। সেখানেও গুরুজনের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি প্রতিপদে প্রেরণাদায়ক শক্তিরূপে কার্যকরী ছিল। ভক্তির এ ফল্গুধারা তাঁর দেহের প্রতিটি শিরায় উপশিরায় প্রবহমান ছিল। তারপর হযরত শায়খেরই হুকুম ও ইশারায় প্রিয়বর মুহাম্মদ আলী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ও অকাল মৃত্যুর শিকার তাঁর সুযোগ্যপুত্র মওলাবী মুহাম্মদ হারূনের জীবনী লেখে হযরতের সন্তুষ্টি ও দু'আ হাসিল করেন।

কেবল গুরুজনের বেলায়ই নয়, যে কেউ হযরত শায়খের কোন কাজে একটু সাহায্য সহযোগিতা করতেন, বা তাঁর কোন উপকার করতেন, তার প্রতিই তিনি এমনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করতেন যে, সে ব্যক্তি রীতিমত সঙ্কোচবোধ করতো। তাঁর ৮৯ হিজরীর হিজায সফরের সময় তাঁর খাদেমদের ভিসা লাভের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সাথে পূর্বপরিচিতির সুবাদে আমি যৎসামান্য উপকার করার সৌভাগ্য অর্জন করি। উক্ত খাদেমদের সাহচর্য শায়খের জন্য বেশ সহায়ক ও আরামদায়ক হয়। এর জন্য হযরত শায়খ হিজায থেকে এ অধমের নামে যে পত্র প্রেরণ করেন, তা' পাঠ করলে এখনো লজ্জায় অধোবদন হয়ে যেতে হয়। তিনি তাতে লিখেন ঃ

"মোটেও একটু বাড়িয়ে বা বানিয়ে লিখছি না যে এবার হাজিরীর পর সালাত ও সালাম পেশ করার পর আপনার দর্জা বুলন্দ ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর দু'আ করেছি। লিখতে তো সংকোচ বোধ করি, এবার কেবল আপনার জন্যেই হাযির হতে পেরেছি। তাই যদি তাতে কোন নেকী হয়ে থাকে, তবে না বললেও তাতে আপনার একটা অংশ আছে। আপনার উপকারের প্রতিদানে আমি দু'আ

ছাড়া আর কীই বা করতে পারতাম? আর مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ "যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়" এ পবিত্র বাণী অনুসারে আপনার খেদমতেও তা' আরয করে দিলাম।৩০

প্রায় সকলের সাথে তাঁর আচরণ এরূপই ছিল। দু'আ করা সম্পর্কে একদা তিনি বললেনঃ এবার হিজায গিয়ে হেরেম শরীফে বাল্যকালের পুরনো পুরনো লোকদের কথা স্মরণ হলো। কান্দেলায় এক ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য আসতো। (অথবা বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তায় বসে থাকতো) তার কথাও স্মরণ হলো। আমি তার জন্যও দু'আ করলাম। শায়খের এই প্রাণপ্রাচুর্য ও প্রীতিবাৎসল্য দেখে সেই পুরনো বাক্যটিই স্মরণ পড়ে গেল ঃ

اولئك قوم لا يشقى بهم جليسهم

—"এঁরা হচ্ছেন সেসব মহান লোক, যাদের পার্শ্বে বসা লোকও কোনদিন বঞ্চিত থাকে না।"

প্রীতি বাৎসল্য ও আন্তরিকতা

শায়খের প্রকৃতিতে (সত্যিকারের মাশায়েখ ও নায়েবীনে রাসূলের সুন্নত মুতাবিক ভক্ত-মুরীদানের প্রতি এমনি স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্য গচ্ছিত ছিল-যা' অনেক সময় মায়ের সন্তানবাৎসল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। জনৈক তীক্ষ্ণদর্শী মেহ্‌মান৩১ কয়েকদিন সে লীলাখেলা প্রত্যক্ষ করে এবং তার স্বাদ উপভোগ করে, বাড়ি ফিরে এমনি পত্র লিখলেন যা'তে সে সত্যের অভিব্যক্তি ঘটেছিল। অনেক ভক্তমুরীদ ও খাদেমেরই সে অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

يَحْسَبُ كُلُّ جَلِيْسٍ أَنَّهُ أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ صَاحِبِهِ

এ দীন লেখক (অত্যন্ত সংকোচের সাথে) এ ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছে যাতে তাঁর বাৎসল্যের একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

এ দীন লেখকের যখন চোখে পানি আসা এবং এক চোখে অস্ত্রোপচার বিফল হয়ে যাওয়ায় দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা দেখা দিল, তখন তিনি বলেছিলেন "দেখ, আমি তোমাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছি, সফর হিজাযেরই হোক, আর ইউরোপ-আমেরিকা বা দেশের অভ্যন্তরের কোথাকারই হোক, একাকী সফর আর করা যাবে না। আমন্ত্রণকারীদেরকে স্পষ্ট লিখে দিও যে, আমার দু'জন সফরসঙ্গী অবশ্যই সাথে থাকবে। দু'জনের ব্যবস্থা যদি একান্তই না হয় তবে একজন তো অবশ্যই সাথে

থাকতে হবে। এটা আমন্ত্রণ গ্রহণের পূর্বশর্ত। যদি তাঁদের প্রয়োজন হয়, শতবার ভাববে, নতুবা (شما بخير ما بسلامت) আপনারাই স্বচ্ছন্দে থাকুন, আমাকেও স্বচ্ছন্দে থাকতে দিন" সাবধান, এব্যাপারে যেন অন্যথা না হয়"।

একবার হায়দ্রাবাদে একাকী বিমানে সফর করি। সেখানে এক সীরাতুন্নবী সভায় বক্তৃতার ডাক পড়েছিল। এখানকার সঙ্গীসাথীরা দিল্লী বিমানঘাঁটিতে গিয়ে বিমানে উঠিয়ে দেন, ওখানকার বন্ধুবান্ধবরা বিমান থেকে নামিয়ে নেয়। তারপর ফেরৎ আসার সময় তাঁরা আবার বিমানে উঠিয়ে দেন। শায়খের কানে এখবর পৌঁছতেই আমার নিকট কৈফিয়ত তলব করে বসলেন ঃ

"আমার বারণ করা সত্ত্বেও কেন আবার একাকী সফর করা হলো?" একবার মদীনা তাইয়িবা থেকে হযরতের সাথেই একত্রে মক্কা মুয়ায্যামায় গিয়ে পৌঁছলাম। সময়টি ছিল রাতের বেলা। ভাই সা'দীর বাড়িতে পৌঁছেই আমার চোখের ব্যথা থাকে বলে আমাকে আদেশবলে শুইয়ে দিলেন এবং কেউ যাতে শোরগোল করে ঘুমের ব্যাঘাত না করে এজন্যে কঠোরভাবে বলে দিলেন। নিজে চলে গেলেন উমরা করতে আর আমাকে বললেন, 'তুমি কাল দিনের বেলা উম্‌রা করবে।' মদীনা তাইয়িবার অবস্থানের সময় যখন আমি সকালবেলা যিকিরের মজলিসে গিয়ে হাযির হতাম, তখন তিনি দৈনিক ঠিক যিকিরের অবস্থায়ই এক চামচ তেলানো ডিম আর এক চামচ খামীরা মুখে তুলে দিতেন। ঐ সময় যদি আমার রিয়াদ সফরের কোন প্রোগ্রাম হতো, তা'হলে খাদেমদেরকে বলে দিতেন, 'আলী মিয়ার যতদিন রিয়াদ থাকতে হবে ততদিনের খোরাকী সাথে দিয়ে দাও।'

দীর্ঘকাল পরেও মক্কা মুয়ায্‌যমা বা মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে হাযির হলেও হযরত তা' ভুলে যেতেন না। খাদেমদেরকে ঠিকই খামীরা পরিবেশনের নির্দেশটি দিয়ে দিতেন। মদীনা তাইয়িবায় অবস্থানকালে আমার কাছে যদি রাবেতা বা মদীনা ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়ের গাড়ি না থাকতো, তা' হলে পাঁচওয়াক্ত জামাআতে নামায পড়ে আমি কি করে বাসস্থানে পৌঁছবো, হযরতের সে ভাবনা থাকতো। তারপর যখন জানতে পেতেন যে, ব্যবস্থা একটা হয়েছে, কেবল তখনই চিন্তামুক্ত হতেন। আমার অপর চক্ষুর অপারেশনের ব্যাপারে আমার চাইতেও হযরতের ভাবনা বেশি বলে মনে হতো। তাঁরই নির্দেশে আমি আমেরিকায় চোখের অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তারপর যখন টেলেক্সের মাধ্যমে আমি জানালাম যে, ১লা জুলাই ১৯৭৭ ইং তারিখে ফিলাডেলফিয়ায় (আমেরিকা) আমার চোখের অপারেশন হতে যাচ্ছে,

তখন তাৎক্ষণিকভাবে[৩২] হযরত উপস্থিত খাদেমদেরকে হেরেম শরীফে দু'আর ব্যবস্থা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজেও দু'আয় মশগুল হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ অপারেশন সফল করেন। এ জাতীয় ঘটনা খাদেমদের অনেকের ব্যাপারেই ঘটে থাকবে। আমি কেবল তাঁর প্রীতিবাৎসল্য ও আন্তরিকতা সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার জন্য এ কয়টি ঘটনা বর্ণনা করলাম।

নির্জনতাপ্রিয়তা

এমনিতে তো হযরত শায়খ আজীবন শিক্ষকতা, ওয়াযনসীহত, সভা-সমাবেশ ও আগন্তুক-মেহ্মানদের ভিড়ের মধ্যেই অতিবাহিত করেছেন, যেমনটা ইতিপূর্ব বর্ণিত হয়েছে। শেষ জীবনে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যন্ডের এমনি সফর করেন-যাতে ভক্ত অনুরক্তের দল পতঙ্গ ও পিপীলিকার মত তাঁর চতুর্পার্শ্বে এসে ভিড় জমায়। হযরত শায়খ কেবল যে তা'তে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন, তা-ই না, বরং পরম উৎসাহে তাদেরকে ওয়ায-নসীহত ও দীক্ষা দান করেছেন এবং কাউকে একটুও অনুভব করতে দেননি যে, এমন ভিড় লোক সমাগম তাঁর সহজাত প্রকৃতির ঘোর বিরোধী।

কিন্তু নিজস্ব সহজাত প্রবৃত্তি ও পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার সতর্কতামূলক ব্যবস্থার দরুন গোড়া থেকেই শায়খ নির্জনতা-প্রিয় হয়ে গড়ে উঠেন। তারপর আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় সে প্রবণতা আরো শাণিত হয়ে উঠে। এখানে তাঁর কতিপয় পত্র ও রচনার কিছুটা উদ্ধৃতি[৩৩] পেশ করছি যাতে তার সে সহ-জাত প্রবণতা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে।

"সমাবেশ আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ, কোন সমাবেশে আমার যোগদান আমার জন্য একটা বিরাট মুজাহাদা স্বরূপ। এমনকি আমার নিজ কক্ষেও যদি আমি একাকী থাকি আর দরজার খিল খোলা থাকে, তবে তা আমার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর ঠেকে। আর যদি ভিতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ থাকে তবে আমি স্বস্থিবোধ করি। কেবল সভা সমিতিতে অংশগ্রহণেই নয়, কোন পর্ব বা উৎসবে যেতেই আমার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

قفس والیهم ویس راه چمن از ما چه می پرسی

کنج پیش از بال و پر برداشتند از آشیاں مارا [৩৪]

যৌবনের দিনগুলোর কথা খুবই স্মরণ পড়ে যখন আমি ছিলাম আর আমার

কামরা ছিল, কোন আদম বা আদম-সন্তান আমার ধারে থাকতো না। আর আজ? নিজের অসহায়তাই দু'তিন জনের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। কারো সাহায্য ছাড়া উঠে প্রশ্রাব করাও তো মুশকিল হয়ে যায়। তার উপর সর্বক্ষণ মানুষের ভিড় আমার অবস্থাকে আরও নাজুক করে তোলে!

باغ میں لگتا نہیں جنگل میں گھبراتا ہے دل
کس جگہ لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم

কোলাহলে মন মজেনা বিজন বনেও ভীতি মনে
এমন পাগল কোন খানেতে রাখব নিয়ে সঙ্গোপনে।

আপনি যদি ঠাট্টা বলে মনে না করেন, তবে সত্যি পরামর্শের জন্য লিখছি, আমাকে এমন কোন জায়গার সন্ধান দিন যেখানে দু'তিনজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া-আর আল্লাহ্ যদি শক্তি দিয়ে দেন তবে তাদেরকেও ع ف د অপর কেউ আমার কাছে আসবে না। লা হাওয়া ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।৩৫

আজকাল আমার এক অদ্ভুত অবস্থা যাচ্ছে। কবির ভাষায়

گفتگو ائین در ویشی نبود
ورنه باتو ما جراها داشتیم

"ফকীরদের কথা বলার রীতি নেই,
নয়তো আমার বলার কথার কমতি নেই।"

মনমেজাজ এমনি নির্জনতা-প্রিয় হয়ে চলেছে যে, তাতে হযরত রায়পুরী (র.)-এর কথাই মনে পড়ছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে মীর সাহেব৩৬ ও রাও ইয়াকূব আলী খানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন; এর সাথে অনর্থক বক বক করতে থাকবেন এবং ধমক দিলেও তার পরওয়া করবেন না, নতুবা পরে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে যে, ছিলেন কোথায়।৩৭

'তবিয়তের ব্যাপারে আমার নিজেরই বুঝে আস্ছে না যে, হচ্ছেটা কী? আশা আকাঙ্ক্ষার কোন জায়গা আর বাকী নেই। আর এদিকে রোগব্যাধি বিশেষ করে পা দু'টি এমনি অচল অসহায় করে রেখেছে যে লোকজন ছাড়া এক মিনিটও একটু নিরিবিলি কাটাবার উপায় নেই। এজন্য নির্জনবাসের আশার গুড়েও বালি!....... বড়রা একে একে সবাই চলে গিয়েছেন। এমন কোন স্থানও নেই যে,

دل چاهتا هے در په کسی کے پڑا رهوں * سر زیر بارمنت کئے هوئے

"মনটি যে চায় পড়ে থাকি কারো দ্বারে
নিজেরে সব বিলিয়ে দিয়ে উজাড় করে।"

رهئے اپ ایسی جگه جا مر جهاں کوئی نه هو * هم نفس کوئی نه هو اور هم زبان کوئی نه هو
پڑئے گر بیمار تو کوئی نه هو تیماردار * اور جو مر جائے تو نوحه خواں کوئی نه هو

"ঠাঁই করে নাও এখন তুমি এ ভুবনের এমন ঠায়,
নিজের মত কেউ না থাকে গল্প করার কেউ না পায়
রোগেশোকে দেখা শোনার কেউ সেখানে রইবে না,
মরে গেলে কান্নাকাটি কেউ সেখানে করবে না।"

—এর উপর আমল করাও সম্ভবপর হচ্ছে না।[৩৮]

এখন তো বহুদিন ধরে বয়আত করতে আর মন চায় না। আল্লাহ্র শোকর, সিলসিলা বাকী রাখবার জন্যে আমার চাইতেও সর্বদিক দিয়ে উত্তম অনেক বন্ধুবান্ধব তৈরী হয়ে গেছেন। এখন তো মাঝে মাঝে কবিতার এ পংক্তিটিও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ;

احمد تو عاشقی بمشیخبت ترا چه کار
دیوانه باش سلسله شد شد نه شد نه شد

আহ্মদ তুমি আশেক তোমার শায়খী দিয়ে কাজই বা কী
পাগল হ' তুই সিল্সিলাটা রইলেই কী গেলেই কী?

সিল্সিলা বাকী থাকার ব্যবস্থা তো হয়েই গেছে, এখন আমার জন্য একটি শান্তিদায়ক নিরিবিলি আবাসের ব্যবস্থা করে দিন![৩৯]

কাব্যিক ও সাহিত্যিক রুচি

হযরত শায়খের মত একজন নিরেট ইল্মী ও দীনী পরিবেশে গড়ে উঠা মানুষ যে, কাব্যিক ও সাহিত্যেক উঁচু মানের রুচি তথা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও পরিশীলিত একটি কবি মনের অধিকারী ছিলেন, তা' সহসা বিশ্বাস করে উঠা খুবই মুশকিল। যদি বলি যে, তাঁর শত শত পংক্তি উর্দু, আরবী, ফার্সী—কবিতা মুখস্থ ছিল তবে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। তিনি তাঁর চিঠিপত্রে ও রচনাবলীতে এর সার্থক ও

সময়োচিত প্রয়োগও করতেন। তিনি নিজে বর্ণনা করেন যে, "একদা (যৌবনের প্রারম্ভে) রাত্রি বেলা অপর একটি কসবায় (জনপদে) যেতে হলো। সেখানে বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব সমবেত ছিলেন। এশার পরেই শুরু হলো কবিতা বলার পালা। (সেযুগের সংস্কৃতিমনা প্রাণবন্ত যুবসমাজ ও কসবাসমূহের অভিজাতদের মধ্যে এটা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং এটা উপাদেয়ও ছিল) এতে মন এতই নিবিষ্ট ছিল যে, রাতের কতটুকু অতিবাহিত হয়ে গেল, সে দিকে মোটেই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ যখন আযানের আওয়াজ কানে ভেসে এলো তখন ধারণা হলো যে, কে যেন অসময়েই আযান দিয়ে বসেছে! আমরা তো কেবলমাত্রই বসেছি। কিন্তু শেষে দেখা গেল, সত্যি সত্যি সুব্‌হে সাদিক হয়ে গেছে এবং এ আযানই ফজরের আযান ছিল।"

এখানে শুধু এ লেখককে লেখা পত্রাবলিতে উদ্ধৃত এবং তাঁর "আপবীতী"তে ব্যবহৃত কতিপয় নির্বাচিত কবিতার পংক্তি লিখছি–যাতে করে শায়খের উচুঁ পরিশীলিত কাব্যিক রুচির একটা পরিচয় পাওয়া যাবে এবং সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে যে, শায়খের মনমানস ও রুচিবোধ যে পরিবেশে গড়ে উঠেছিল তা' কোন দহিতহৃদয় কবির বর্ণিত সেই পরিবেশ থেকে কতটা ভিন্নতর ছিল যাতে কবি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন ঃ

سعر من بمدرسه کے نبرد

এ কিতাবে ইতিপূর্বে কোন প্রসঙ্গে যে সমস্ত পর্ংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি।

وہ لکھیں گے تجھے خط کا جواب داغ کیا کھنا * یہ تو نے خواب دیکھایا کہ مضمون خیالی سے

তিনিই দেবেন চিঠির জবাব, দাগ তুমি কী ভেবেছো?
স্বপ্ন তুমি দেখলে নাকি কল্পনাতে তাই ভেবেছো?

پھر وهی کنج تفس اور وهی صیاد کا گھر * چار دن اور هوا باغ کی کھالے بلبل

পিঞ্জিরেতে ঠাঁই হবে ফের, শিকারীর ঘরেতে ঠাঁই
হাওয়া ক'দিন ভোগ করে নে গুলবাগিচার বুলবুলি ভাই!

یاں لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں
واں ایک خامشی مرے سب کے جواب میں

এই দিকেতে অস্থিরতা লক্ষ কথার ফুটছে খৈ
ওদিকেতে নীরবতা সকল কথার জবাব ঐ।

میں گو رہا رہیں ستمہائے روز گار
لیکن تمہاری یاد سے غافل نہ رہا

যদিও ছিলাম যুগ যামানার দুর্বিপাকে বন্দী আমি
কিন্তু তোমার স্মরণখানি এক পলক ও পাশরিনি।

رفتہ رفتہ راہ ورسم درستی کم ھو تو خوب
ترک کرنا خط کتابت یک قلم اچھا نہیں

ধীরে ধীরে সখ্যতা যায় তাতে কিছু বলার নেই,
তাই বলে কি অকস্মাৎ? চিঠিপত্র মোটেও নেই?

آ عندلیب مل کے کریں آہ و زار ریاں
تو ھائے گل پکارے میں چلاؤں ھائے دل

বুলবুলি ভাই এসো দু'জন করি বিলাপ হট্টগোল
বলবো আমি হায় রে হিয়া, বলবে তুমি হায় রে ফুল' !

نہ خنجر اٹھےگا نہ شمشیر ان سے * یہ بازو میرے ازمائے ھوئے ھیں
شب و صال میں خوں سحر ابھی ھے * صبح ھے دور میرا رنگ فق ابھی سے ھے
ان کے خط کی ارزو ھے ان کی آمد کا خیال * کس قدر پھیلاھوا ھی اسے کار و بار انتظار
مدت سے لگ رھی تھی لب بام اٹك ٹکی * تھك تھك کے گرگئی نگہ انتظار آج
رہ گئی بائے کٹ گئی شب ھجر * تم نہ آئے تو کیا سحر نہ ھوئی
سرخ رو ھوتا ھے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد * رنگ لاتی ھے حنا پس لے پس جانے کے بعد

(উর্দু কাব্য সাহিত্যের এধরনের পংক্তিগুলো যেহেতু সরাসরি শায়খের জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়, এবং বাংলাভাষী পাঠক তার সাহিত্যমূল্য অনুধাবনের জন্য একান্তই অনুবাদকের উপর নির্ভরশীল, তাই লেখকের উদ্ধৃত অল্প কিছু পংক্তি উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত হলাম। –অনুবাদক)

টীকা ঃ

১. তাঁর বদান্যতা কেবল মাওলানা ইউসুফের মতো ঘনিষ্ঠজন ও প্রিয়তম ভাইয়ের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য প্রিয়জনরাও তাঁর সিংহহৃদয়ের বদান্যতা থেকে বঞ্চিত থাকতেন না। আমার বিদেশে

সফরসমূহের সময় এবং বিশেষতঃ হিজায সফরের সময় একবার আমার এমনি এক টানাপোড়েনের সময় শায়খ হিজায থেকে লিখলেনঃ

"আমি আপনাকে প্রস্তাব দিয়েই দিচ্ছি, আপনার এখানে আগমনে মেহমানদারীর জন্য কোন আমীরুল উমারা বা মালিকুলমুলকের দাওয়াত যদি পূর্বশর্ত না হয়, এক দু' মাসের জন্য একজন ফকীর দাওয়াত পেশ করছে। যদি কবুল করেন, তবে তা' অবশ্যই অনানুষ্ঠানিক হবে, কেননা, আপনি সম্যক জানেন, ইন্‌শাআল্লাহ আনুষ্ঠানিকতা থেকে কমপক্ষে আমি তো নিজেকে উর্ধে মনে করি। (৭মে, ১৯৭৩/ রবি.ছানী ৯৩ হিজরীর পত্র)

২. মওলবী আবদুল মান্নান সাহেব দেহলবী মরহুম।

৩. তারিখে দাওয়াত ও আযীমত, ৩য় খণ্ড ("ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক"- নামে বন্ধুবর অধ্যাপক আবূ সাঈদ উমর আলী যার বঙ্গানুবাদ করেছেন- অনুবাদক)

৪. বর্ণনা ঃ সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হুশিয়ারপুরী

৫. সূফী মুহাম্মদ ইকবাল সাহেবের আবুল হাসান আলীর (শ্রদ্ধেয় লেখকের-অনুবাদক) নামে লিখিত পত্র।

৬. আসহাবে কাহাফের পিছু পিছু যে কুকুর গুহাবাসরে জন্য গিয়েছিল, কোন কোন কিতাবে তারই নাম কিৎমীর লেখা হয়েছে।

৭. সম্ভবত: হযরত উমরের জাহিলিয়াত যুগের নাম।

৮. এ আরবী সংস্কারটি নদওয়াতুল উলামার প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার তা' পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যান্য মাদ্রাসায়ও তা' পাঠ্যভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৯. এ বর্ধিত ও সম্পাদিত আরবী অনুবাদটি করেন মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী। -অনুবাদক)

১০. পত্রপ্রাপক শায়খের সে পুরনো সহকর্মী বন্ধুটি ছিলেন মওলানা যাকারিয়া কুদ্দুসী গাঙ্গোহী মরহুম। ইনি মাযাহিরুল উলূম পাস প্রবীণ আলেম ও উক্ত মাদ্রাসার একজন শিক্ষক ছিলেন। পত্রখানা লিখিত হয়েছিল ১৩৭০ হিজরীতে। শায়খের ব্যক্তিগত পত্র হওয়ায় তা' প্রকাশে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হয়। শায়খের মদীনা শরীফে অবস্থানকালে তাঁর কতিপয় প্রিয়জন বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুভব করে এবং সময়ের চাহিদা অনুসারে তা' দেশে ১৯৭৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

১১. এ নামে পুস্তকটির ২য় সংস্করণ সর্বপ্রথম করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। (পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করে মওলানা মুহাম্মদ তাহের সিলেটী সাহেব কোলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। যার পুনর্মুদ্রণ ঢাকায়ও হয়েছে)।-- অনুবাদক

১২. অথচ এই জামাল নাসেরের নির্বুদ্ধিতা ও আস্ফালনের জন্যই মুসলমানদেরকে তাদের সুদীর্ঘকালের মসজিদে আকসা, আল-কুদস নগরী (জেরুজালেম) ইব্রাহীম (আ.)-এর সমাধির শহর আলখলীল বরং গোটা পশ্চিমকূল ও সিনাই উপত্যকা হারাতে হয়। বৈরুতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও ফিলিস্তীনীদের দুঃখজনক বহিষ্কার ও তারই জের স্বরূপ।

১৩. হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.)।

১৪. ৪ জমাদিউস্‌সানী '৬৪ হিঃ তারিখের পত্র।

১৫. ৭ই মুহাররম, ৬৫ হিজরী তারিখের পত্র।

১৬. ৫ই মে, ৮১ ইং তারিখে পত্র।

১৭. সাওয়ানিহে হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী, পৃঃ ৩১৩

১৮. চিঠিতে তারিখ উল্লেখ নেই। তবে বলাবাহুল্য, আমার আমেরিকা সফরের (মে, '৭৭ইং) পরে এ পত্রখানি লিখিত হয়। আগষ্টে ফিরে এসেছিলাম। ২১শে মে, ১৯৭৮ ইং তারিখে লিখিত পরবর্তী পত্রে প্রার্থিত পুস্তক সংখ্যা হচ্ছে দু' হাজার বলে জানানো হয়।

১৯. ১২ই যিলহাজ্জ, '৮৮ হিজরীর পত্র।

২০. লেখকের আরবী কিতাব الاركان الاربعة -এর উর্দু তর্জমা প্রিয় ভাতিজা মওলবী মুহাম্মদ আল-হোসায়নী মরহুম করেছিলেন।

২১. পত্রখানির তারিখ ছিল ১২ই যিলহাজ্জ, ১৩৮৮ হিঃ।

২২. ২২শে যিলকাদ, ১৪০০ হিজরী তারিখের পত্র।

২৩. ৫, ই মে ৮১ ইং তারিখের পত্র।

২৪. ২৮শে যিলকাদ, ১৪০০ হিঃ তারিখের পত্র।

২৫. ২৭শে যিলহাজ্জ ১৪০০ হিঃ তারিখে লিখিত পত্র।

২৬. সুহ্বতে বা আহ্লেদেল (হযরত ইয়াকূব সাহেব মুজাদ্দেদীর বাণী সংকলন) অষ্টম মজলিস, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৮ ইং।

২৭. এ ব্যাপারে শায়খের "রিসালায়ে স্ট্রাইক" নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা।

২৮. রিসালায়ে স্ট্রাইক, পৃঃ ১।

২৯. ১৬ই রমযান, ১৪০০ হিঃ তারিখের পত্র।

৩০. ২১শে রজব, ১৩৯৬ হিজরীর পত্র।

৩১. রমযান, ১৩৮৯ হিজরীতে লিখিত পত্র

৩২. এখানে সূফী আবদুর রব সাহেব এম.এ মরহুমকে বুঝানো হয়েছে।

৩৩. এটা ছিল মদীনা শরীফে ইশার ওয়াক্ত এবং আমেরিকার সকাল বেলা। ঐ সময়ই অপারেশনের সময় নির্ধারিত ছিল।

৩৪. আল এ'তেদাল, পৃঃ ৩২।

৩৫. ২৪/১২/৮৮ হিঃ তারিখের পত্র থেকে, যা' এ লেখকের নামে লিখিত হয়।

৩৬. মীর আলে আলী সাহেব সাহারানপুরী মরহুম।

৩৭. মদীনা মুনাওয়ারা থেকে লেখককে লিখিত পত্র।

৩৮. আবুল হাসান আলীর নামে, ২০শে রজব '৭৫ হিঃ।

৩৮. ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৭৪ইং তারিখের আবুল হাসান আলীর নামে লিখিত।

দশম অধ্যায়

রচনাবলী

লেখার রুচি এবং গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক রচনাবলী

দর্‌স–তাদরীসের ব্যস্ততা, যিকির ও নফল নামাযাদিতে মনোনিবেশ অতিথি–অভ্যাগতদের আধিক্য ও ভিড় সবসময় লেগে থাকা সত্ত্বেও লেখা ও গবেষণাপ্রবৃত্তি ছিল তাঁর মজ্জাগত। প্রথম যখন মিশকাত শরীফের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন (শাওয়াল, ১৩৪১ হিজরীতে প্রথম অধ্যাপনা শুরু করেন) তখন ২২শে রবিউল আউয়াল রাত বারটায় বিদায় হজ সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। মাত্র একদিন দেড় রাতের মধ্যে শনিবার সকালে তাঁর রচনাটি সমাপ্ত হয়। স্বপ্নে একটি ইঙ্গিত পেয়ে তারপর ১৭ই জমাঃউলা ৯০ হিজরী বুধবার جزء العمرات লিখতে শুরু করেন এবং ১৫ই রজব '৯০ হিজরী রোজ শুক্রবার লেখাটি সম্পূর্ণ করেন।[১]

প্রকাশ থাকে যে, এই একদিন দেড় রাতের মধ্যে লিখিত "হুজ্জাতুল বিদা" পুস্তিকাটি কলেবরে ছোট হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও উপাদেয় এবং কেউ না বললে একথা বিশ্বাস বা কল্পনাও করতে কষ্ট হয় যে, এত বড় একটা গবেষণামূলক ও মুহাদ্দিছসুলভ রচনা এত অল্প সময়ের মধ্যে রচিত হয়েছে। এটাও লক্ষণীয় যে, শায়খের বয়স তখন মাত্র সাতাশ বছর। পাদটীকা প্রভৃতি পরে সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু পাঠ ঐ সময়ই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ১৩৯০ হিজরীতে যখন তিনি আলীগড়ে চোখের অপারেশন করান এবং তখন কোন নতুন রচনায় হাত দেয়ার অবকাশ ছিল না, তখন তাঁর সে পুরনো লেখটির কথা মনে পড়ে যায়। তখন তিনি কোথাও কোথাও হাদীছের বর্ণনাকারী রাবীদের ব্যাপারে আলোকপাত করেন আবার কোন কোন স্থানে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ব্যাপারসমূহের ব্যাখ্যাও লিখেন। যে সমস্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল। এবার সে উদ্ধৃতিগুলো হুবহু উদ্ধৃতও করে দেন। যে সমস্ত স্থানের নাম উল্লেখিত হয়েছিল, সেগুলোকে চিহ্নিত করে দেন এবং সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর কিছু প্রিয়ভাজন

লোকের সাহায্য নিতেও কার্পণ্য করেন নি। এ প্রসঙ্গে তিনি নবী করীম (স) কতবার উমরা করেছিলেন, সে ব্যাখ্যা ও ফিকাহ্র কোন কোন মাসআলা সে সময়ে কৃত নবী করীম (স).-এর আমল থেকে নির্গত হয়, তা' বিস্তারিত আলোচনা করেন। ফলে এ পুস্তকটি এ ব্যাপারে একটা ছোটখাটো বিশ্বকোষের রূপ পরিগ্রহ করে।[২]

অনুরূপভাবে "খাসায়েলে নববী শরহে শামায়েলে তিরমিযী"-এর মত শানদার ও বরকতময় কিতাবখানা রচিত হয় দিল্লীতে দু'তিন দিন "বযলুল মজহূদ" কিতাবের প্রুফ দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে লিখে লিখে। ৪৩ হিজরীতে শুরু করে ৪৪ হিজরীর জমাঃছানী মাসে জুমুআর রাতে তার রচনাকার্য সমাপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে যেসব রচনাতে তাঁর দীর্ঘকালের সাধনা ও গবেষণা ব্যয়িত হয় তন্মধ্যে তাঁর সর্বাধিক গৌরবময় কীর্তি হচ্ছে "আওযাজুল মাসালিক শরহে মুআত্তা ইমাম মালিক"। কিতাবখানা ৬টি বিরাট খণ্ডে লিখিত ও প্রকাশিত হয়। এ কিতাব রচনা শুরু করেন ১৩৪৫ হিজরীর ১লা রবিউল আউয়াল তারিখে হুযূরে পাক (সা.)-এর মাযারের পার্শ্বে বসে এবং এতে সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছরেরও অধিককাল ব্যয়িত হয়।[৩-৪] আমি আল্লামায়ে হিজায মুফতীয়ে মালিকিয়া সায়্যিদ উলুভী মালেকীকে-যিনি শুধু হেজাযেরই নন, তাঁর সমসাময়িক যুগের গোটা পৃথিবীর আলিম সমাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর আলেমরূপে সুপরিচিত ছিলেন-অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে শুনেছি। মালেকী মাযহাবের আলিমদের অভিমতসমূহ ও মাসায়েল সম্পর্কে শায়খের গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন,

> "শায়খ যাকারিয়া ভূমিকায় যদি নিজেকে হানাফী বলে পরিচয় না দিতেন তবে কেউ বল্লেও আমি তাঁকে হানাফী মযহাবের অনুসারী বলে বিশ্বাসই করতাম না, বরং তাঁকে মালেকী বলেই মনে করতাম। এজন্যে যে, তাঁর রচিত "আওযাজুল মাসালিকে" মালেকী মযহাবের মাস্আলাসমূহকে তিনি যে চমৎকারভাবে বিন্যস্ত ও বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিজেদের মালেকী মাযহাবের কিতাবসমূহে তা' এমনটি সহজে বের করা যায় না, বরং অনেক ঘাঁটাঘাটি করেই তবে পাওয়া যায়।"

মালেকী মাযহাবের আলিম ও কাযীগণ এ কিতাবখানার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। আরব আমীরাতের প্রধান কাযী মালেকী মযহাবের বিখ্যাত আলিম শায়খ আহ্মদ আবদুল আযীয ইব্ন মুবারকও এ কিতাবের মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আওজাযের শুরুতে নব্বই পৃষ্ঠার একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায় হাদীছ-শাস্ত্রের পরিচিতি, ইতিহাস, উদ্ভব ও বিন্যাসের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। তারপর কিতাব ও কিতাবের রচয়িতা ইমাম মালিকের বিস্তারিত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তারপর তার শরাহ্‌সমূহ এবং যুগে যুগে এর খেদমতসমূহ, এ ব্যাপারে উম্মতের গভীর আগ্রহের আলোচনা এবং আপন মাশায়েখ ও সিলসিলায়ে ওলীউল্লাহীর সনদসমূহ শায়খুল হাদীছ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সর্বোপরি সর্বশেষে তিনি ইমাম আবূ হানীফা, মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁর মর্যাদা ও ভূমিকা এবং তাঁর মূলনীতিসমূহ ও মতাদর্শের আলোচনা করেছেন। এছাড়া বিবিধ উপাদেয় বিষয়েরও এতে তিনি আলোচনা করেছেন।

'লামেউদ্ দেরারী' (যা' আসলে হযরত গাঙ্গুহীর বুখারী শরীফের তাকরীরসমূহ ও মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেবের পাদটীকাসমূহের সমষ্টি) শায়খের পরিবর্ধন ও ব্যাখ্যাসমূহ সম্বলিত হয়ে হাদীছের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের জন্য একটি উপাদেয় গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এতে এমন কিছু মূল্যবান তথ্য রয়েছে-যার মূল্য হাদীছ অধ্যাপনার সাথে জড়িত আলিমগণই কেবল উপলব্ধি করবেন। কিতাবের শুরুতে বড় ২৭X১৭/৪ সাইজের জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা রয়েছে। এ সুদীর্ঘ ভূমিকায় কেবল ইমাম বুখারী এবং তাঁর অনন্য কিতাব "আল-জামেউস্ সহীহ্"-এর বিভিন্ন দিকই যে কেবল সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে, তাই নয়, বরং তাতে এমন সব জ্ঞাতব্য বিষয় ও উপাদেয় তত্ত্বাবলী সংকলিত হয়েছে, যা' উসূল ও রিজালশাস্ত্রজাতীয় জীবনী পুস্তকসমূহের হাজার হাজার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বরং হাদীছের কিতাবসমূহের কোন্‌টির কী মর্যাদা, আবওয়াবে হাদীছ, তাকরীর ও ইজতিহাদ এবং হানাফী মাযহাবের পক্ষের (বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে) গবেষণালব্ধ তত্ত্বাদিও সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে, এ ভূমিকাটি ইল্‌মে হাদীছের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষতঃ হানাফী মযহাবের আলিমগণের জন্য একটি উত্তম চয়নিকার কাজ দেয়। এতে শায়খের কিছু নিজস্ব গবেষণা ও দীর্ঘ মুহাদ্দিছ জীবনের অধ্যয়নের সারমর্ম পরিবেশিত হয়েছে। উক্ত বড় সাইজ কিতাবখানার ১ম খণ্ডের কলেবর ভূমিকা ছাড়া ৫১২ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় খণ্ড ও অনুরূপ কলেবরে কিতাবুল জিহাদ পর্যন্ত শেষ হয়েছে।

অনুরূপভাবে তাঁর কিতাব আল-আবওয়াব ওয়াৎতারাজিম-লিল-বুখারী (الابواب و التراجم للبخاری) তার গবেষক রুচি, হাদীছ শাস্ত্রের শায়খগণের প্রতি তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভক্তিভালবাসা এবং তাঁদের ইল্‌মের সংরক্ষণপ্রচেষ্টার এক

উত্তম নমুনা স্বরূপ। এই কিতাখানা হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ দেহ্লবী (র.), হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গুহী (র.) ও শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্মুদুল হাসান দেওবন্দীর রিসালাসমূহ ও তাঁদের গবেষণার সমন্বিত ফসল হওয়া ছাড়াও 'আবওয়াব' ও তারাজিম' সংক্রান্ত সেসব 'উসূল' ও কাওয়ায়েদ বা মূলনীতিসমূহের একত্র সমাবেশ–যা' হাকিম ইবনে হাজর, কাস্তালানী ও হাকিম 'আইনীর শরাহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাগবেষণা ও অধ্যয়নপ্রসূত মূলনীতি বা কাওয়ায়েদও এতে সংযোজিত করেছেন। তাতে করে সেসব কাওয়ায়েদের সংখ্যা ৭০ এ উন্নীত হয়েছে। আমাদের জানা মতে এত উসূল ও কাওয়ায়েদের বর্ণনা অন্য কোথাও পাওয়া যায়না। والغيب عند الله (গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন) বুখারীর আবওয়াব ও তারাজিমের জটিলতা ও সূক্ষ্মতা এবং তার সমাধান যে কতকষ্ট সাধ্য সে সম্পর্কে ওয়াকিহাল মহলই কেবল এ কিতাবের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন।

হাদীছ শাস্ত্রের মৌলিক কিতাবাদি সংক্রান্ত ঐ চারটি কিতাবই শায়খুল হাদীছ হযরত মওলানা যাকারিয়াকে তাঁর সমসাময়িক যুগের (অন্ততঃ হাদীছ শাস্ত্রের) একজন দিকপাল লেখক ও গবেষকরূপে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট।[৫]

অনুরূপভাবে হযরত গাঙ্গুহীর তিরমিযীর তাকরীরসমূহে (যা 'শায়খের পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব কর্তৃক লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়েছিল) শায়খের স্বহস্ত লিখিত পাদটীকা ও ব্যাখ্যাসমূহে তাঁর সুদীর্ঘকালের হাদীছ অধ্যয়ন ও চিন্তাভাবনার উপাদেয় ফসল পরিবেশিত হয়েছে।

শায়খের এই লেখকসুলভ রুচি এবং হাদীছের প্রচার প্রসার ও খেদমতের অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ অনেক সময় তাঁকে বাহ্যিক পরিবেশ–পরিস্থিতিকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করতে দিতো না। তিনি একবারে চোখ বুঁজেই তাঁর কর্তব্য সম্পাদানে আত্মনিয়োগ করতেন এবং এ ব্যাপারে কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহকেও পিছনে ফেলে রাখতেন। এ লেখককে লিখিত এক পত্রে তিনি লিখেন ঃ

> '৪৭ সালে নিযামুদ্দীনে আমার বন্দীদশা ও তথাকার অবস্থা আপনার স্মরণ থাকবে নিশ্চয়ই। এমতাবস্থায় ফিরবার ইচ্ছে ছিল না একবারেই। মওলবী নসীরুদ্দীন আমার সাথে তখন একটা চালাকি করলেন। তিনি আমাকে লিখলেন, একজন কাতেব পাওয়া গেছে, আমি আওজাযের চতুর্থ জিলদের কপি লেখার কাজ শুরু করিয়ে দিয়েছি। এর ছাপার কাজ আগেই শুরু করিয়ে দেয়া

হয়েছিল। কিন্তু দেশবিভাগের হাঙ্গামায় কপিগুলো বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং ছাপার জন্য ক্রীত বিপুল পরিমাণ কাগজ এদিক-সেদিক হয়ে গিয়েছিল। এ পত্রখানা পেয়েই আমি প্রিয়ভাজন মওলবী ইউসূফ মরহুমকে বল্‌লাম, এবার আমার চলে যেতে হবে। আজও আমার তাঁর সে করুণ কণ্ঠের ধ্বনি প্রাণে খুব বাজছে। তিনি তখন বলেছিলেন "ভাইজী, আমাদেরকে এ অবস্থায় রেখে আপনি চলে যাবেন?" আমি তখন রুক্ষ কণ্ঠেই জবাব দিয়াছিলাম, অবস্থা এখন ঠিক হতে চলেছে, আওজাযের কথা চিন্তা করে এখন আর (দিল্লীতে) থাকা মুশকিল। সে দীর্ঘ কাহিনী। কিন্তু যখনই তা' স্মরণপটে উদিত হয়, মনকে অস্থির করে তোলে। সাহারানপুর পৌঁছে বুঝতে পারলাম, এটা কেবল ম্যানে-জারের চালাকী ছিল, আসলে কাতেব পাওয়ার ব্যাপার-স্যাপার কিছুই ছিল না।[৬]

ইতিহাস ও গবেষণাধর্মী রচনাবলী

হাদীছও উলূমে হাদীছ শায়খের জীবনের প্রধান ব্রত ও তাঁর লেখা ও গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল। একে তিনি আল্লাহ্ ও রাসূলের নৈকট্য লাভের সবচাইতে বড় উপায় বলে বিবেচনা করতেন। তাই এটাই ছিল তাঁর জীবনব্রত। এমন কি তাঁর "শায়খুল হাদীছ" লকবটাই তাঁর নামের বিকল্প বরং তার চাইতে বেশী মশহুর হয়ে যায়। অত্যন্ত সংগতভাবেই তিনি বল্‌তে পারেতেন। ঃ

ما انچه خوانده ایم فراموش کرده ایم
الأ حدیث درست که تکرار می کنیم

"যতকিছু পড়েছি, তা একদম গেছি সব ভুলে
কেবল হাদীছ সহীহ্
বার বার স্মরি তাহা খুলে।"

তবে এর সাথে সাথে তাঁর ইতিহাসও গবেষণাধর্মী রচনার প্রতি ঝোঁক ছিল- যা' আজকাল প্রাচীনধর্মী মাদ্রাসাসমূহে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি তাঁর রোজনামচা ও তাঁর সেই চয়নিকার-যাকে তিনি নিজে "তারীখে কবীর" নামে অভিহিত করতেন-তাতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, সন তারিখ, ওফাত ও দুর্ঘটনা প্রভৃতির বিবরণ লিখে রাখতেন। এতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্লভ তত্ত্ব লিপিবদ্ধ রয়েছে- যা অন্যত্র পাওয়া খুবই মুশকিল।

তাঁর এই ইতিহাসপ্রীতি এবং তাঁর ইল্‌মী জননী মাদ্রাসা মাযাহিরুল উলূমের প্রতি তাঁর প্রাণের টানের ফলশ্রুতিতে তাঁরই কলমে ১৩৩৫ হিজরীতে রচিত হলো "তারীখে মাযাহেরী" নামক ইতিহাস গ্রন্থখানা।[৭] এতে মাদ্রাসা মাযাহিরুল উলূমের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকবৃন্দের নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি, উস্তাদবর্গ মুদার্রিসীনে কিরামের নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা, ব্যবস্থাপনা ও পাঠক্রমের পরিবর্তন ও ক্রমবিবর্তন এবং পাঠ্যক্রমের এমন বিস্তারিত তত্ত্বাবলী বর্ণিত হয়েছে–যা' খুব কম সংখ্যক মাদ্রাসার বেলায়ই ঘটেছে। বইটির কলেবর ১৬২ পৃষ্ঠা। মাদ্রাসার জন্য শায়খের এই আন্তরিক টান এবং তার প্রতিটি ধুলিকণার সাথে তাঁর এই যে পরিচিতি, জানাশোনা ও নিবিড় সম্পর্ক, তার ব্যাপারে এই ফার্সী পংক্তিটি প্রযোজ্য ঃ

داستان تصل گل خوش می سراید عندلیب

তাঁর এই ইতিহাস ও গবেষণা প্রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর আরো কয়েকটি গ্রন্থে। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থ হচ্ছে "তারীখ মাশায়েখে চিশ্‌ত।"[৮] ১৩৩৫ হিজরীতে প্রণীত এ গ্রন্থে তিনি সিল্‌সিলায়ে আলীয়া চিশ্‌তিয়ার বড় বড় শায়খগণ এবং শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকরের পরবর্তী শাখা (যার সাথে শায়খ ও তাঁর মাশায়েখের সম্পর্ক রয়েছে) সিল্‌সিলায়ে সাবেরিয়ার মাশায়েখের আলোচনা করেছেন। এতে খাজা আলাউদ্দীন আলী আহ্‌মদ সাবেরী কাল্‌ইয়ারী থেকে নিয়ে হযরত মাওলানা খলীল আহ্‌মদ সাহারানপুরী পর্যন্ত আলোচিত হয়েছেন। সিলসিলাসমূহ ও এগুলোর শায়খদের ব্যাপারে আলোচনা যে কত কঠিন কাজ তা' ভুক্তভোগীরাই কেবল জানেন। শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)–এর পর তাঁর কলম পেয়েছে প্রশস্ত ময়দান। আর তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ মাশায়েখদের অবস্থাদি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[৯]

তাঁর এ গবেষণাধর্মী রচনা ও ইতিহাস প্রীতির নিদর্শন আর একটি পুস্তক হচ্ছে المؤلفات و المؤلفين (রচনাবলী ও রচয়িতাবৃন্দ)। এতে হাদীছ ও ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের মশহুর কিতাবাদি ও ঐগুলির রচয়িতাবৃন্দের জীবনী এবং যেসব কিতাবে তাঁদের জীবনীসমূহ সঙ্কলিত হয়েছে সেগুলোর উদ্ধৃতি সঙ্কলিত হয়েছে। ১৩৪৭ হিজরীর ১লা জমাঃছানী থেকে লেখা শুরু করে তাঁর চোখ দিয়ে যতদিন কাজ চলেছে, ততদিন পর্যন্ত এ রচনার কাজ অব্যাহত গতিতে চলেছিল। এ ধাঁচের তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ হচ্ছে "আলওকায়ে' ওয়াদ্‌দুহূর" (الوقائع والدهور)। এতে নবী করীম

(সা)–এর খিলাফতে রাশিদা ও উমাইয়া আমলের ঘটনাবলী সঙ্কলিত হয়েছে পৃথক পৃথক ৩ খণ্ডে। '৪২ হিজরীর ২৫শে মুহার্‌রমে শুরু করে '৮৮ হিজরী পর্যন্ত এর রচনাকর্ম অব্যাহত থাকে। এ গ্রন্থগুলো শায়খের ইতিহাসপ্রীতিরই প্রমাণবহ–যা' তাঁর পরিবেশ, পরিমণ্ডল ও পেশার কথা বিবেচনা করলে একান্তই ব্যতিক্রমধর্মী ও বৈশিষ্ট্যমূলক।

হিজাযে অবস্থানের শেষ পর্যায়ে যখন তিনি নানারূপ রোগব্যাধির শিকার হয়ে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি "ফাযেয়েল যবানে আরবী" নামে একটি পুস্তিকা লেখাতে শুরু করেন। ১৩৯৬ হিজরীর ২৫শে সফর তারিখে যুহরের পূর্বে মসজিদে নববীতে বসে তার সূচনা[১০] হয়। এ পুস্তিকাখানি রচনার ব্যাপারটি তাঁর মনমগজে এভাবে গেড়ে বসেছিল যে, মদীনা তাইয়িবা থেকে এ অধমের নামে লিখিত তাঁর পত্রে কিছুটা আঁচ করা যায় ঃ

ان کے خط کی ارزو ھے ان کی آمد کا خیال
کس قدر پھیلا ھوا ھے کار وبار انتظار

তাঁরই দিঠি আসবে আশা তাঁরই আসার ইন্তেজার
হায়রে কী যে বিপুল আশা নাই কিনারা প্রতীক্ষার!

একটি একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় পাঁচ ছয়টি পত্রে ইতিমধ্যেই লিখিয়েছি আর তা' হলো আরবী ভাষার মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি পুস্তিকার রচনার খেয়াল ৪ মাস অবধিই হচ্ছে। স্মরণ করতে পারছিনা যে, এর পটভূমিকা আপনার কাছে পত্রে ব্যক্ত করেছি কিনা! কিন্তু এব্যাপারে কোন কিতাব এখানে পাচ্ছি না– যাতে হাদীছের রিওয়ায়েতসমূহ থাকবে। প্রায় দু'মাস আগে আপনি আসবেন খবর পেয়ে উপর্যুপরি আমি ২/৩টি পত্র এমর্মে আপনাকে লিখিয়েছি যে, নদওয়াতে বা আপনার কাছে থাকলে আসার সময় সাথে নিয়ে আসবেন এবং যাবার পথে আবার নিয়েও যাবেন। উপরন্তু প্রিয়বর রাবে' ও ওয়াযেহ্‌কে আপনার মাধ্যমে এ পয়গাম পৌছাতে চেয়েছিলাম (পত্রে লিখেছিলাম) কোন আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে দুররে মনসূর বা অন্য কোন তাফসীর গ্রন্থে এ সংক্রান্ত রিওয়ায়েতসমূহ পাওয়া গেলে তাঁরা যেন আমাকে কেবল বরাতগুলো লিখে পাঠান, আমি তা'হলে বন্ধুবান্ধবকে দিয়ে উক্ত কিতাবের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু খুঁজিয়ে নেবো।[১১]

ফাযায়েল ও হিকায়াত সিরিজের রচনাবলী

এমনিতে তো শায়খের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা শ'য়ের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে।[১২] কিন্তু তাঁর এ বিপুল সংখ্যক রচনার মধ্যে "হিকায়েতে সাহাবা" এবং ফাযায়েল সিরিজের কিতাবগুলো তবলীগী জামাআতের পাঠ্যভুক্ত ও সাধারণ বোধগম্য আঙ্গিকে লিখিত হওয়ায় যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং উম্মতের এক বিরাট অংশের তাতে যে পরিমাণ উপকার হয়েছে, কমপক্ষে উর্দু ভাষায় দাওয়াতী ও দ্বীনী সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। এতে মোটেও অতিশয়োক্তি নেই যে, এপুস্তকগুলোর প্রতিটির মুদ্রণ সংখ্যা লাখের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। তারপর এগুলোর দ্বারা যে দ্বীনী ও আমলী ফায়দা পাঠকদের হয়েছে সে সম্পর্কে সমসাময়িক যুগের জনৈক বিশিষ্ট আলিমের এ মন্তব্য আদৌ অতিশয়োক্তি নয় যে, "এগুলোর দ্বারা আল্লাহ্র হাজার হাজার বান্দা ওলীর মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে।[১৩]

এ কিতাবগুলোর মধ্যেও "হিকায়াতে সাহাবা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কিতাবখানা পাঠকদের মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং পাঠকগণ এর দ্বারা সমধিক উপকৃত হয়েছেন। কিতাবখানা তিনি হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী সাহেবের অনুরোধে লিখেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই শায়খকে সাহাবায়ে কিরামের কাহিনীসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য বলে আসছিলেন। কিন্তু শায়খ সময় করে উঠতে পারছিলেন না। ১৩ ৫৭ হিজরীতে হঠাৎ শায়খের নাক দিয়ে রক্ত ঝরার ভীষণ পীড়া দেখা দিল। কয়েক মাসের জন্য তাঁকে চিন্তামূলক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে বলা হলো। তিনি তো কাজ ছাড়া থাকতেই পারেন না। অগত্যা 'হিকায়াতে সাহাবা' রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। '৫৭ হিজরীর ১২ই শা'বান তারিখে তিনি তাঁর এ গ্রন্থখানি রচনা সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাবলীগ পাঠ্য কিতাবসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া ছাড়াও দীনী ও দাওয়াতী মহলে এ কিতাবটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। ভাষা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল। বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক, ঘটনাবলী কেবল মর্মস্পর্শীই নয় বিপ্লবাত্মকও বটে।

ফাযায়েল সিরিজের গ্রন্থগুলো প্রণয়ন ও সংকলন হচ্ছে শায়খের জীবনের এক বিরাট কীর্তি। হিন্দুস্তানে তাবলীগী জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের উচ্চতর ধর্মীয় প্রজ্ঞা, ঈমানদারসুলভ তীক্ষ্ণদর্শিতা ও গভীর

অন্তর্দৃষ্টির ফলশ্রুতিই বল্‌তে হবে যে, মুসলিম জীবনে ফাযায়েলের গুরুত্ব, অপরিসীম প্রভাব ও জাদুকরী শক্তির ব্যাপারটি তিনি যথার্থরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি এ সত্যকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, জীবনের চাকাকে প্রতিনিয়ত যে ব্যাপারটি সক্রিয় ও ঘূর্ণায়মান রেখেছে এবং দুনিয়ার এই কর্মকোলাহলের পিছনে যে ব্যাপারটি সক্রিয় রয়েছে, তা' হচ্ছে মুনাফার প্রতি মানুষের দুর্বার আকর্ষণ ও বিশ্বাস। এ বিশ্বাসকে কৃষককে প্রচণ্ড শীতের তীব্রতাকে উপেক্ষা করে শয্যা ত্যাগ করতে এবং রাতের অন্ধকার দূরীভূত না হতেই তার খামারে পৌঁছতে বাধ্য করে, লু' হাওয়ার প্রবাহ ও নিদাঘ সূর্যের অসহনীয় উত্তাপকে উপেক্ষা করে হাল চাষ করতে এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করার সাহস ও শক্তি যোগায়। এ বিশ্বাসই একজন ব্যবসায়ীকে তার ঘরবাড়ি ফেলে আরাম আয়েশ ভুলিয়ে দূরদূরান্তে ব্যবসা উপলক্ষে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। ঐ বিশ্বাসই একজন সৈনিকের মৃত্যুকে সহজ ও জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। যে বিশ্বাস ও প্রেরণা তাকে তার প্রিয় সন্তানদেরকে বাড়িতে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে তা হচ্ছে এই মুনাফা অর্জনের ও রঙ্গীন ভবিষ্যতের বিশ্বাস ও আশা। জীবনের চাকা প্রতিনিয়ত এই বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

কিন্তু এ বিশ্বাস ছাড়াও আর একটি বিশ্বাস আছে যা তার বিপ্লবাত্মক শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার দিক থেকে আরও দুর্বার, আরো শক্তিশালী, আর তা' হচ্ছে সেসব মুনাফা বা লাভ অর্জনের বিশ্বাস–যার খবর এ দুনিয়ায় বহন করে এনেছেন আম্বিয়ায়ে কিরাম বা নবীরাসূলগণ। ওহী ও সমস্ত আসমানী কিতাব এর সমর্থন করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে। একে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও দুনিয়া ও আখিরাতে আমলের ফলাফল বলে অভিহিত করতে পারি।[১৪]

ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীছসমূহে একেই অভিহিত করা হয়েছে "ঈমান ও এহ্‌তেসাব" বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ প্রেরণাটাই মু'মিনের প্রতিটি আমলের প্রধান কারক শক্তি হওয়া চাই।[১৫]

মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (র.) প্রায়ই বলতেন "ফাযায়েলের দর্জা মাসায়েলেরও পূর্বে। ফাযায়েল–এর দ্বারা আমলসমূহের প্রতিদান পাওয়ার ইয়াকীন বা বিশ্বাস পয়দা হয়। এটাই ঈমানের মকাম। এর দ্বারাই মানুষ আমল করতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। মাসায়েল জানার প্রয়োজনীয়তা তো সে তখনই কেবল অনুভব

করবে, যখন সে আমল করতে উদ্যোগী হবে। এ জন্য আমাদের কাছে ফাযায়েলের গুরুত্ব বেশী।"১৬

এ প্রয়োজন মেটাতে গিয়েই শায়খ একে একে লিখলেন "ফাযায়েলে নামায", "ফাযায়েলে রমযান", "ফাযায়েলে কুরআন", "ফাযায়েলে যিকির," "ফাযায়েলে হজ" "ফাযায়েলে সাদাকাত", "ফাযায়েলে তাবলীগ", "ফাযায়েলে দুরূদ"–এর অধিকাংশই হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের ইঙ্গিতে রচিত। "ফাযায়েলে কুরআন" ও "ফাযায়েলে দুরূদ" (হযরত গাঙ্গুহীর অন্যতম খলীফা) শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের নগীনভীর ইঙ্গিতে লিখেছিলেন। "ফাযায়েল হজ্জ" রচনায় হাত দেন ৩রা শাওয়াল ১৩৬৬ হিজরীতে। এ কিতাবে অনেক উৎসাহবর্ধক ঘটনা ও হজের স্পিরিটের সাথে সম্পৃক্ত অনেক মর্মস্পর্শী কবিতা থাকায় কিতাবখানা অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। শায়খের কাব্যবোধ ও অপূর্ব চয়নক্ষমতার পরিচয়ও এতে বিধৃত হয়েছে। কিতাবখানা পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, কল্‌ব ও কলম যেন লাগামহারা অশ্বের মত উদ্যাম গতিতে এগিয়ে চলেছে। মদীনা তাইয়িবায় হাযিরী দেওয়ার আদাব ও আকুতির কথা প্রাণভরে লিখেছেন। ফলে কিতাবখানা মদীনাযাত্রী কাফেলার এক "হুদীখান"–[১৭] এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। অনুরূপভাবে "ফাযায়েল সাদাকাত"–এ আখিরাতের পাগল প্রেমিকজনদের ত্যাগতিতিক্ষা, তাওয়াক্কুল ও দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততার এমন সব ঘটনা সংকলিত হয়েছে যাতে পার্থিব ভোগবিলাসের নশ্বরতা, আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও অবিনশ্বরতা এবং আল্লাহ্‌র দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে। মোটকথা, তাঁর লিখিত ফাযায়েলের এ কিতাব সিরিজ অত্যন্ত প্রাণবন্ত, মনোজ্ঞ এবং উৎসাহবর্ধক।

বিভিন্নমুখী রচনা

সাধারণতঃ যাঁরা গবেষণাধর্মী জ্ঞানগর্ভ রচনার অভ্যস্ত হন, প্রচারধর্মী ও সংস্কারমূলক সহজবোধ্য সার্থক রচনায় তাঁরা ততটা সফলকাম হন না। আর যাঁরা দ্বিতীয়োক্ত ধাঁচে রচনায় অভ্যস্ত থাকেন গবেষণাধর্মী রচনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ মান তাঁরা বজায় রাখতে প্রায়শঃই ব্যর্থ হন। কিন্তু এ ব্যাপারে শায়খ এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। উভয় প্রকারের রচনায়ই তিনি সমান সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানে গবেষণাধর্মী পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার নমুনা হচ্ছেঃ "আওজাযুল মাসালিক", "মুকাদ্দামায়ে লামেউদ দেরারী", "হুজ্জাতুল বিদা' ও উমুরাতুন নববী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও

সাল্লাম।" একান্তই আলিমসুলভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা হচ্ছে "জুযউ ইখতেলাফিস্‌-সালাত", "জুযউ ইখতিলাফিল আইম্মা", জুযউল মুহিম্মাত ফিল আসানীদ ওয়ার রিওয়ায়াত" প্রভৃতি।[১৮] দ্বিতীয় ধরনের অর্থাৎ প্রচারধর্মী সহজসরল রচনার নিদর্শন হচ্ছে "হিকায়াতে সাহাবা" এবং ফাযায়েল সিরিজের কিতাবগুলো। আর এ উভয়বিধ রচনাশৈলীর সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটেছে তাঁর "শরহে খাসায়েলে নববী" (জামে' শামায়েলে তিরমিযীর অনুবাদ) কিতাবে। এই কিতাবে তিনি একাধারে গবেষক পণ্ডিত, হাদীছ ব্যাখ্যাকারী আলিম ও ঐতিহাসিক এবং দীনের সহজভাষী প্রচারক মুবাল্লিগ। উম্মতের এই বিভিন্ন শ্রেণীকে তিনি তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় ও আঙ্গিকে সম্বোধন করেছেন।

وَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

এটা যে একান্তই বখশিস আল্লাহ্‌র,
যারে তিনি চান শুধু ভাগ্যে জোটে তার।

বাংলাভাষায় শায়খুল হাদীছের রচনাবলীর অনুবাদ

বাংলা ভাষায় শায়খুল হাদীছের তাবলীগ পাঠ্য কিতাবসমূহের অনুবাদ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এত বেশী সংখ্যক অনুবাদক ও প্রকাশনা সংস্থা এ কাজটি করেছেন যে, অন্য কোন বিদেশী ভাষার লেখকের রচনাবলীর অনুবাদকর্মে তা' কদাচিত দেখা যায়। সর্বপ্রথম শায়খুল হাদীছের 'ফাযায়েলে নামায' ও অপর দু'একটি বইয়ের অনুবাদ করেন পাক্ষিক 'নেদায়ে ইসলাম' সম্পাদক মাওলানা আবদুল মজীদ সাহেব আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে কোলকাতায় বসে এবং সেখান থেকে তা' প্রকাশিতও হয়। তারপর ঢাকায় মাওলানা আম্বর আলী 'তাবলীগী-নেসাব' শিরোনামায় ফাযায়েল সিরিজের প্রায় সব ক'খানি কিতাবেরই অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ অনুবাদ সিরিজটি খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং বহুলভাবে প্রচারিতও হয়। কিন্তু তার ইন্তিকালের পর ইদানীং তাঁর প্রতিষ্ঠিত তাবলীগী লাইব্রেরী অবলুপ্ত এবং তাঁর ফাযায়েল সিরিজের কিতাবগুলো আর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকায় আশরাফিয়া কুতুবখানা ফাযায়েল সিরিজের কয়েকখানা কিতাব ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাকারে বিভিন্ন অনুবাদকের দ্বারা অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেন। এর অধিকাংশ বইয়েরই অনুবাদক শায়খুল হাদীছেরই একজন বাঙালী শিষ্য মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহিবুর রহমান আহমদ জালালাবাদী। এঁর অনূদিত "তাবলীগী

জামাআতের সমালোচনা ও সদুত্তর”ও প্রকাশিত হয়। হাকীম হাফিয আযীযুল ইসলামও এ সিরিজের একটি বই অনুবাদ করেছেন।

অধুনালুপ্ত কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বাবুবাজার থেকেও ফাযায়েল সিরিজের কয়েকখানা কিতাব অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন অধুনালুপ্ত দৈনিক নাজাত-সম্পাদক মরহুম মওলানা কাজী আবদুশ শহীদ ও মরহুম মাওলানা নূরুযযামান প্রমুখ।

মাওলানা আমিনুল ইসলাম হযরত শায়খুল হাদীছের 'ফাযায়েলে দরূদ শরীফ ও 'হিকায়াতে সাহাবা' পুস্তক দু'টির অনুবাদ করেছিলেন।

হিকায়াতে সাহাবার একটি অনুবাদ মওলানা আবুল লাইস আনসারীও করেছিলেন-যা' দীর্ঘকাল পূর্বে সেই পাকিস্তান আমলেই ঢাকার প্রসিদ্ধ ইসলামিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।

হিকায়াতে সাহাবার বাংলা ভাষায় সবচাইতে প্রাঞ্জল ও সাবলীল অনুবাদ করেন 'পরিবার নহে কারাগার'-এর লেখক মরহুম মুজাফফর হুসায়ন-যা' সুদীর্ঘকাল পূর্বে পাকিস্তান আমলেই ঢাকার এমদাদীয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ফাযায়েল সিরিজের কোন পুস্তকের এত সার্থক অনুবাদ যা' অনুবাদ বলে বুঝবার উপায় নেই, একান্তই মৌলিক রচনার মত সাবলীল ও আড়ষ্টতামুক্ত সম্ভবতঃ আর কোনটিই নয়।

ফরিদাবাদ মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিছ মাওলানা আবু মাহমুদ হেদায়েত হোসেন মরহুমের "ফাযায়েলে নামায' অনুবাদ গ্রন্থখানা তাবলীগ জামাআতের আমীর হযরত মাওলানা আবদুল আযীয খুলনবীর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এ সিরি-জের অন্যান্য বইয়ের অনুবাদেও হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর আঘোষিত ছোবল তাঁর সে আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে দেয়নি।

এ হীন অনুবাদক ১৯৭৯ সালে ফাযায়েলে রমযানের অনুবাদ করে ভূতপূর্ব জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোতে জমা দেই। পুস্তকটির মুদ্রণ কার্য প্রায় সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পুস্তকটি তখন প্রকাশিত হয়নি। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার দফতর থেকে তা' প্রথমবার এবং ১৯৮৩ ও ৮৪ সালে হযরত হাফিজ্জী হুযুরের আশীর্বাণীসহ মহানবী স্মরণিকা পরিষদ থেকে আরো দু'বার মোট ৩টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর ছ'মাস পূর্বে মদীনা শরীফে এ অনুবাদ গ্রন্থখানা মদীনা শরীফে শায়খুল হাদীছের হাতে তুলে দিলে তিনি এজন্যে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে ছিলেন।

ফাযায়েল সিরিজের অনুবাদে বলতে গেলে প্রায় সর্বশেষে হাত দিয়েও মাওলানা সাখাওয়াতউল্লাহ্ টুমচরী প্রায় সবগুলি বইয়ের অনুবাদই সম্পন্ন করেন। তাঁর "তাবলীগী কুতুবখানা' চকবাজার বল্‌তে গেলে এই পুস্তকগুলির প্রচারের জন্যেই নিবেদিত। এছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সিলেটী সাহেব শায়খের "ফিতনায়ে মওদুদীয়তে"র বঙ্গানুবাদ করেন "মওদুদী ফেৎনা" নামে। বইটি কোলকাতা ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

মোটকথা, বাংলাভাষায় হযরত শায়খুল হাদীছের পুস্তকগুলি বহুলভাবে পঠিত হচ্ছে এবং সুদীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই তা' হচ্ছে। তাবলীগী-পাঠ্য হওয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মসজিদসমূহেও তা' জামাআতবদ্ধভাবে পঠিত পাঠিত হচ্ছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃখের সাথে বল্‌তে হয়, এ অনুবাদ কর্মগুলির অধিকাংশই সাহিত্যমানের নিম্নের। শায়খুল হাদীছের মূল রচনার সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা তার অধিকাংশেই অনুপস্থিত। এ ছাড়া বইগুলির ছাপা কাগজ ও উপস্থাপনাও সন্তোষজনক পর্যায়ের নয়। অনুবাদকর্মে অভিজ্ঞ কোন সাহিত্যিক আলিমের দ্বারা তা' অনূদিত হয়ে উচ্চমানের কোন প্রকাশনাসংস্থা থেকে প্রকাশিত হলে আজো তার চাহিদা হবে রেকর্ড পরিমাণ। অবশ্য, তাবলীগী জামাআতের বাংলাদেশী মুরব্বীদের আশীর্বাদ এবং পরামর্শও এব্যাপারে নেওয়ার প্রয়োজন হবে।

শায়খুল হাদীছের আত্মজীবনী "আপবীতী" অনূদিত হলেও এদেশের পাঠক সমাজে তার চাহিদা হবে এবং বাংলাভাষায় একটা মূল্যবান সংযোজন বলে বিবেচিত হবে। -অনুবাদক

টীকা ঃ

১. আপবীতি ২ ঃ পৃ. ১৩০-১৩১
২. সুন্দর আরবী টাইপে মুদ্রিত এ পুস্তকখানির শুরুতে শায়খের নির্দেশে এ লেখকের একটা দীর্ঘ ভূমিকাও জুড়ে দেয়া হয়। কোন কোন আরবী সাময়িকীতে এ সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্যও প্রকাশিত হয়।
৩. আপবীতি ২ ঃ পৃ. ১৩১ পৃ. ১১৩১
৪. ঐ. ২ঃ পৃ. ১৩৬
৫. উক্ত চারখানা কিতাবেরই শুরুতে এ লেখক লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা রয়েছে-যাতে উক্ত কিতাবসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে লেখা হলো।

৬. ১লা শাওয়াল তারিখে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে লিখিত পত্র।

৭. দীর্ঘকাল পরে ১৩৯২ হিজরীতে তা' মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

৮. কলেবর ৩৫৯ পৃষ্ঠা, প্রকাশনায় ঃ কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম, মহল্লা মুফতী সাহারানপুর, প্রকাশকাল ১৩৯৩ হিজরী (১৯৭৩ ইং)

৯. পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশক মওলবী মুহাম্মদ শাহিদ স্বয়ং শায়খের জীবনবৃত্তান্তও সংযোজিত করেছেন।

১০. পুস্তিকাটির ভূমিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বপ্নে নবী করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পেয়েই তিনি এ পুস্তিকা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

১১. ১৩ই ফেব্রুয়ারী '৭৬ ইং তারিখের পত্র।

১২. আপবীতি ২য় খণ্ডের ১৪৪-১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩. এতে স্বয়ং হযরত শায়খ তাঁর রচনাবলীর পরিচিতি, প্রতিপাদ্য বিষয়াবলী এবং রচনা শুরু ও সমাপ্তির তারিখ লিখেছেন। এ গ্রন্থের বক্ষমান অংশে কেবল সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিই দেওয়া হলো

১৪. এ অংশটুকু লেখকের "আরকানে আরবাআ'" গ্রন্থের রোযা শীর্ষক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত। "ফাযায়েল আওর উসকি কুওওতে তাছীর" শীর্ষক রচনাটির পৃ. ২৬৫ দ্রষ্টব্য

১৫. সওম ও কিয়াম রমযান সংক্রান্ত হাদীছে স্পষ্ট ভাষায়ই বলা হয়েছে।

من صام رمضان ایمانا و احتسابا الخ من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا الخ

১৬. মলফূজাতে হযরত দেহলবী।

১৭. হুদী হচ্ছে সেই গান-যা' উষ্ট্র চালক উটের মধ্যে পথ চলার গতি সৃষ্টির জন্যে গেয়ে উটের উৎসাহ বর্ধিত করে থাকে। হুদী খা মানে গজল গাওয়ার সেই রাখাল।-অনুবাদক

১৮. অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ রচনাগুলো এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন আপবীতি ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯-১৫০

একাদশ অধ্যায়

শায়খুল হাদীছের অমিয় বাণী

উলামায়ে রব্বানী ও মাশায়েখে রূহানী তাঁদের জীবনকথার চাইতে দীনের বিশুদ্ধ শিক্ষাবলী, আপন পড়াশোনার নির্যাস, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ঐকান্তিক উপদেশ ও পরামর্শসমূহের প্রচারের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। যেগুলোর উপর আমল করে তাঁদের জীবনে তাঁরা নিজেরা সফলকাম হয়েছেন এবং অন্যরাও দীনী ও রূহানী তরক্কী হাসিল করতে পারে, পারে অনেক সংকট ও ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে। এ সত্যের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা নীচে হযরত শায়খের কয়েকটি অমূল্য বাণী (মলফূযাত) এবং বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উর্দু কিতাবগুলো থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। যে' পাঠকগণের তাঁর সমুদয় কিতাব পাঠের সুযোগ হয়ে উঠেনি তাঁরাও এর দ্বারা উপকৃত হবেন। শায়খ-প্রণীত কিতাবাদির উদ্ধৃতি চয়নের জন্য আমরা দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক প্রিয়বর মওলবী আতীক আযাদ সাহেব বস্তভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

মলফূযাত (মুখনিঃসৃত বাণী)

তাসাওউফের তাৎপর্য

ফরমান ঃ "একদা সকাল দশটায় আমি আমার উপরের তলার কামরায় অত্যন্ত মশগুল ছিলাম। মওলবী নসীরুদ্দীন উপরে গিয়ে বল্লেন ঃ রঈসুল আহ্‌রার মাওলানা হাবীবুর রহমান লুধিয়ানভী রায়পুর যাওয়ার পথে এখানে এসেছেন কেবল আপনার সাথে মুসফাহা করে যেতে। আমি বললাম ঃ শীঘ্রই ডাকুন! মরহুম উপরে উঠতে উঠতে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ যাচ্ছি রায়পুর আর আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি। আগামী পরশু সকালে

ফিরবো। আপনি জবাব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে রাখবেন। তখনই জবাব শুনে নেবো। প্রশ্নটি হচ্ছে, "তাসাওউফ কী? ওটার তাৎপর্যই বা কী?

আমি মুসাফাহা করতে করতেই জবাব দিলাম, "কেবল নিয়্যাত বিশুদ্ধকরণ", এ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আদিতে انما الاعمال بالنيات আর অন্তে রয়েছে ঃ

ان تعبد الله كانك تراه ۱

আমার এ জবাব শুনে তিনি তো হতবাক! বললেন, দিল্লী থেকে ভাবতে ভাবতে এসেছি যে, তুমি এরূপ জবাব দিলে, আমি ওরূপ পাল্টা প্রশ্ন করবো, আবার তুমি পাল্টা প্রশ্ন করলে আমি ঐরূপ জবাব দেবো। তুমি যে এরূপ জবাব দিয়ে বসবে, তা তো আমি ভাবতেও পারি নি!

انما الاعمال بالنيات

ان تعبد الله كانك تراه

গোটা তাসাওউফের শুরু

গোটা তাসওউফের শেষ স্তর।

একেই তাসাওউফের পরিভাষায় 'নিসবত', 'ইয়াদদাশ্‌ত' ও 'হুযুরী' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

حضوری گرهمی خواهی از و غافل مشو حافظ * متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و امهلها

'হুযুরী লভিতে যদি মনে তব হয় আকিঞ্চণ,
তার থেকে গাফেল তুমি হইওনা তবে কোনক্ষণ।"

আমি আরও বল্‌লাম, মওলবী সাহেব! যত সাধ্যসাধনা আর ঝামেলা পোহানো, সব কেবল এ উদ্দেশ্যেই। যিকর বিল জেহের বা সশব্দ যিকির এ উদ্দেশ্যেই, মুজাহাদা–মুরাকাবার উদ্দেশ্যও তা–ই। আর যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এ দৌলত দান করেছেন, তার আর কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই।"

সময়ের সদ্ব্যবহার

বলেন ঃ সময় অত্যন্ত মূল্যবান। জীবনের অবসর মুহূর্তগুলোর কদর করা চাই। হাদীছে আছে ঃ

فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لاخرته

অর্থাৎ বান্দার উচিত তার নিজের জন্য নিজের পাথেয় সঞ্চয় করা—জীবনকালে মৃত্যুর জন্য, যৌবনে বার্ধক্যের জন্য, দুনিয়ায় আখিরাতের জন্য। কবির ভাষায় ঃ

تیرا هر سانس نخل موسی هے
یه جزرو مد جواهر کی لڑی هے

তোমার প্রতিটি শ্বাস খেজুর গাছের মতো হযরত মূসার
প্রতিটি লহমা তব জিন্দেগীর মালা যেন মনি ও মুক্তার।

উবুদিয়ত ও ইতাআতের সুফল

ফরমান ঃ "বন্ধুগণ! মালিকের সম্মুখে নতজানু হয়ে যাও, সর্ব চরাচর তোমার কাছে নতি স্বীকার করবে। সাহাবায়ে কিরামের কাহিনী সর্বজনবিদিত। একদা আফ্রিকার শ্বাপদ সংকুল জঙ্গলে মুসলমানগণের ছাউনী স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল। সেনাপতি হযরত উক্‌বা (রা.) জনা কয়েক সাহাবীকে নিয়ে জঙ্গলের এক স্থানে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন ঃ

ایها الحشرات و السباع نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارحلوا فانا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه

"হে হিংস্রশ্বাপদ ও সরীসৃপরাজী! আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় সাহাবী এই জঙ্গলে অবতরণ করেছি। আমরা এখানে অবস্থান করবো, তোমরা অন্যত্র সরে যাও। তারপর আমরা যাকেই সম্মুখে পাবো, তাকেই হত্যা করবো।"

ঘোষণা তো নয়, যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ। শোনা মাত্র অরণ্যের হিংস্র-শ্বাপদগুলো নিজ নিজ শাবকগুলোকে কোলে করে দে ছুট! দেখতে দেখতে অরণ্য শ্বাপদশূন্য হয়ে গেল![২]

"বোস্তাঁ" কিতাবে একটা কিস্‌সা আছে, জনৈক, বুযুর্গ একদা বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে পথ চলেছেন দেখে এক ব্যক্তি ভড়কে গেল। তখন ঐ বুযুর্গ বল্‌লেন ঃ

تو از حکم داور گردن نه پیچ
که گردن نه پیچد ز حکم تو پیچ

"খোদার হুকুম থেকে তুমি কভু ফিরায়োনা ঘাড়
তাহলে এ বিশ্বে কেউ হবে না যে অবাধ্য তোমার।"

পশুসুলভ পাপাচার থেকে শয়তানী পাপাচার জঘন্যতর

ফরমান ঃ "পাপাচার দুই প্রকার ঃ (১) ও পশুসুলভ পাপাচার ও শয়তানী পাপাচার। পশুসুলভ পাপাচার হচ্ছে পানাহার ও কামজনিত পাপাচার। আর শয়তানী পাপাচার হচ্ছে অহংকার, অন্যকে হেয় জ্ঞান করা এবং নিজেকে শ্রেয় জ্ঞান করা। "রিসালায়ে স্ট্রাইক" নামক পুস্তিকায় আমি একথাই লিখেছি। মুফতী মাহমুদ সাহেব এ কথার উপর এই বলে আপত্তি তুলেছিলেন যে এতে প্রথমোক্ত পাপাচারগুলোকে লাঘব করে দেয়া হয়। কিন্তু আসলে তা' ঠিক নয়। কেননা, প্রথমোক্ত ধরনের পাপগুলো তো কান্নাকাটির দ্বারা মাফ হতে পারে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত পাপাচারগুলো থেকে তওবা খুব কমই নসীব হয়। মানুষ একে পাপাচার বলে মনেই করে না। এর ক্ষমা অনেক বিলম্বে হয়। এর দলীল হচ্ছে, হযরত আদম (আ.)-কে বৃক্ষের নিকবর্তী হতে বারণ করা হয়েছিল। কিন্তু ভুলক্রমে তিনি বৃক্ষের নিকটে চলে গিয়েছিলেন। তারপর তওবা করলেন এবং সে তওবা কবুলও হলো। ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল অহংকারবশে। প্রথম ধরনে আল্লাহ্র কাছে বিনীত ভাব এবং দ্বিতীয় ধরনে আল্লাহ্র মুকাবিলায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেলো। আমি স্বচক্ষে অনেক লোককে অনেক উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত দেখেছি যাতে ঈর্ষার উদ্রেক হতো, কিন্তু অন্যদের সমালোচনা ও তাদেরকে হেয় জ্ঞান করার কারণে তাঁরা নিজেরাই হতমান হয়ে গেছেন!

বুযুর্গগণের প্রথম জীবনের দিকে তাকাবেন

ফরমান ঃ "আমাদের বুযুর্গগণের কথা, "যারা আমাদের শেষ জীবনের দিকে তাকাবে তারা অকৃতকার্য হবে, আর যারা আমাদের শুরুর দিকে তাকাবে, তারা কৃতকার্য হবে।" কেননা, জীবনের প্রারম্ভকাল কাটে মুজাহাদা তথা সংগ্রাম সাধনার মধ্য দিয়ে আর শেষ দিকে বিজয়ের দরজাসমূহ খুলে যায়। এই বিজয়কালকে দেখে যে এটাকেই অনুকরণীয় আদর্শরূপে ধরে নিবে, সে কার্যক্ষেত্রে হতাশ হতে বাধ্য।" (এ বিজয়ের পিছনে যে কঠোর সংগ্রাম সাধনা রয়েছে, তাকেই অনুকরণ করে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে হবে। -অনুবাদক)

কঠোর সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্বশর্ত

ইরশাদ ফরমান ঃ

رنگ لاتی هے حنا پتهر یه رگڑ جانے کے بعد[৩]

দেখ, মেহ্‌দীর পাতাকে যখন পাথরে পিষে দেয়া হয়, তখনই তা' রঙ্গীন করে দেয়।, পাথরে না পিষে এমনিতেই পাতাগুলোকে রেখে দিলে তাতে কিছুই হবে না। হযরত মদনী (র.) বলতেন, মসজিদে-এজাবতে যিকির করতাম, মন চাইতো যে, মসজিদের দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে মাথা ফাটিয়ে দেই।"

বাহির-ভিতরের গরমিল

ফরমান ঃ আমরা তো বলার বা লেখার সময় নিজেদেরকে অধম, পাপীতাপী প্রভৃতি শব্দ নিজেদের বেলায় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা' একটা প্রথা ছাড়া আর কিছুই নয় (আসলে তো, মনে মনে আমরা নিজেদেরকে সেরূপ মনে করিনা) কিন্তু কেউ যদি ভরা মজলিসে কোন আপত্তি উত্থাপন করে বসে, মেজাজ চড়ে যায়। অথচ যদি মানবার মতো কথাই হয়, তা' হলে আবার অসন্তুষ্টি কেন? তা' তো শিরোধার্য করে মেনে নেয়াই উচিত। হুযূর (স)-এর ইরশাদ ঃ

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

'আমি সদাচরণের পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।'

বিশেষতঃ যারা যাকেরীনও ইজাযতপ্রাপ্ত (খিলাফতপ্রাপ্ত) তাদের আচার-আচরণ অন্যদের হিদায়েত লাভের কারণ হওয়া উচিত-বিদ্বিষ্ট ও বীতশ্রদ্ধ হওয়ার মত হওয়া উচিত নয়।

ভারসাম্য রক্ষা

ইরশাদ করেন ঃ "হাদীছ শরীফে আছে, মৃত ব্যক্তিদেরকে মন্দ বিশেষণে স্মরণ করো না, বরং তাদের গুণাবলীর আলোচনা কর। আমরা ভারসাম্য হারিয়ে এমনিভাবে সীমা অতিক্রম করে যাই যে, কাউকে তো প্রশংসা করে আকাশে উঠিয়ে দেই, আবার কারো নিন্দা করতে করতে তাকে পাতালেরও নীচে নামিয়ে দেই। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَنْ لاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

কারো প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় থেকে বিচ্যুত না করে। ন্যায়পন্থা অবলম্বন কর, কেননা এটাই তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতির নিকটবর্তী।'

যিকির ফিতনা থেকে বাঁচবার রক্ষাকবচ

ফরমান ঃ "আজ আমাদের মাদ্রাসাসমূহে ধর্মঘট প্রভৃতি যাবতীয় অনর্থের মূল কারণ হচ্ছে খানকাহী জিন্দেগীর অভাব। হাদীছ শরীফে আছে, ধরাপৃষ্ঠে যখন "আল্লাহ্ আল্লাহ্" বলার লোক শেষ হয়ে যাবে, তখনই কিয়ামত আসবে। মাদ্রাসাগুলির অস্তিত্বের ব্যাপারেও একথাটি প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র নাম যতই অমনোযোগিতার সাথে নেওয়া হোক না কোন্, তার একটা আছর বা প্রভাব থাকবেই। আমাদের মধ্যে আজ ইখলাস ও নিষ্ঠার অভাব ঘটেছে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করার সিল্‌সিলাকে প্রসারিত কর। যেখানে বহুলভাবে আল্লাহ্‌র নামের যিকির হবে, সেখানে ফিতনা থাকবে না। ফিতনা–ফাসাদের প্রতিরোধে আল্লাহ্‌র যিকির বাঁধের মত কার্যকরী। পুরাকালে দওরায়ে হাদীছের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুরসংখ্যক যাকেরও থাকতেন।"

আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের পথ খুবই সহজ

ফরমান ঃ "হাদীছ শরীফে আছে, অনেক এলোকেশী আলুথালু বেশধারী ধুলাচ্ছন্ন ব্যক্তি, যাদেরকে গলাধাক্কা দিয়ে দরজা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়–এমনও আছেন, তাঁরা যদি আল্লাহ্‌র উপর কসম খেয়ে বসেন, তবে আল্লাহ্ তাঁদের কসমের মর্যাদা রক্ষা করেন। রিয়াযত ও মুজাহাদা দ্বারাই মানুষ এ মর্যাদায় উপনীত হতে পারে। অপর হাদীছে আছে ঃ

عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ

"আমার বান্দা নফল ইবাদতের দ্বারা ক্রমেই আমার নিকট থেকে নিকটতর হতে থাকে, এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি তাকে মাহ্‌বুব বা প্রেমাস্পদরূপে গ্রহণ করি।" তারপর হাদীছের সংক্ষিপ্তসার হলো, তারপর তার হাত–পা অঙ্গ--প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা যা' কিছুই করে, তা' আল্লাহ্‌র মর্যী মুতাবিকই হয়।

তারপর হযরত শায়খ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথ বড়ই সহজগম্য। নিজের অভিজ্ঞতায়ও তাই জেনেছি এবং অন্যদেরকেও প্রত্যক্ষ করেছি। কবির ভাষায় ঃ

بعلم الله راه خدا بیش از دو قدم نیست
یك قدم بر نفسِ خود نه دیگرے بر کوئے دوست

"কসম খোদার রাহে খোদা দুই কদমের নয় কো বেশী
একটি কদম নফ্‌সে তোমার বন্ধুর গলি দ্বিতীয় পদই।"

তিনি বলেন ঃ

"ভাই! দেখ, যাই করো না কেন, আল্লাহ্‌র মর্যী অনুযায়ী করবে,' নিজের মর্যী ও অভিরুচি অনুযায়ী করবে না। কিছু করে লও! রমযানুল মুবারকে এর অনুশীলন করে লও! আমাদের বুযুর্গগণের মধ্যে কেউই একথা বলেন না যে, চাকুরী–বাকুরী বা ব্যবসা–বাণিজ্য করো না।৪

চয়নিকা ঃ শায়খের রচনাবলী থেকে

তাসাওউফের তাৎপর্য

তাসাওউফ হচ্ছে আমার গুরুজনদের সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্রত।

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق
هر هو سنا کے نداند جام و سندان باختن

"এক হাতে মোর শরীআতের শরাব পিয়ালা ধরি
আর হাতে মোর হামানদিস্তা কি মুশকিল মরি মরি!"

পংক্তিটি তাদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। তাঁরা একদিকে যেমন ফিক্‌হ্ ও হাদীছ প্রভৃতি যাহিরী ইল্‌মে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আয়িম্মায়ে হাদীছের সত্যিকারের উত্তরাধিকারী ছিলেন, তেমনি বাতেনী ইলম বা তাসাওউফের ক্ষেত্রেও তাসাওউফের ইমাম জুনায়দ বাগদাদী ও শিবলীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন। তাঁরা তাসাওউফকে হাদীছ ও ফিক্‌হ্‌র অনুসারী অনুগামী করে চালিয়েছেন এবং নিজেদের জীবনে তা' যথার্থভাবে অনুশীলন করে জগতবাসীকে দেখিয়ে গেছেন যে, তাসাওউফ আসলে হাদীছ ও ফিক্‌হ্‌রই একটি বিভাগ, এবং কালের বিবর্তনে যেসব বিদআতী প্রথা এতে সংযোজিত হয়ে পড়েছিল, তাঁরা তার সংস্কার সাধন করেছেন। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের কার্যক্রম দ্বারা তাসাওউফকে যাহিরী শরীআতের পরিপন্থী না বললেও ন্যূনপক্ষে তার চাইতে

ভিন্নতর কিছু বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। তাদের এ কার্যক্রম হয় বাড়াবাড়ি না হয় অজ্ঞতা প্রসূত।

প্রকৃত তাসাওউফ–যার অপর নাম ইহসান। হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রকাশ্য মজলিসে হুযুর (স)–কে প্রশ্ন করে লোকসমক্ষে তুলে ধরেছেন আর তা' হলো শরীয়তেরই সারনির্যাস বা মগজস্বরূপ। হযরত জিব্রাঈল (আ)–এর প্রশ্ন–'ইহ্সান কী?' এর জবাব সাইয়েদুল কাওনাইনের পাক ইরশাদ اَنْ تَـعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ "তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত এমনভাবে করবে যেন, তাকে তুমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছ।" ইহ্সানের অর্থ ও তাসাওউফের তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, ঐ একই সত্য সবারই অভীষ্ঠ ঃ

আরবী কবির ভাষায় ঃ

اوری بسعدی و الرباب انما

انت الذی تعنی و انت المؤمل

এখানে কবি বলছেন ঃ সা'দী বা রুবাব যে নামের প্রিয়ার কথাই মুখে উচ্চারণ করি না কেন, তার দ্বারা তুমিই যে আমার অভীষ্ঠ অন্য কেউ নয়।

এই তো গেল হাকীকতের কথা। তারপর যিকির, শোগল্, মুজাহিদা ও রিযাযতের যে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে চিকিৎসা–বিধান স্বরূপ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই মানুষের কল্‌বসমূহে মরিচা ধরছে এবং তার ব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যেভাবে ইউনানী হাকীমগণ ও আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির অনুসারী ডাক্তারগণ নিত্য–নতুন রোগের নিত্যনতুন ব্যবস্থাপত্র নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে এবং রোগীর অবস্থা অনুপাতে দিয়ে থাকেন, অনুরূপভাবে এই রূহানী চিকিৎসকগণ রূহানী ব্যাধিসমূহের জন্য প্রত্যেক রোগী ও জামানার অনুপাতে নতুন নতুন ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে, হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (র.)–এর অন্যতম প্রধান খলীফা হযরত মওলানা ওসীউল্লা সাহেবের রিসালা "তাসাওউফ আওর নিসবতে সূফিয়া" একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ দেখবার মত পুস্তিকা। তিনি তাতে লিখেন, হযরত আবূ ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া আনসারী শাফিঈ (র.) বলেন যে, তাসাওউফের ভিত্তি হচ্ছে হাদীছে জিবরাঈল। তাতে আছে ঃ

ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه (الحديث)

সুতরাং তাসাওউফ হচ্ছে ইহ্সানেরই অপর নাম।

তাসাওউফের মর্মকথা

তাসাওউফ হল একটি বিরাট ব্যাপার। শাস্ত্রবিদগণ তাসাওউফের সংজ্ঞা লিখেছেন এভাবে ঃ এটা এমন একটি বিদ্যা যদ্দ্বারা নফসের শুদ্ধি ও চরিত্রের স্বচ্ছতা অর্জিত হয় এবং যাহির ও বাতিন তথা ভিতর ও বাইরের গঠনের অবস্থাদি জানা যায়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন।

এবার আপনি নিজেই ভেবে দেখুন তো, এর মধ্যে ভুলটা কোথায়? নফসের শুদ্ধি সাধনটা ভুল কাজ, নাকি চরিত্রের পরিচ্ছন্নতা বিধানটা ভুল? নাকি যাহির-বাতিনের গঠন-প্রচেষ্টাটা জানা অনর্থক? নাকি চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনটাই অর্থহীন? অনুরূপভাবে চরিত্রগঠন, নিজেদেরকে সুকুমারবৃত্তিতে মণ্ডিত করা, ধর্মীয় বিধানের অনুকূল রুচিগঠন বা নিজেদেরকে শরীআতগত প্রাণ করে ফেলা-এর মধ্যে কোন্ কাজটি শরীআতবিরোধী? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর কোনটাই শরীআতবিরোধী নয়,বরং এর প্রত্যেকটিই কুরআন-সুন্নাহ্ মুতাবিক এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের অভিপ্রায় পূরণকারী।

মোদ্দা কথা, আমরা যে তাসাওউফের প্রবক্তা, এটা হচ্ছে সেই তাসাওউফ যাকে শরীআতের পরিভাষায় 'ইহ্সান' বলা হয়ে থাকে। একে ইল্মুল আখলাক বা চারিত্রিক বিদ্যা এবং 'তা'মীরুয্ যাহির ওয়াল বাতিন' বা 'ভিতর-বাহির গঠন' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটা একটা সুবিন্যস্ত ও নীতিমালাবদ্ধ ব্যাপার। এখানে মুরীদদের জন্য যেমন সুনির্দিষ্ট শর্তশরায়েত ও নীতিমালা আছে, তেমনি শায়খ বা পীরের জন্যও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও আদব-কায়দা রয়েছে। সেসব নীতিমালা ও আদব কায়দা রক্ষিত হলেই কেবল একে শরীআতের সারনির্যাস ও দীনের সারবস্তু বলে অভিহিত করা সঙ্গত হয়। আর যখন এসব শর্ত-শরায়েত ও আদব লঙ্ঘিত হয়, বরং তাসাওউফ-বর্হিভূত ব্যাপার স্যাপারকেও তাসাওউফভুক্ত করে নেয়া হয়, তখন তা' আর আমাদের আলোচ্য তাসাওউফ থাকে না, তাই 'সালিক' বা আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীর মধ্যে সেই ভেজালমিশ্রিত তাসাওউফের দুষ্টপ্রভাবের জন্য আসল তাসাওউফকে কোনমতে দায়ী করা চলে না। আর যদি কেবল এ কারণেই তাসাওউফের নাম শুনলে আপনার মেজাজ গরম হয়ে যায় যে,

এ নামটি নব-আবিষ্কৃত, তবে এ ব্যাপারটি কেবল তাসাওউফের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, এমন অনেক ব্যাপার আছে, যেগুলোর সাথে আপনিও সংশ্লিষ্ট আছেন, অথচ ইসলামের প্রাথমিক যুগে এগুলো তার বর্তমান নামে পরিচিত ছিল না। আমি বলি, যদি এর নামটি 'বিদআত' হয়েও থাকে, ঐ নামে অভিহিত ব্যাপারটি তো বিদআত নয়। আপনি তাকে 'ইহ্সান' বলবেন, অথবা 'ইলমুল আখলাক' বা চারিত্রিক বিদ্যা নামে একে অভিহিত করুন! আর যারা এর দ্বারা মণ্ডিত হবে, তাদেরকে 'মুহ্সিন', মুকার্রব বা 'মুখলিস' নামে অভিহিত করুন! ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল! কারণ এ সমস্ত শব্দে কুরআন ভরপুর। হাদীছেও এর উল্লেখ আছে।"[৫]

মুসলিম জাতির মুক্তি ও উন্নতির একমাত্র পন্থা

হযরত উমর (রা) যখন সিরিয়ায় যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথে এক স্থানে কর্দমাক্ত পানি সম্মুখে পড়লো। তিনি উট থেকে নেমে গেলেন। মোজা পা থেকে খুলে কাঁধের উপর রাখলেন এবং সেই পানির মধ্যে নেমে পড়লেন। উটের লাগাম তাঁর হাতে ধরা ছিল এবং সে তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছিল। হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) চীৎকার করে উঠলেন, আমীরুল মুমিনীন, সর্বনাশ করেছেন। সিরিয়াবাসীরা তো এমনটি করাকে খুবই দূষণীয় মনে করে থাকে। আমার মন চায় না যে, এ অবস্থায় আপনি শহরে গিয়ে উঠুন, আর শহরবাসীরা আপনাকে এ অবস্থায় দেখতে পাক। হযরত উমর (রা) তখন তাঁর বুকে একটি হাত মেরে বললেন ঃ আবূ উবায়দা! এমন কথা যদি তুমি ছাড়া আর কারো মুখে উচ্চারিত হতো, তবে আমি অবশ্যই তাকে শিক্ষণীয় শাস্তি দিতাম! আমরা হতমান ছিলাম, উপেক্ষার পাত্র ছিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ যে বস্তু দ্বারা আমাদেরকে সম্মানমণ্ডিত করেছেন, তা'ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে আমরা যদি সম্মান খুঁজি, তবে আল্লাহ্ আমাদেরকে হতমান করে ছেড়ে দেবেন। (মুস্তাদরাক হাকীম) প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্র কাছে সম্মান ও মর্যাদা। দুনিয়াবাসীদের চোখে হতমান হলেই বা কি, আর সম্মানিত হলেই বা কি?

لوگ سمجھیں مجھے محروم و تارد تمکین
وہ نہ سمجھیں کہ میرے بزم کے قابل نہ رہا

"লোকে আমায় যতই ভাবুক মর্যাদা মান নাই কো আমার
যতই ভাবুক যোগ্যতা মোর নাইকো তাহার সভায় বসার।......

নবী আকরম (সা.)–এ ইরশাদঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে লোকসমাজে সম্মানী হতে চায়, তার প্রশংসাকারীরা তার নিন্দাকারী হয়ে যায়।" তাই মুসলমানদের উন্নতি ও সম্মান এবং তাদের দুনিয়ার আগমনের সার্থকতা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং তাঁর সন্তোষজনক আমলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, অন্য কোথাও নয়, ইজ্জত–সম্মান–মুনাফা সব এরই মধ্যে রয়েছে। অবাক লাগে, মুসলামানদের জন্য আল্লাহ্র পাক কালাম এবং তাঁর রাসূলের সত্যবাণীসমূহের মধ্যে তাঁদের ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় জ্ঞান–বিজ্ঞান, সাফল্যের উপকরণ ও ভাণ্ডার রয়েছে, অথচ তাঁরা প্রতিটি ব্যাপারেই অন্যদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্যদের উচ্ছিষ্ট ভোগেই যেন তাদের গৌরব! এটা কি চরম নির্লজ্জতা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চরম বৈপরিত্য নয়? তার দৃষ্টান্ত কি এরূপ নয় যে, কারো ঘরে একজন প্রথিতযশা হাকীম বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রয়েছেন, অথচ সে তার রোগের চিকিৎসার জন্য কোন হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়?

মোদ্দাকথা, মুসলমানদের কল্যাণ কেবল ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রীতিনীতির অনুসরণ এবং নবী করীম (সা.)–এর আদর্শ ও সল্ফে সালেহীনের তরীকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটাই পরকালে তার কাজে আসবে। এটাই দুনিয়ায় তার উন্নতির পথ। এরই আমল করে (তাদের পূর্বপুরুষগণ) উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের সে বিবরণ ও ঘটনাবলী আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে। কোন ইতিহাস জানা লোকেই তা' অস্বীকার করতে পারবে না। এরই বিরুদ্ধাচরণে মুসলমানদের ধ্বংস, ইহকাল ও পরকালের অবনতি ও অবমাননা অপরিহার্য—চাই যতই প্রস্তাবাদি উত্থাপন করা হোক–পাশই করা হোক, পত্রিকায় যত ইচ্ছা প্রবন্ধাদি লেখা হোক, আর যতই উৎসাহে আনন্দে অধীর হয়ে তা' পঠিতই হোক, সবই নিরর্থক–বেকার। মুসলমানদের উন্নতি ও মঙ্গলের একমাত্র পথ পাপাচার পরিহার এবং ইসলামের সাথে একাত্ম হওয়া। এছাড়া অন্য কোন পথই তাকে মঞ্জিল–মকসূদ বা অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে না।

এখানে আর একটি ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য, আজ ইসলামকে যদি বিকৃতও করা হয়, এর সারা বিধি–নিষেধকে মৌলবীয়ানা ইসলাম, সন্ন্যাসীর ধর্ম, মোল্লাসুলভ সংকীর্ণতা বলে উড়িয়ে দেয়া হয়, কিন্তু প্রাথমিক যুগের যে মুসলমানগণ হাজার হাজার বিজয় গৌরব অর্জন করেছিলেন, লাখ লাখ কোটি কোটি লোককে মুসলমান বানিয়ে সেসব জনপদে ইসলামের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তাঁরা এ মৌলবীয়ানা

ইসলামের উপরই আমল করতেন, মোল্লাদের চাইতেও বেশী 'সংকীর্ণমনা' তাঁরা ছিলেন, সেখানে দ্বীন থেকে ইঞ্চি পরিমাণ সরে দাঁড়ানোকেও ধ্বংস বলে গণ্য হতো, সেখানে যাকাত আদায় না করা হলে যুদ্ধ করা হতো, সেখানে জায়েযজ্ঞানে মদ্যপানের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড এবং হারামজ্ঞানে মদ্যপান করলেও বেত্রাঘাত করা হতো, তাঁরা বলেন, আমাদের মধ্যে কেবল সেই মুনাফিকই নামায তরক করতে পারে, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত অর্থাৎ কিনা সাধারণ মুনাফিকদেরও নামায তরক করার সাহস ছিল না, সেখানে কোন গুরুতর ব্যাপার বা কঠিন সমস্যা দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁরা নামাযের দিকে ধাবিত হতেন।"[৬]

একটি ঐকান্তিক নসীহত

"আমার একটি উপদেশ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুন, সর্বদা এমন ব্যাপারেই কেবল মন্তব্য করবে, যার অন্দর বাহির সবদিক তোমার পুরাপুরি জানা আছে। দুই. বিবদমান ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল তখনই সালিশী করা সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষের সমস্ত দলীল-প্রমাণ জানা থাকবে। অবশ্য, শরীয়তের কোন স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে যদি কিছু হয় তবে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র রেয়াত করার প্রশ্নই উঠে না, কেননা, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের খেলাফ কোন বক্তব্যই বিবেচনাযোগ্য নয় বরং মুকাল্লিদ বা কোন মযহাবের ইমামের অনুসারী ব্যক্তির জন্য প্রাচীন যুগের ফিক্হবিদ ইমামগণের অভিমতের বিরুদ্ধাচরণেরও কোন অবকাশ নেই; কিন্তু যেখানে মাসআলাটি ইস্তেম্বাত-ইজ্তিহাদ বা শরয়ী গবেষণার উপর নির্ভরশীল এবং বিবদমান প্রত্যেকের বক্তব্যের পক্ষেই কুরআন-হাদীছের দলীল থাকে, সেখানেও সবদিক না চিন্তা করে হুট করে পক্ষে বা বিপক্ষে একটা মন্তব্য করে দেয়াও একটা বোকামি। আমি কঠোরভাবে তোমাদেরকে বারণ করছি, হকপন্থীদের বিরুদ্ধাচারণ অনেক অনেক চিন্তাভাবনা করা ছাড়া কখনো করবে না। বহু চিন্তাভাবনার পরই কেবল তাঁদের ব্যাপারে মন্তব্য করবে এবং যতদূর সম্ভব তা' এড়িয়েই চল্‌বে।

হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) যাঁকে দ্বিতীয় উমর বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে-সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে কী উত্তম মীমাংসাই না দিয়েছেন। তিনি বলতেন ঃ

تلك دماء طهر الله ايدينا منها فلا نلوث السنتنا بها

"তাঁদের রক্তপাত থেকে আল্লাহ্ আমাদের হাতসমূহকে পবিত্র রেখেছেন,

সুতরাং আমাদের রসনাকে আমরা এর মধ্যে জড়িয়ে অপবিত্রও কলঙ্কিত করবো না।" যদি বলা হয়, সাহাবায়ে কিরামের শান ও মর্যাদা যেহেতু অনেক উঁচু, তাই অন্যদেরকে তাঁদের সাথে তুলনা করা চলে না, তবে আমি বলবো, সেখানে মন্তব্য থেকে আত্মরক্ষাকারীও হচ্ছেন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মতো জলিলুল কদর ও মহাসম্মানিত তাবেয়ী। (আমাদের শ্রেণীর সাধারণ ব্যক্তি নয়।–অনুবাদক)। হযরত খিযির ও হযরত মূসা (আ.)–এর কিসসা সুবিদিত। কুরআন পাকে তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীছে নবী করীম (সা.)–এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ'লা নাবিয়্যিনা ও আলায়হিস্‌সালাতু ওয়াস সালাম)–এর উপর রহম করুন, তিনি যদি মৌনতা অবলম্বন করতেন তবে হযরত খিযির–এর আরো অনেক রহস্যজনক ঘটনা জানা যেতো। হুযূর আকদাস (স.) ইরশাদ করেন, হযরত ঈসা (আ.)–এর বাণী ঃ ব্যাপারসমূহ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ যেগুলোর হিদায়েত ও কল্যাণকর হওয়াটা সুস্পষ্ট, এগুলোর অনুসরণ কর! দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত ব্যাপার যেগুলো গুমরাহী ও অনিষ্টকর হওয়াটা সুস্পষ্ট, সেগুলোকে পরিহার কর! তৃতীয় ঃ ঐ সমস্ত ব্যাপার যেগুলোর হিদায়েত বা গুমরাহীর ব্যাপারে মতভেদ আছে। ওগুলোকে ওগুলোর ব্যাপারে অভিজ্ঞমহলের হাতে ছেড়ে দাও!

(رواه الطبرانی و رجاله موثو قون کذا فی مجمع الزوائد)

হুযূর আকদাস (সা.)–এর ইরশাদ ঃ যে ব্যক্তি ফাতাওয়া দেওয়ার ব্যাপারে বেশী সাহসী ও বেপরোয়া, সে জাহান্নামের ব্যাপারে বেশী সাহসী ও বে–পরোয়া (দারেমী)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মসউদ (রা.)। ফরমান ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবেই ফাতাওয়া দিয়ে বসে সে একটা আস্ত পাগল।[৭] (দারেমী)

একটি ঈমানবর্ধক ঘটনা

হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব একজন মশহুর তাবেয়ী' এবং একজন বড় মুহাদ্দিছ হিসাবে তিনি গণ্য হন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবি বিদাআ' নামক এক ব্যক্তি তাঁর কাছে ঘনঘন যাতায়াত করতেন। একবার বেশ কয়েকদিন তিনি তাঁর দরবার থেকে অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর যখন তিনি পুনরায় হাযির হলেন, তখন হযরত সাঈদ তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন যে, তাঁর স্ত্রীর

ইন্তিকালের দরুন তিনি খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, আমাকে জানাওনি কেন? তা' হলে আমিও জানাজায় উপস্থিত হতাম।

উক্ত ব্যক্তি বলেন, তারপর আমি যখন তাঁর দরবার থেকে উঠে চলে আসবো, এমন সময় জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আর কোন বিবাহ করেছো? আমি আরয করলাম, "হযরত! আমার কাছে কে তার মেয়ে বিয়ে দেবে? আমার সম্বল দুই তিন আনার বেশী নেই।" তিনি বললেন, আমি সে ব্যবস্থা করছি। যেমন বলা, তেমনি কাজ। সাথে সাথে খুৎবা পড়ে অত্যন্ত সাধারণ মোহরানা মাত্র ৮/১০ আনা ধার্য করে তাঁর কন্যাকে আমার কাছে বিয়ে দিয়ে দিলেন। (তাঁর মতে হয় তো ঐ পরিমাণ মোহরেই বিবাহ জায়েয ছিল। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুসারে আড়াই টাকার কম মোহরে বিবাহ বৈধ হয় না। অন্য কোন কোন ইমামের মতে, এরূপ বৈধ।)

বিবাহকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর আমি উঠে চলে আসলাম। বলাবাহুল্য, তখন আমি খুবই উৎফুল্ল ছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম, রোখসতির জন্যে কার কাছ থেকে ধার চাইবো, বা কি করবো? এরূপ ভাবনা চিন্তায় সন্ধ্যা নেমে এলো। আমি সেদিন রোযা অবস্থায় ছিলাম। মগরিবের সময় ইফতার করলাম। নামাযের পর ঘরে এসে প্রদীপ জ্বালালাম। রুটি এবং যয়তুনের তৈল ঘরে মওজুদ ছিল। সবেমাত্র খেতে বসেছি, এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কে? জবাব এলো ঃ 'সাঈদ।' আমি ভাবতেও পারিনি যে হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়িব আমার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। কেননা, বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যে তিনি তাঁর বাড়ি ও মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাননি। বাইরে এসে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব দাঁড়িয়ে আছেন! আমি আরয করলামঃ 'আমাকে ডাকালেই আমি হাযির হয়ে যেতাম হযরত!' বললেনঃ "না, আমার আসাটাই সঙ্গত ছিল।" আরয করলাম ঃ 'হযরতের কী হুকুম?' বললেন ঃ ("ভেবে দেখলাম,) এখন তুমি বিবাহিত। রাতে একাকী শয়ন শোভনীয় নয়। এজন্যে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এলাম।" একথা বলেই নিজ কন্যাকে দরজার ভিতর ঠেলে দিয়ে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন। মেয়েটি লজ্জায় পড়ে গেল। আমি ভিতর দিক থেকে দরজায় খিল আটকিয়ে দিলাম এবং প্রদীপের সম্মুখে রক্ষিত রুটি ও তৈল যেন সে দেখতে না পায় এজন্য সরিয়ে ফেললাম। তারপর ঘরের ছাদে উঠে প্রতিবেশীদেরকে ডেকে জড়ো করলাম। তারপর বললাম, হযরত সাঈদ তাঁর

মেয়েকে আমার কাছে বিবাহ দিয়েছেন এবং এইমাত্র তিনি নিজে এসে তাঁর মেয়েকে আমার ঘরে রেখে দিয়ে গেলেন! আমার মুখে একথা শুনে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বিস্ময়মাখা কণ্ঠে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সত্যিই কি তাঁর মেয়েটি এখন তোমার ঘরে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, তাই।

খবরটি পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লো। আমার মা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। তিনি আমাকে শাসিয়ে বল্‌লেন, দেখ, তিনদিন পর্যন্ত তুই বৌয়ের গায়ে হাত দিবি তো, আমি তোর মুখই আর দেখবো না। এ তিন দিনের মধ্যেই আমি বৌ-বরণের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেল্‌বো।

তিনদিন পর যখন বাসরঘরে একত্রিত হলাম, তখন লক্ষ্য করলাম, মেয়েটি পরমা সুন্দরী। কুরআন শরীফ তার কণ্ঠস্থ রয়েছে এবং সুন্নতে রাসূল সম্পর্কেও তার পাকা জ্ঞান রয়েছে। স্বামীর হক সম্পর্কেও সে সম্যক সচেতন।

এভাবে একমাস অতিবাহিত হলো। এর মধ্যে হযরত সাঈদও আর আমার ঘরে আসেননি বা আমিও তাঁর সাথে আর দেখা করতে যাইনি। একমাস পর যখন আমি তাঁর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর ওখানে দরবার জমেছিল। লোক-জনের ভিড়ের মধ্যে আমি সালাম করেই অন্য কিছু না বলে চুপ করে বসে গেলাম। তারপর লোকজন চলে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ মেয়েটিকে কেমন লাগলো হে? বললাম ঃ খুবই ভাল। বন্ধুরা তা' দেখে প্রীত, শত্রুরা জ্বলেপুড়ে মরছে। বললেন ঃ কোন ব্যাপার উল্টাসিধা দেখলে বেত্রাঘাতে সারিয়ে নেবে। আমি চলে আসলাম। পিছনেই তিনি এক ব্যক্তিকে ২০,০০০ দিরহাম (প্রায় পাঁচ হাজার টাকা) দিয়ে আমার কাছে পাঠালেন। তাঁর এ কন্যাটির জন্য বাদশাহ্ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান তাঁর পুত্র ওলীদের জন্য প্রার্থী ছিলেন। ওলীদ পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপেও মনোনীত (যুবরাজ) ছিলেন। এতদসত্ত্বেও হযরত সাঈদ সম্মত হননি। আবদুল মালিক তাতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং পরে এক বাহানায় প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তাঁকে একশ'টি বেত্রাঘাত করিয়ে ঠাণ্ডা পানি তাঁর উপর নিক্ষেপেরও শাস্তি দিয়েছিল। (ফাযায়েলে যিকির, ১৫৪-৫৫)।

মুসলমানের গীবত ও মানহানি

'আল্লাহ্‌র রাস্তা কেবল জিহাদ, নফল নামায ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জরুরী আমল ও ইবাদতের পর নেক নিয়্যাতে যে-কোন কাজ করলেই তার দ্বারা যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কাম্য হয়, মানুষের হক আদায় করা তার

উদ্দেশ্য হয় তবে তাও আল্লাহ্‌রই রাস্তা। যারা মনে করেন যে, দীনদারী কেবল ইবাদতে মশগুল থাকারই নাম, আর দুনিয়াদারী কাজে মশগুল হওয়াটা তার পরিপন্থী, তাঁরা ভুলের মধ্যে রয়েছেন। নির্ভরযোগ্য আলিমগণের কেউই একথা বলেন না যে, দুনিয়ার প্রয়োজনীয় অবলম্বনাদি গ্রহণ করা যাবে না বা বর্জন করতে হবে। অবশ্য সেসব দুনিয়াদারী কাজও দুনিয়াদারীর উদ্দেশ্যে নয়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে করতে হবে–মান–মর্যাদা বৃদ্ধি, গর্ব, অহঙ্কার বা লোকচক্ষে সম্মানিত হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। এতসব সত্ত্বে অপর দিকে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রত্যেকের সম্পর্কেই তার উদ্দেশ্য ভাল নয় বলে কুধারণা পোষণ করাটাও ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا -

"হে ঈমানদারগণ, অনেক অনেক ধারণা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, অনেক ধারণাই পাপ এবং তোমরা একের অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো না অর্থাৎ গোপনে গোপনে কারা দোষের অনুসন্ধান করে বেড়িয়ো না এবং তোমরা একে অপরের গীবত করো না।" (৪৯ ঃ ১২)

সাধারণভাবে আমাদের অবস্থা হলো এই যে, যে ব্যক্তি আমাদের মন মত চলে সেই সরলমনা, মুত্তাকী, পরহেযগার, কিন্তু যখনই ঐ ব্যক্তিই আমাদের মতের বিরুদ্ধে কিছু একটা করে বসে এমনি সে দালাল, ইংরেজের পা–চাটা গোলাম, হিন্দুঘেঁষা, স্বার্থপর, মতলববাজ, মীরজা'ফর৮, মক্করবাজ, প্রতারক, ইংরেজের বেতনভুক বা কংগ্রেসের বেতনভুক, হেন এমন কোন দূষণীয় শব্দ নেই–যা, তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা হয়। অথচ নবী করীম (সা.)–এর ইরশাদ হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষ প্রকাশ করে দেন; এমন কি সে তার নিজ ঘরে (গোপনে) কোন দোষ করলেও তিনি তাকে অপমানিত করেন।[৯]

হজ্জ ঃ প্রেম ও আত্মোৎসর্গের মনোরম দৃশ্য

হজ প্রকৃতপক্ষে দু'টি দৃশ্যের নমুনাস্বরূপ। এর প্রতিটি ব্যাপারেই দু'টি

হাকীকত নিহিত রয়েছে। এর একটি হচ্ছে মৃত্যু ও মরণোত্তর অবস্থার দৃশ্য, আর অপরটি হচ্ছে প্রেম ও তার অপূর্ব অভিব্যক্তি ও আত্মার সত্যিকারের প্রেমে মাতোয়ারা হওয়ার দৃশ্য।

মৃত্যু এবং মরণোত্তর দৃশ্য হচ্ছে এভাবে যে, মানুষ যখন তার ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন প্রিয়জনদেরকে পিছনে ফেলে বাড়ি থেকে হজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়, তখন সে যেন অপর কোন দেশ বা অপর জগতের পানে বেরিয়ে পড়ে। যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে সে আকণ্ঠ ডুবে ছিল, তার সেই প্রিয় ঘরবাড়ি, খেতখামার, বাগ-বাগিচা, বন্ধুবান্ধব, সবই পিছনে পড়ে থাকে-যেমনটি মানুষ করে থাকে তার মৃত্যুর সময়টিতে। সবকিছুকেই বিদায় দিয়ে একাকী ছুটতে হয় কবরের পানে। হজে রওয়ানা হওয়ার সময় এই একটি কথা ভাববার মতো যে আজ যেভাবে সবকিছুর মায়া কাটিয়ে সাময়িকভাবে চলে যেতে হচ্ছে, তেমনি শীগগীরই একদিন চিরতরে সবকিছুর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য প্রেমের অভিব্যক্তির। হাজীর অবস্থার মধ্যে তা' এতই সুস্পষ্ট যে, এজন্য কোন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রযোজন করে না। বান্দার সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে দু' প্রকারের ঃ একটা হচ্ছে তাঁর দাসত্ব ও তাঁর প্রতি নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই মালিক। এ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নামাযের মধ্যে যা আগাগোড়া একান্তই বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও দাসত্বের অভিব্যক্তি। এজন্যে নামাযের মধ্যকার যাবতীয় কার্যকলাপে এ সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে। বান্দা শোভনীয় ও সঙ্গত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে অত্যন্ত ভক্তি ও গাম্ভীর্যের সাথে শাহী আদবের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে আহ্‌কামুল হাকিমীনের দরবারে হাযিরী দেয়। উযূ ও পাক পোশাক- পরিচ্ছদের সাথে অত্যন্ত আদবের সাথে প্রথমে দুই কানের উপর হাত রেখে নিজের দাসত্ব এবং মহামহিম আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি করে, তারপর হাত বেঁধে তার আর্জি পেশ করে। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে। তারপর ভূমিতে মাথা লুটিয়ে নিজের দীনতা প্রকাশ করে এবং মুখে আপন প্রভুর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি করতে থাকে। গোটা নামাযের মধ্যে সে এমন কোন কাজই করে না-যাতে প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজের দীনতার বিরোধী· কোন হাবভাবের প্রকাশ ঘটে।

দ্বিতীয় সম্পর্ক হচ্ছে ইশক ও মহব্বত-ভালবাসা ও অনুরাগের। কেননা, তিনি হচ্ছেন প্রতিপালক, নিয়ামতদাতা, পরম উপকারী, দয়ালু, সৌন্দর্য ও পূর্ণতার যত

গুণ সব গুণেরই তিনি আধার। এদিকে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে সহজাত প্রেমপ্রীতি।

ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں * مرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا

"রূপ-পূজারী লিখা ছিল আদিতেই ভাগ্যে আমার
(তাই তো) বালা থেকেই মেজাজ আমার প্রেমপ্রীতির মস্ত আঁধার।"

جو چشم کہ بے نم ہو وہ ہو کور تو بہتر * جو دل کہ ہو بے داغ وہ جل جائے تو اچھا

"যে আঁখিটি হয় না সজল অন্ধ হওয়াই শ্রেয় তাহার
যে হৃদে নেই প্রেমের সুধা জ্বলে যাওয়াই শ্রেয় তাহার।"

ترے فراق میں جینا بشر کا کام نہیں * ہزار شکر کہ اس عمر کو دوام نہیں

"তোমার বিরহে যাতনা এমন, মানুষ কভু বাঁচতে পারে?
হাজার শোকর মরণ আছে পারবো যেতে ঐ ওপারে।

হজে সেই প্রেম প্রীতির সম্পর্কেরই অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। সফরের শুরুতেই সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, সকল প্রিয়জন ও ঘরবাড়ির মায়া কাটিয়ে বন্ধুর গলির দিকে বেরিয়ে পড়তে হয়, মরু-বিয়াবানে, অলিতে-গলিতে পাগলের মতো ঘোরাঘুরি করতে হয়। এ দু'টিই তো প্রেমিকের কাজ ঃ

ما و مجنون هم سبق بودیم در دیوان عشق
او بصحرا رفت و ما در کوچه ها رسوا شدیم

প্রেমের কাব্য পড়তে গিয়ে আমরা দু'জন সমপাঠী
মজনু মরু বিয়াবানে, আমি অলি-গলি ঘাটি।

কেন এই বন্ধন মুক্তি? কিসের ঐ দুর্বার আকর্ষণ? কেন মন মাতোয়ারা, কিসের ঐ অস্থিরতা, প্রাণ-চাঞ্চল্য? এসব শুধু এ জন্যে যে, প্রেমাস্পদের দরজায় প্রেমিকদের ভিড় জমানোর নির্দিষ্ট সময়টা আসন্ন।

اجازت ہو تو میں بھی شامل اں میں ہو جاؤں
سنا ہے کل ترے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا

"শুনতে পেলাম কালকে নাকি তোমার হেথায় প্রেমের হাট
হয় যদি গো আজ্ঞা সদয় করবো আমিও প্রাণ লোপাট।"

আর যখন এই ইচ্ছা ও আগ্রহ নিয়েই ঘরবাড়ির মায়া কাটানো, তখন বুঝে নিতেই হবে যে প্রেমের পথে বিপদাপদ অপরিহার্য।

سالک راه محبت کا خدا حافظ هے

اس میں دو چار سخت مقام آتے هیں

"প্রেমের পথের পথিকজনার রক্ষাকারী খোদা স্বয়ং
চলার পথে আসবেই তার দু'চার ঘাঁটি শক্ত বিষম।"

প্রেমের জন্যেই যখন এ মুবারক সফর, তখন পথের সকল সঙ্কট প্রেমে মাতোয়ারা মন নিয়ে হাসি মুখেই বরণ করে নিতে হবে।

الفت میں برابر هے جفا هو که وفا هو

هر چیز میں لذت هے اگر دل میں مزا هو

প্রেমের পথে মিলন এবং বিরহই দু-ই সমান
রস আছে সবকিছুতে রস থাকলে হৃদয় বিদ্যমান।

তারপর ইহরামেও সেই প্রেমে মাতোয়ারা মনের অভিব্যক্তি। না মাথায় টুপী, না গায়ে জামা; ফকীরসুলভ বেশ ভূষা! না আছে তাতে সুগন্ধি, না পারিপাট্য। এক পাগলসুলভ বেশভূষা–যা' প্রেমিক চিত্তের–ব্যাকুলতা বিহ্বলতাকেই প্রকাশ করছে।

نه رکهه لباس کا الجهاؤ تن په دست جنون

کیا هے چاک گریباں تو پهاڑ دامن بهی

"পাগলারে হাত রাখিস নারে গায়ের পরে ঝক্কি জামার
ছিঁড়না ফেলে আঁচলও তুই ছিঁড়লে যখন জামার কলার।

উচিত তো ছিল ঘর থেকে বেরোতেই যেন এ অবস্থা শুরু হয়ে যায়। এজন্যে কোন কোন আলিমের মতে, ঘর থেকেই ইহ্‌রাম বেঁধে যাওয়া উত্তম, কিন্তু ইহ্‌রামের পর অনেক জিনিসই বর্জন করে চলতে হয় তাই কোন কোন সুখী মানুষের জন্যে এ ধরনের পোশাক–পরিচ্ছদ বেশ কষ্টকর বোধ হয়। এজন্যে দয়ালু আল্লাহ্‌র রহমত অনুমতি দিয়ে রেখেছে যে, কেউ চাইলে শুরু থেকেই ইহ্‌রাম না বেঁধেও যেতে পারবে। তবে বন্ধুর গলি নিকটবর্তী হতেই প্রেমের আদব তাকে মান্‌তেই হবে এবং আলু থালু কেশে সত্যিকারের প্রেমিকের বেশেই তাকে সেখানে প্রবেশ করতে হবে।

হুযূর পাক (সা.)-এর পাক ইরশাদে একথাটি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে ঃ

"الحاج الشعث التفل"

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গর্বভরে তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ

انظروا الى زوار بيتى قد جاؤنى شعثا غبراً

"দেখ দেখ, আমার ঘরের প্রেমিক যিয়ারতকারীদের প্রতি দেখ! তারা আমার কাছে এসেছে আলুথালু কেশে ধুলি ধূসরিত হয়ে।"

সেই প্রেমের মতোয়ারা মুখে "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক লা শরীকা লাকা লাব্বায়েক" ধ্বনি তুলে চীৎকার করতে করতে ফরিয়াদ জানাতে জানাতে গিয়ে হাযির হয়। হুযূর (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন তাঁর বাণীতে ঃ

"الحج العج و الثج "

"হজ্জ্ব হচ্ছে চীৎকার ধ্বনি ও কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করার নাম। বলাবাহুল্য, মিনতি ও ফরিয়াদের সুরে চীৎকার করাটা হচ্ছে প্রেমের প্রাণ স্বরূপ।

نالہ کر لینے دے للہ نہ چھیڑیں احباب
ضبط کرتا ہوں تو تکلف سوا ہوتی ہے

"কাঁদার মতো দাও কাঁদিতে কেউ করো না গণ্ডগোল
ধৈর্য ধরে চুপ থাকিলে প্রাণ বাঁচে না বক্ষে শূল!

এই অস্থিরতার মধ্য দিয়ে ফরিয়াদ ও কান্নাকাটি করতে করতে শেষ অবধি সে পৌছে যায় প্রেমাস্পদের নগরীতে—মক্কা মুয়ায্যামায়।

جذب دل نے آج کوئے یار میں پہنچا دیا
جیتے جی میں گلشن جنت میں داخل ہو گیا

"বন্ধু গেহে পৌছে গেনু অবশেষে প্রাণের টানে।
থাকতে বেঁচে পৌছে গেনু বেহেশতেরই ফুল-বাগানে।"

দহিত প্রাণের কোন লোক-যার অন্তরে প্রকৃতই প্রেমের যখন রয়েছে যখম প্রেমাস্পদের ঘর পর্যন্ত পৌছে যেতে সক্ষম হয়, তখন তার মনমগজের অবস্থা কী দাঁড়ায় আর সে কী ভাবনা চিন্তা করে তা' ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য নেই। তারপর তার কার্যকলাপ, অঙ্গভঙ্গি, হাবভাব আর কোন বাধাধরা নিয়মের ছক মেনে চলে

না। কখনো বা সে প্রেমাস্পদের ঘর প্রদক্ষিণ করে, কখনো বা সে ঘরের দরজা-চৌকাঠ প্রাচীরে চুমু খায়, চোখ মলে, কপাল ঠুকে, মাথা আছড়ায়। কবির ভাষায় ঃ

سر کو وحشت میں پہاڑوں سے بچا کر لایا
در دیوار سر کوچہ جاناں کے لئے

অক্ষত শির নিয়ে এনু ডিঙ্গিয়ে সব বিজন পাহাড়,
ঠুকবো এ শির প্রাচীরেতে যখন যাবো গলিতে তার।

কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে ধরে কান্নাকাটি করাও সে প্রেমিকসুলভ মাতোয়ারা মনেরই অভিব্যক্তি। কেননা, প্রিয়ার বা প্রেমাস্পদের আঁচল ধরাও প্রেমেরই এক বহিঃপ্রকাশ।

ائے ناتوان عشق تجھے حق کی قسم
دامن کو یوں پکڑ کہ چھوڑایا نہ جاسکے

"প্রেমের মরা দিচ্ছি তোমায় সুন্দরেরই কসম শুনো,
ধরো আঁচল এমনি জোরে যায় না যেন আর ছাড়ানো।"

তারপর সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানোও সেই প্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিকের অস্থিরতারই এক অনন্য দৃশ্য! না আছে মাথায় টুপী, না আছে গায়ে জামা, পরণে পাজামা! পাগলের মতো কখনো এদিকে আবার কখনো ওদিকে ছুটে যাচ্ছে।!

اب نہیں دل کو کسی صورت قرار
اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا

অশান্ত মন মানছেনা আর নাই যে সীমা চপলতার
চপল আঁখি করলো জাদু, কী যে তাহার জাদুর বাহার!

তারপর মিনায় গিয়ে শয়তানদের উদ্দেশ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ সেই উন্মাদমনের উন্মাদনার শেষ অঙ্ক। এই প্রেমিকদের সকলেরই এ পালাটি আসে। প্রেমিকের উতলা মন যখন ব্যাকুল হয়ে উঠে, তখন যে-ই তার পথে বাধার সৃষ্টি করে, অন্তরায় হয়, তাকেই সে পাথর ছুঁড়ে মারে।

میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے

"আমারে যে বুঝাতে চায় তারেই আমি শত্রু জানি।"

সর্বশেষে আসে কুরবানীর পালা। আসলে এটা ছিল জানেরই কুরবানী। আল্লাহ্ তা'আলা পরম দয়ালু তাঁর অপার দয়ায় একেই মালের কুরবানীতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে প্রেমের পরাকাষ্ঠা ও প্রেমিকের সর্বশেষ পরিণতি ঃ

موت ہے علاج عاشق کا
اس سے اچھا نہیں ہے دوا کوئی

"মৃত্যুই তো সেরা এলাজ পৃথিবীতে আশেক জনার
ইহার চেয়ে ভাল ওষুধ তাহার তরে নাই কিছু আর।[১০]

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

কোন কোন সাহাবী (রেযওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন) কর্তৃক কোন কোন বিরাট ভুলত্রুটি হয়ে যাওয়ায় কোন দিনই মনে কোন খটকা লাগেনি বা প্রশ্নের উদ্ভব হয়নি। যেখানে বড় বড় পীর মাশায়েখ এমন বড় বড় ত্রুটি থেকে মুক্ত। আর কোন বড় থেকে বড় শায়খ বা পীরও কোন নিম্নতম মানের সাহাবীরও সমকক্ষ হতে পারেন না, সেখানে তাঁদের বড় বড় পাপের রেওয়ায়েতাদি দেখে বা শুনেও আল্লাহ্র ফযলে আমার মনে কোনদিন ন্যূনতম সন্দেহেরও উদ্রেক হয়নি। আকাবিরের (গুরুজনের) জুতা ও হাদীছের বরকতে এসব সম্পর্কে সর্বদাই একথা যেহেনে এসেছে যে, ইসলামের শিক্ষার পূর্ণতা বিধানের জন্যেই কেবল কুদরতের হাতেই এগুলো তাঁদের দ্বারা করানো হয়েছে। কবির ভাষায় ঃ

تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر

"তুমি তোমার সখের খেলা খেলেই যাও
দু'জাহানের খুনের সাজা আমারে দাও।"

সেই পবিত্রাত্মাগণ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে বলেছেন ঃ প্রভো! তোমার শরীআতের পূর্ণতা বিধান কর, এজন্যে আমরা প্রস্তরাঘাতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, হাত কাটাবার জন্যে, বেত্রাঘাত সইবার জন্যে আমরা তৈয়ার! আমার মতে কুরআন করীমের আয়াত ঃ

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

"তাঁরাই হচ্ছেন সেসব লোক, যাঁদের গুনাহ্সমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা নেকীর দ্বারা বদলে দেবেন।"

আর এঁদেরই ব্যাপারে হাদীছে এসেছে ঃ "তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, এক একটি পাপের বদলে এক একটি পুণ্য নিয়ে নাও।"

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, রাজকীয় আনুকূল্য বলে একটা কথা আছে। তাতে খুনীদেরকেও ফাঁসির শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু রাজকীয় আনুকূল্যের ভরসায়ও কেউ কোন দিন খুন করতে সাহস পায় না। পাছে, সেই রাজকীয় আনুকূল্য না জোটে এবং শাস্তি এড়ানো না যায়। অবশ্য সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ইনশাআল্লাহ্ সাহাবায়ে কিরাম সেই রাজকীয় আনুকূল্যের সুবিধাটুকু ভোগ করবেনই। কেননা, হাদীছে তাঁদের গুনাহ্র যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে একথাই প্রতীয়মান হয়। হযরত মাআয দ্বারা যিনা বা ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে যায়। হুযূর (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করছেন ঃ আমাকে মাফ করে দিন ইয়া রাসূলুল্লাহ্! হুযূর (সা.) বললেন ঃ যাও, ইস্তিগফার কর, তওবা কর! আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও!

তিনি একটু দূর গিয়েই আবার ফিরে আসেন। তাঁর বিবেক তাঁকে অস্থির করে তুলে। তিনি পুনরায় আরয করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে পবিত্র করুন! হুযূর (সা.) পুনরায় তাঁকে ঐ আদেশ দেন। এভাবে চারবার তিনি আসেন এবং তিনবারই হুযূর (সা.) তাঁকে অনুরূপ তওবা ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়ে বিদায় দেন। চতুর্থবারে তিনি শরীআতের নির্দেশানুযায়ী প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর নির্দেশ দেন।

দু'জন সাহাবী তাতে মন্তব্য করলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্কে গোপনই রেখেছিলেন, এ ব্যক্তি তা' প্রকাশ করে নিজেই নিজেকে শাস্তির মুখে ঠেলে দিল এমনকি শেষ পর্যন্ত প্রস্তরাঘাতে কুকুরের মৃত্যুই বরণ করলো।" তাঁদের এ মন্তব্য শুনে হুযূর (সা.) চুপ রইলেন। একটু অগ্রসর হতেই সম্মুখে একটি মৃত গাধা পড়লো। তার পেট ফুলে উঠেছিল-যদ্দরুন তার একটি পা ঊর্ধদইদিকে উঠে রয়েছিল। হুযূর (সা.) বল্লেনঃ কোথায় অমুক অমুক? তাঁরা বললেন ঃ আমরা হাযির আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন হুযূর (সা.) বললেন ঃ তোমরা এ মৃত গাধাটি খাও দেখি! তাঁরা আরয করলেন ঃ তাও কি সম্ভব? তখন হুযূর (সা.) বল্লেন, "তোমরা যে মুসলমান ভাইটির অবমাননা করেছো, তা' এর চাইতেও জঘন্যতর। যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, এখন সে জান্নাতের নদীতে সাঁতার কাট্ছে।'

হাদীছের কিতাবসমূহের "কিতাবুল হুদূদ" বা অপরাধের শাস্তি সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ জাতীয় কয়েকটি ঘটনারই বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে এমন কোন বড়

পীর ওলী মহানুভব সাধু সজ্জন রয়েছেন—যিনি পাপ করে বিবেকের তাড়নায় এভাবে ব্যাকুলতা অনুভব করবেন?

আল্লাহ্ তা'আলা 'আলিমুল গায়েব। তিনি সকলের গুনাহ্ সম্পর্কেই সম্যক অবহিত এবং গোনাহের পর যে কার কি অবস্থা হবে, তাও তাঁর সম্যক জ্ঞাত। সাহাবায়ে কিরামের এসব মারাত্মক পাপের কথা জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের নামে তাঁর সন্তুষ্টির পরোয়ানা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَالسَّابِقُوْنَ الاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا - ذالك الفوز العظيم -

"অগ্রবর্তী আনসার ও মুহাজিরগণ এবং ইখলাস (বা ইহ্সান ও নিষ্ঠা) সহকারে যাঁরা তাদের অনুবর্তী হয়েছেন আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রীত। আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এটা হচ্ছে বিরাট সাফল্য।" (আয়াতের উর্দু অনুবাদ বয়ানুল কুরআন থেকে নেয়া)

সাহাবায়ে কিরামের মতানৈক্যের কারণ, প্রয়োজন ও তার উপকারিতা[১১]

"এখানে একটা প্রশ্ন মনে জাগে যে, নবী করীম (সা.) যখন উম্মতকে যাবতীয় ব্যাপার শিক্ষা দেয়ার জন্যেই প্রেরিত হলেন এবং এটাই ছিল তাঁর প্রেরিত হওয়ার মুখ্য কারণ, তা হলে তিনি শরীআতের যাবতীয় বিধিনিষেধ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়ে গেলেন না কেন, যাতে আর কোনরূপ বিরোধ বা মতানৈক্যের অবকাশই অবশিষ্ট থাক্তো না। বাহ্যতঃ এ প্রশ্নটি খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলেও আসলে এ প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর ও অর্থহীন। শরীআতের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যেই এরূপ প্রশ্নের উদ্ভব হয় । প্রকৃতপক্ষে এটা হুযূর (সা.)-এর পরম মেহেরবানী ছিল যে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ও মামুলী মাসআলা সম্পর্কে তিনি তন্ন তন্ন করে বলে যাননি নতুবা প্রতিটি ব্যাপারে তাঁদেরকে এক **সুনিদিষ্ট সংকীর্ণ** গণ্ডির ভিতরেই চল্তে হতো। বরং তিনি শরীআতের **বিধি-**

নিষেধসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন। তার মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে সুনির্দিষ্ট–যার মধ্যে কোনরূপ স্বাধীন চিন্তাগবেষণা ও বাদানুবাদ অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। আর অপর প্রকার বিধান হচ্ছে সেগুলি যেগুলিতে মতানৈক্য ও বাদানুবাদকে রহমত বা আশীর্বাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হওয়ার জন্যে এ জাতীয় ব্যাপার স্যাপারে ভুল হয়ে গেলে সে ভুলের জন্যেও পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন। অবশ্য যদি সে গোয়ার্তুমী করে ভুল পথ অগ্রসর না হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে কথাটি দাঁড়ায় এই যে, শরীআত তার আহকাম বা বিধিনিষেধসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। তার একটি হচ্ছে নিশ্চিতও অবধারিত–যাতে আমলকারীর বুঝা সুঝার কোন হাত রাখা হয়নি। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এগুলো বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে, এতে কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখা হয়নি। যুক্তিতর্কের মারপ্যাচেও যদি কেউ এগুলো থেকে সরে দাঁড়ায়, তবুও সে ভ্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ শরীআতের ঐ সমস্ত আহ্কাম–যাতে শরীআত কোনরূপ সংকীর্ণতা রাখেনি, বরং উম্মতের দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে এসব ব্যাপারকে সহজসাধ্য রাখবার দিকটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে, যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়ে কেউ যদি এগুলোকে এড়িয়েও যায় বা আমল নাও করে তবুও তাকে অপরাধী বা ভ্রান্ত বলা হয়নি। প্রথমোক্ত ব্যাপারগুলিকে ই'তেকাদিয়াত (আকীদা বিশ্বাস) বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয়োক্তগুলোকে জুয্ইয়াত, ফুরু'ইয়াত, শার'ইয়াত (বা শরীআতের খুঁটিনাটি আমলের ব্যাপার–স্যাপার) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই দ্বিতীয়োক্ত ব্যাপারসমূহে আসলে শরীআত নিজেই কোন কড়াকড়ি করেনি। এজন্যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ শরীআত ব্যাখ্যাতা নবী (সা.)–এর কাছ থেকে পাওয়া যায়না, নতুবা এগুলো ফরয ওয়াজিবের মত অপরিহার্য হয়ে গিয়ে উম্মতের জন্য এক নিদারুণ সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতো। একটুও এদিক সেদিক করার সামান্যতম অবকাশও বাকী থাকতো না। প্রকৃতপক্ষে তাতেও মতানৈক্যের অবসান ঘটতো না, কারণ শরীআতের বিধানগুলো তো ভাষার শব্দমালা দিয়েই বিবৃত হতো এবং শব্দগুলোরও যেহেতু বিভিন্নমুখী অর্থ হয়ে থাকে, তাই তাতেও কিছু না কিছু বিরোধের অবকাশ থেকেই যেতো। মোদ্দা কথা, শরীআত তার আহকাম বা বিধিনিষেধসমূহকে উসূল (মূলনীতি, প্রধান বা মুখ্যবিষয়সমূহ) এবং ফুরু'আৎ (অপ্রধান গৌণ শাখা–প্রশাখা) এ দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে প্রথমোক্ত

ব্যাপারসমূহে বাদানুবাদ বা মতানৈক্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। যেমন নাকি নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنَ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى ان اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ - الايه

ধর্মীয় ব্যাপারে মতভেদ করতে বারণ করা হয়েছে। আবার দ্বিতীয় প্রকার আহ্কামে ইখতিলাফ বা মতভেদকে রহমত বা আশীর্বাদের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই নবী করীম (স)–এর জীবদ্দশায় এ জাতীয় বিধানের মধ্যে শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এব্যাপারে কোন কড়াকড়ি করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ দু'টি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছি। নাসাঈ তারেক–এর মাধ্যমে দু'জন সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের দু'জনের উপরই একদা গোসল ফরয হলো। একজন পানির অভাবে গোসল করতে না পারায় নামাযই পড়লেন না। (সম্ভবতঃ তায়াম্মুমের বিধান তখনো নাযিল হয়নি বা এটা তাঁর জানা ছিল না।) হুযূর (সা.) তাঁর এ কার্যক্রমকে অনুমোদন করলেন। অপরজন তায়াম্মুম করে নামায পড়লেন। হুযূর (সা.) এ তাঁর কার্যক্রমকেও অনুমোদন করলেন। অনুরূপভাবে হুযূর (সা.) একটি জামাআতকে কবীলায়ে বনূ কুরায়যায় পৌছে আসরের নামায পড়তে নির্দেশ দিলেন। একদল তাঁর এ নির্দেশ রক্ষা করাকেই মুখ্য ধরে নিয়ে দেরী হওয়া সত্ত্বেও আসরের নামায পথে না পড়ে গন্তব্যস্থলে পৌছেই আসরের নামায আদায় করলেন। অপরদল তাঁর নির্দেশ এরূপ থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে পথেই নামায আদায় করে তারপর গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌছলেন। কারণ তাঁর এ নির্দেশের মর্ম যথাশীঘ্র গন্তব্যস্থলে পৌছা বলে ধরে নিয়েছেন। হুযূর (সা.) এদের উভয় দলের কারো প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। বুখারী শরীফে এ ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ আরো অনেক ঘটনা আছে। মোদ্দা কথা, ফুরুয়ী' ইখতেলাফ বা শাখা প্রশাখাগত ও অপ্রধান বিষয়ে মতানৈক্য এক কথা এবং উসূলী ইখতেলাফ বা মৌল বিষয়ে মতানৈক্য অন্য কথা। যারা একেও মৌল ব্যাপারের মতানৈক্যের শামিল বলে ধরে নিয়ে একেও দূষণীয় পর্যায়ের মতানৈক্যে বলে মনে করেন, এটা তাদের অজ্ঞতা বা বিভ্রান্তি। নিঃসন্দেহে শরীআত ফুরুয়ী ইখতিলাফ বা খুঁটি–নাটি ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণের যথেষ্ট অবকাশ রেখেছে। তা' না হলে উম্মত বিধিনিষেধের কড়াকড়ির সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়তো–যা তাদের জন্য দুঃসহ হয়ে

উঠতো। এজন্যেই হারূনুর রশীদ যখন ইমাম মালিক (র)–কে তাঁর 'মুয়াত্তা' কা'বা প্রাচীরে ঝুলিয়ে গোটা উম্মতকে তার উপর আমল করার নির্দেশ দিতে আহ্বান জানালেন–যাতে করে উম্মতের মধ্যে মতানৈক্যের অবসান ঘটে, তখন তিনি তাতে সম্মত হননি এবং সর্বদাই এ জবাব দেন যে, ফুরূয়ী ব্যাপারে ইখতিলাফ বা খুঁটিনাটি মতানৈক্য সাহাবীদের মধ্যেও বিরাজমান ছিল অথচ তাঁদের সকলেই ছিলেন নির্ভুল ও বিশুদ্ধ মতাবলম্বী। বিভিন্ন জনপদে তাঁদের এ পরস্পরবিরোধী অভিমত ও মসলকসমূহ চালু রয়েছে। এগুলোকে বাধা দেওয়ার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। অনুরূপভাবে মনসুর যখন হজ্জ করতে এসে ইমাম মালিকের কাছে দরখাস্ত করলেন যে, তিনি যেন তাঁর লিখিত গ্রন্থাদি তাঁর হাতে সমর্পণ করেন–যাতে করে এর অনুলিপিসমূহ সমস্ত মুসলিম প্রদেশসমূহে পাঠিয়ে এর বাইরে কিছু করতে আইন করে মুসলমানদেরকে বারণ করে দেয়া যায়, তখন তিনি বললেনঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনি অবশ্যই এমনটি করবেন না; লোকের কাছে হাদীছসমূহ এবং সাহাবীদের অভিমতসমূহ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। লোকে সেগুলোর উপর আমল করছে। তাদেরকে সেভাবেই আমল করতে দিন! হুযূর (স্বা.) যে বলেছেন ঃ "আমার উম্মতের মতানৈক্য রহমতের কারণ হবে"। তার অর্থ এটাই। এটাই হচ্ছে সেই দৃশ্যমান সুস্পষ্ট রহমত বা আশীর্বাদ! আজ সকল ইমামই মতভেদযুক্ত মাসআলাসমূহে অন্য ইমামের অভিমত অনুসারে শরয়ী প্রয়োজনমত ফাতাওয়া দেওয়াকে জায়েয মনে করেন। এই ইখতিলাফ বা মতানৈক্য না। থাকলে কোনমতেই সর্ববাদীসম্মত মত পরিহার করা জায়েয হতো না। মোটকথা, ইমামগণের এই ইখতিলাফ আসলে শরীআতের দৃষ্টিতেই কাম্য। তাতে শুধু উপরোক্ত এক প্রকারের ফায়দাই নয় এছাড়াও নানাবিধ উপকার নিহিত রয়েছে।[১২]

সাহাবীগণের মতানৈক্যের সুফল

"হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের 'লকব' হচ্ছে উমরে ছানী বা দ্বিতীয় উমর এবং তাঁর খিলাফতকে খুলাফায়ে রাশিদীনের সমপর্যায়ের বলে মনে করা হয়ে থাকে। তিনি বলতেন ঃ

ما سرني لو ان اصحاب محمد لم يختلفوا لانهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ যদি (বিভিন্ন ব্যাপারে) মতানৈক্য পোষণ না করতেন তবে আমি তাতে আনন্দিত হতাম না। কেননা,

তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য না থাকলে যেকোন একটি মতকে গ্রহণ করার স্বাধীনতাটুকুই আর থাকতো না। (যুরকানী—'আলাল মাওযাহিব) দারেমীও হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের এরূপ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তারপর তিনি লিখেছেন ঃ তারপর হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তাঁর রাজত্বের সর্বত্র ফরমান জারী করলেন যে, প্রত্যেক এলাকার লোক যেন তাঁদের এলাকার আলিমগণের ফাতাওয়া অনুযায়ী আমল করেন। বিশিষ্ট ক্বারী ও আবিদ (দরবেশ স্বভাবসম্পন্ন) তাবেয়ী আওন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, সাহাবীগণ কোন ব্যাপারেই বিভিন্ন মত পোষণ করবেন না, এটা আমার মনঃপূত নয়। কেননা, কোন ব্যাপারে তাঁদের অভিমত যদি অভিন্ন হয় আর কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করেন তবে সে সুন্নত পরিত্যাগকারী বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মত থাকে, তবে যে কোন একটি অভিমত অনুযায়ী কাজ করলেই তা' (সুন্নত অনুযায়ী বলে গণ্য হবে) সুন্নত পরিত্যাগ বলে গণ্য হবে না। (দারেমী)। বিশিষ্ট ইমাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন ঃ কুরআন-হাদীছের মুকাবিলায় কারো অভিমতই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। সাহাবীগণের সর্ববাদীসম্মত মতেরও বিরুদ্ধাচরণও গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যেসব ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে সেসব ব্যাপারে যাঁদের অভিমতকে কুরআন-হাদীছের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল দেখবো, সে অভিমতকেই আমরা গ্রহণ করবো।" অন্যত্র তিনি বলেনঃ সাহাবাগণের অভিমতসমূহের বাইরে আমরা যাবো না।" (মুক্বাদ্দমায়ে আওজায)

'দুররে মুখতার' ও 'শামীতে' লিখেছেন ঃ মুজতাহিদ বা ইজতিহাদী শক্তিসম্পন্ন গবেষক আলিমগণের মতানৈক্য রহমত। তাঁদের মতানৈক্য যত বেশী হবে, রহমতও ততই বেশী হবে। আমার জিজ্ঞাস্য, আলিমগণের মতানৈক্য কবে হয়নি? ইসলামের আদিযুগ তথা পৃথিবীর আদিযুগ থেকে এমন কোন্ যুগ, কোন্ সময়টা গিয়েছে যখন বিদ্বজনদের এবং হকপন্থীদের মধ্যে মতানৈক্য হয়নি? স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই কি নবীরাসূলের প্রতি এক অভিন্ন দীন ও শরীআত অবতীর্ণ করেছেন? দীনের মূলনীতি একই ছিল ঠিক, কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপারসমূহে সর্বদাই মতানৈক্য ও বিরোধ রয়েছে। হযরত দাঊদ (আ.) হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বিভিন্ন বিচার মীমাংসায় কি মতানৈক্য হয়নি? এবং তাঁদের এ মতানৈক্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁদের উভয়েরই প্রশংসা করেন নি?[১৩]

ধর্মীয় বিধান নিয়ে ঠাট্টা–উপহাস

নবী করীম (স)–এর ইরশাদ ঃ যে ব্যক্তি কোনরূপ শরী'আত–গ্রাহ্য ওযর ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের কোন রোযা ভঙ্গ (বা তরক) করবে, রমযান ছাড়া অন্য সময়ে সারা জীবনের রোযা দ্বারাও তার প্রতিবিধান হবার নয়।"

এই হাদীছের ভিত্তিতেই হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু সহ এক দল আলিমের অভিমত হলো, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে রমযানের কোন রোযা তরক করলো তার কাযা বা প্রতিবিধান আর সম্ভবই নয়, চাই সে সারা জীবনই রোযা রাখতে থাকুক না কেন। কিন্তু সাধারণভাবে ফিক্হ্ শাস্ত্রাবিদগণের (জমহুর ফুকাহার) অভিমত হলো, রমযানের রোযা যদি আদৌ না রেখে থাকে, তবে রমযানের এক রোযার পরিবর্তে একটি রোযা রাখলেই কাযা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি রোযা রেখে ভঙ্গ করে থাকে, তবে কাযা স্বরূপ এক রোযা রেখে কাফ্ফারা স্বরূপ দু'মাস (ষাটটি) রোযা রাখলেই সে ঐ রোযাটির ফরযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে। এতদসত্ত্বেও রমযান শরীফের রোযার বরকত সে অর্জন করতে পারবে না। পরে যদি রোযার কাযা আদায় করে তবেই ঐ কথা। আর যদি এ জামানার কোন কোন ফাসেক ফাজের লোকের মত আদৌ সে রোযা না রাখে, তবে তার গুমরাহীর কথা আর কি বলবো?

রোযা হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ বা ভিত্তিসমূহের অন্যতম। নবী করীম (সা.) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথমে হচ্ছে আল্লাহ্র একত্ব ও রাসূলের রিসালতের স্বীকারোক্তি। তারপরের চারটি ভিত্তি হচ্ছে (১) নামায, (২) রোযা (৩) হজ্জ ও (৪) যাকাত। এমনও অনেক মুসলমান আছে, যারা আদমশুমারীর খাতায় মুসলমান বলেই গণ্য হয়ে থাকে, অথচ উক্ত পঞ্চভিত্তির একটিও তাদের মধ্যে নেই। সরকারী কাগজপত্রে তাদের পরিচয় মুসলমান হলেও আল্লাহ্র খাতায় তারা মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে না। এমন কি হযরত ইব্ন আব্বাসের রিওয়ায়েতে ইসলামের ভিত্তি তিনটি বিষয়ের উপর বলা হয়েছেঃ (১) কলেমায়ে শাহাদত, (২) নামায ও (৩) রোযা। যে ব্যক্তি এ তিনটির মধ্যে একটিও তরক করবে সে কাফির–হত্যাযোগ্য। আলিমগণ এ জাতীয় রিওয়ায়েতসমূহের অর্থ সম্পর্কে যতই বলুন না কেন যে, এসবের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের দ্বারাই কেবল কোন ব্যক্তি কাফির হয় বা তাঁরা অন্য যেকোন ব্যাখ্যাই করুন না কেন, এ জাতীয়

লোকদের ব্যাপারে নবী করীম (সা.)–এর সতর্কবাণীসমূহ যে খুবই কঠোর, তাতে তো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ফরয কাজসমূহ আদায়ে যারা ত্রুটি করেন, আল্লাহ্র গযবকে তাদের খুবই ভয় করা উচিত। কেননা মৃত্যুর ছোবল থেকে কেউই রক্ষা পাবে না, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অচিরেই হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আল্লাহ্র আনুগত্যই কেবল কাজে আসবে। অনেক অজ্ঞ লোক তো রোযা তরক করেই ক্ষান্ত হয়, কিন্তু অনেক বদ্‌দেল ধর্মদ্রোহী লোক এমনও আছে, যারা মুখে এমন কুবাক্যও উচ্চারণ করে বসে যা' তাদেরকে কুফর পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। যেমন, "যার ঘরে খাবার নেই, সে–ই রোযা রাখুক", "আমাদেরকে ভুখা মারলে খোদার লাভটা কী? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ জাতীয় বাক্য থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। খুব মনোযোগ দিয়ে একটা মাসআলা জেনে রাখা উচিত, আর তা' হলো, দীনের যেকোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করলে, তাতে তা উপহাসকারী ব্যক্তির কাফের হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবনও নামায না পড়ে, বা রোযা নাও রাখে, অনুরূপভাবে অন্য কোন ফরযও আদায় না করে, তবে ঐ সমস্ত ব্যাপারের প্রতি অস্বীকৃতি না জানালে সে কাফির হয় না, যে ফরযটি তরক করে, তার জন্যে গুনাহ্গার হয় এবং যে ফরয আদায় করে তার ছওয়াব সে পায়, কিন্তু দীনের কোন ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়েও হাসিঠাট্টা করা কুফরী কাজ–এর দ্বারা সারা জীবনের নামায রোযার ফল নষ্ট হয়ে যায়। কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুতরাং রোযা সম্পর্কে এরূপ মূর্খতাব্যঞ্জক শব্দ কখনো মুখে আনবে না। ঠাট্টা উপহাস যদি নাও করে, তবুও বিনা ওযরে রোযা তরককারী ফাসেক–খোদাদ্রোহী। এমনকি ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, রমযান মাসে প্রকাশ্যে বিনা ওযরে পানাহারকারীকে হত্যা করা উচিত। ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতির দরুন যদি তা' সম্ভবপর নাও হয়, কারণ এটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং আমীরুল মু'মিনীন বা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারেরই দায়িত্ব–এ ঘৃণ্য কাজকে ঘৃণা করার দায়িত্ব থেকে তো কেউই অব্যাহতি পাবেন না। আর অন্তরে এরূপ ঘৃণ্য কাজকে ঘৃণাও না করলে এর নীচে ঈমানেরও আর কোন স্তর নেই।'[১৪]

ইসলামী ও অনৈসলামী বিবাহ

"বিদ্বজনেরা লিখেছেন, দু'টি ইবাদত এমন যা' হযরত আদম 'আলা নাবিয়্যিনা ওয়া 'আলায়হিস্ সালাত ওয়াস সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত

এমন কি জান্নাতেও বাকী থাকবে, সেগুলো হলো, ঈমান ও বিবাহ। নবী করীম (সা.) বিবাহকে তাঁর সুন্নত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, "বিবাহ হচ্ছে, আমার সুন্নত, আর যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার কেউ না।" কিন্তু আমরা এতে অনেক বাহুল্য যোগ করে একে একটি বিরাট বিপদ বা ভয়াবহ বিষয়ে পরিণত করেছি। হুযূরে আকরাম (সা.) ও তাঁর মহামতি সাহাবীগণের (রিযওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমাঈন) যামানায় তা' সুন্নতেরই মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। আমরা যেসব বাহুল্য এতে সংযোজিত করেছি, তার বিন্দুবিসর্গও তখন বিবাহের মধ্যে ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম যে রাসূলূল্লাহ্ (সা.)-কে কিভাবে ভালবাসতেন 'হিকায়াতে সাহাবা' কিতাবে তার কিছু নমুনা আমি উদ্ধৃত করেছি। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) মশহুর সাহাবী দশ জান্নাতীর অন্যতম এবং হুযূর (সা.)-এর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সদাপ্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু এহেন প্রিয় সাহাবীও তাঁর বিবাহে হুযূর (সা.)-কে দাওয়াত দেয়া তো দূরের কথা, এখবরটাও তাঁকে জানাননি। হুযূর (সা.) যখন তার পরিধেয় বস্ত্রে পিত্তবর্ণের ছাপ দেখতে পেলেন-যা' সাধারণতঃ বিবাহ শাদী উপলক্ষে সুগন্ধির জন্যে সে যুগে ব্যবহৃত হতো-তখনই কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কী তুমি বিয়ে করে ফেলেছ নাকি হে? জবাবে তিনি বল্লেন-"জী হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!" হুযূর (সা.) ফরমান ঃ যে বিবাহ যত হাল্কা (বা আনুষ্ঠানিকতামুক্ত) তা-ই ততবেশী বরকতপূর্ণ। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এমন একটি সহজ সরল সুন্নতকে আমরা নানা প্রকার কুসংস্কার জড়িয়ে কঠিনতম ব্যাপারে পরিণত করে ফেলেছি। এ জন্যে না জানি কত নামাযই কাযা হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে, ঠিক নামাযের সময়টাতেই বর-কনেকে বিদায় দেয়া (রুখসতী) হচ্ছে, বর-কনে বরযাত্রী সকলেরই জামাআত তাতে ফউত হয়ে যায়। যার সূচনা এমনি অলক্ষুণে তার পরিণতিতে ঝগড়াঝাটি ফিতনা-ফ্যাসাদ যতই হোক না কেন, কমই বল্তে হবে। তত্ত্বজ্ঞানী আলিমগণ লিখেছেন যে, যে সন্তান নামাযের সময়কালীন মিলনে মাতৃগর্ভে এসে থাকে, (অর্থাৎ এ মিলনের জন্য নামায কাযা হয়েছে)। সে পিতামাতার অবাধ্য ও ক্লেশের কারণ হয়ে থাকে।আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুধরিয়ে দিন এবং আমাদেরকে হিদায়েত করুন। বিপদ হলো, এসব বাহুল্যের দরুন বিবাহযোগ্যা মেয়েরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিবাহ ছাড়াই পিতৃগৃহে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। তার চাইতেও বড় বিপদ হচ্ছে, এজন্যে সূদের বিনিময়ে টাকা ধার নিতে হয়-যাকে কুরআনে পাকে আল্লাহ্

ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে কে টিকতে পারে? আর এ সব বিপদ বরণ করে নেয়ার ওযরস্বরূপ নিজেদের মানইজ্জত রক্ষার কথা বলা হয়ে থাকে। আমার তো শত শত বন্ধুবান্ধব ও মুরুব্বী–বুযুর্গদের বিবাহ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে–যাঁরা এসব অনর্থক বাহুল্যের ধারেকাছে না গিয়েও বিবাহ্ করেছেন এবং এতে তাঁদের নাকও কাটা যায়নি।"[১৫]

সাহচর্যের প্রভাব

"হুযূর (সা.)–এর পাক ইরশাদ ঃ মুসলমান ছাড়া অন্য কারো সাহচর্য অবলম্বন করো না এবং তোমার খাবার যেন মুত্তাকী ধর্মপ্রাণ লোক ছাড়া অন্যরা না খায়।"

এ হাদীছে হুযূর (সা.) দুইটি আদব বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ সাহচর্যও উঠাবসা হবে কেবলমাত্র মুসলমানদের সাথে, অমুসলিমের সাথে নয়। এখানে মুসলমান বলতে যদি কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বুঝানো হয়ে থাকে, তবে তো তার অর্থ হচ্ছে ফাসেক–ফাজের পাপাচারী ধরনের লোকের সাথে উঠাবসা করবে না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে যেহেতু 'মুত্তাকী পরহেযগার' শব্দের উল্লেখ আছে তাতে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। উপরন্তু আর একটি হাদীছের দ্বারাও এর সমর্থন মিলে যাতে বলা হয়েছে যে হুযূর (সা.) ইরশাদ করেনঃ তোমার ঘরে যেন মুত্তাকী ধর্মপ্রাণ লোক ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ না করে। (কান্যুল উম্মাল) আর যদি নির্বিশেষে মুসলমান অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা'হলে তার অর্থ হবে কাফির বা বিধর্মীদের সাথে অহেতুক মেলামেশা করতে যেয়ো না। মোটকথা, কুসঙ্গ বর্জন ও সুসঙ্গ গ্রহণেরই তাগিদ রয়েছে মহানবী (সা.)–এর এ পবিত্র বাণীতে। কেননা, মানুষ সাধারণতঃ যে ধরনের লোকের সাথে উঠাবসা করে থাকে, তাদের প্রভাব তার উপর অনিবার্যভাবেই পড়ে থাকে। সে কারণেই তিনি বলেছেন যে, মুত্তাকী ও ধর্মপ্রাণ লোক ছাড়া অন্যরা যেন তোমার ঘরে প্রবেশ না করে। অর্থাৎ এ ধরনের লোকদের সাথে উঠাবসায় তাঁদের প্রভাব তোমার উপর পড়বে। হুযূর পাক (সা.)–এর ইরশাদ ঃ সৎসঙ্গী হচ্ছে কস্তুরী বিক্রেতা তুল্য। তুমি যদি তার কাছে বস তবে সে তোমাকে এক–আধটু কস্তুরী হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিবে, তুমিও তার নিকট থেকে কিছুটা কিনে নেবে। তাও যদি না হয়, তবে অন্ততঃ তার কস্তুরীর কিছুটা সৌরভ তুমি পেয়েই যাবে। (এবং তোমার মন মগজ স্নিগ্ধ হবে।) আর অসৎসঙ্গ গ্রহণ হচ্ছে

কামারের হাপরের কাছে বসার তুল্য, তার হাপর থেকে কোন স্ফুলিঙ্গ উড়ে যদি তোমার কাপড়ের উপর পড়ে, তবে তা পুড়ে যাবে আর তা' যদি নাও হয় তবে লোহাপোড়া দুর্গন্ধ ও ধোঁয়া থেকে তো কোনমতেই নিস্তার নেই। (মিশকাত)। অপর এক হাদীছে আছে, "মানুষ চলে তার বন্ধুবান্ধবের চাল চলন অনুসারেই। সুতরাং কার সাথে তুমি বন্ধুত্ব করছো, তা' উত্তমরূপে ভেবে নিও।" অর্থাৎ সংস্পর্শের প্রভাব মনের অজান্তেই মানুষের উপর পড়তে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সে তার ধর্মই গ্রহণ করে বসে। তাই সঙ্গীদের ধর্মীয় অবস্থা কি অর্থাৎ সে ধার্মিক না অধার্মিক তা ভালমতে দেখে নেবে। ধর্মদ্রোহী বদ্দীন লোকদের সাথে বেশী উঠাবসা করলে, তাদের বদদীনীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে মদ্যপ বা দাবা খেলায় অভ্যস্তদের সাথে কিছুদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলেই এ রোগে পেয়ে বসে। হাদীছে আছে, হুযূর (সা.) হযরত আবূ রযীনকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি এমন বিষয় তোমাকে শিক্ষা দিব যা' তোমার আয়ত্তে আসলে তা' তোমার ইহকাল পরকালের মঙ্গলের কারণ হবে? আল্লাহ্‌র যিকিরকারিগণের সংসর্গ অবলম্বন করবে এবং যখন একাকী থাকবে, তখন সাধ্যমত আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারা তোমার রসনাকে সচল রাখবে। আর আল্লাহ্‌রই জন্য বন্ধুত্ব করবে এবং আল্লাহ্‌রই জন্য শত্রুতা করবে। (মিশকাত) অর্থাৎ বন্ধুত্ব বা শত্রুতার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন নিজের খেয়ালখুশী বা নফসের চাহিদা মেটানো নয়। ইমাম গায্যালী (র.) বলেন ঃ সঙ্গীর মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকতে হবে ঃ

১. তাকে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হতে হবে। কেননা, বুদ্ধি হচ্ছে মূলধন স্বরূপ। নির্বোধের সঙ্গ গ্রহণে কোনই মঙ্গল নেই। শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গতা ও সম্পর্কচ্ছেদই অনিবার্য হয়ে উঠে। হযরত সুফিয়ান ছওরী (র.) থেকে এমন কথাও বর্ণিত আছে যে, নির্বোধের চেহারা দেখাও পাপ।

২. তাকে চরিত্রবান হতে হবে। কেননা, চরিত্র যদি নষ্ট হয়, তবে তা' অনেক সময়ই বুদ্ধিকে পরাস্ত করে দেয়। কোন ব্যক্তি হয়ত প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কিন্তু তার কাম-, ক্রোধ, লোভ, কার্পণ্য প্রভৃতি রিপু তার বুদ্ধিকে প্রায়ই আড়ষ্ট করে রাখে।

৩. সে যেন ফাসিক বা পাপাচারী না হয়। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কেই ভয় করে না, তার বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করা চলে না। না জানি, কখন কোন বিপদের মুখে ঠেলে দেয়।

৪. সে যেন বিদআতী ও কুসংস্কারচ্ছন্ন না হয়। কেননা, তার সাথে অন্তরঙ্গতার দরুন বিদআত ও কুসংস্কারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার এবং তার রোগ সংক্রামিত হওয়ার আশংকা থাকে। এমন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক থাকলে তা' ছিন্ন করাই কর্তব্য, তার পরিবর্তে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করা মোটেই সমীচীন নয়।

৫. সে ব্যক্তি যেন দুনিয়ার লোভী না হয়। এমন ব্যক্তির সাহচর্য প্রাণঘাতী বিষতুল্য। কেননা, মানব মন স্বভাবতই পরানুকরণকারী। মনের অজান্তেই তার উপর অন্যের প্রভাব পড়ে থাকে। (এহ্ইয়াউল উলূম), মানুষের উপর কেবল যে মানুষের প্রভাব পড়ে তাই নয়, বরং যেসব বস্তুর সাথে তার বেশী সম্পর্ক থাকে, সেগুলির প্রভাবও তার মনে ছায়াপাত করে থাকে। হুযূর (সা.) থেকে রিওয়ায়েত আছে যে, বকরীওয়ালাদের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি হয়, পক্ষান্তরে, ঘোড়াওয়ালাদের মধ্যে গর্ব ও অহঙ্কারের উদ্রেক হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত পশুদ্বয়ের মধ্যে উক্ত দু'টি স্বভাব বিদ্যমান আছে।

উট--বলদওয়ালারা কর্কশ স্বভাব সম্পন্ন হয়ে থাকে বলেও হাদীছে আছে। উপরোক্ত হাদীছে দ্বিতীয় যে আদবের কথা বলা হয়েছে, তা'হলো, তোমার খাদ্যবস্তু কেবল মুত্তাকী ধর্মপ্রাণ লোকেরাই যেন খায়। এ বক্তব্য অন্য অনেক হাদীছে পাওয়া যায়। এক হাদীছে আছে ঃ আপন খাদ্যদ্রব্য মুত্তাকী লোকদেরকে খাওয়াও এবং তোমার কল্যাণ যেন মু'মিনরা লাভ করে। (এতহাফ)। আলিমগণ লিখেছেন যে, এ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা দাওয়াতের আহার্যের কথা বুঝানো হয়েছে, অভাবের আহার্য নয়। তাই এক হাদীছে বলা হয়েছে, আপন আহার্যদ্রব্য এমন লোকদের দাওয়াত করে খাওয়াবে, যার সাথে আল্লাহ্র জন্যে তোমার সদ্ভাব রয়েছে। (এতহাফ), অভাবীদেরকে খাদ্য প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কয়েদীদেরকে খাওয়ানোরও প্রশংসা করেছেন। আর সে যামানার কয়েদীরা (যুদ্ধবন্দীরা) কাফিরই ছিল। (মাযাহের)। হাদীছে আছে, জনৈকা বেশ্যা রমণী কেবল এজন্যেই মাগফিরাত বা ক্ষমা লাভ করে যে, সে একটি পিপাসাকাতর কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল। আরও অনেক রিওয়ায়েতের দ্বারাও এর সমর্থন মিলে। হুযূর (সা.)[১৬] নীতিগতভাবে বলে দিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি জীবের সেবায়ই ছওয়াব পাওয়া যায়, চাই সে ধার্মিক হোক বা পাপাচারী হোক, মুসলিম হোক বা কাফিরই হোক, মানুষ হোক বা জীব-জন্তুই হোক। সুতরাং অভাবীদেরকে অভাবহেতু আহার্য প্রদানের বেলায় সে হিসাব করা হয় না, বরং সেখানে তো অভাবের প্রাচুর্যও স্বল্পতাই বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে।

অভাবের পরিমাণ যতই বেশী হবে ছওয়াবের পরিমাণও ততই বেশী হবে। আর যদি সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার জন্যে খাওয়ানো হয়, তবে সেখানেও দীনী কোন কল্যাণের আশায় খাওয়ানো হলে সে কল্যাণের অনুপাতে ছওয়াব পাওয়া যাবে। আর যদি তাতে কোন দ্বীনী মকসূদ না থাকে, তবে যারা খাবেন তারা যে পরিমাণ পরহেযগার হবেন, সেই পরিমাণ অনুপাতে ছওয়াব পাবেন।

দাঈ' ও মুবাল্লিগগণের গুরুদায়িত্ব

"একটি বিশেষ বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাই, আর তা' হলো, এই যামানায় যেভাবে স্বয়ং তাবলীগের ব্যাপারেই ব্যাপক ত্রুটি হচ্ছে এবং সাধারণভাবে লোক এ ব্যাপারে গাফলতির শিকার, তেমনি কোন কোন লোকের মধ্যে একটি বিশেষে ব্যাধি এটাও পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, যখন তাঁরা ধর্মীয় বক্তৃতা লেখা, শিক্ষাদান, তাবলীগ, ওয়ায প্রভৃতি দায়িত্বে নিয়োজিত হন, তখন তাঁরা অন্যদের নিয়ে এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, নিজেদের ব্যাপারে তাঁরা একেবারেই উদাসীন হয়ে পড়েন। অথচ, অন্যদের শুদ্ধির চাইতে আত্মশুদ্ধি অনেক বেশ্বী গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। নবী করীম (সা.) বিভিন্ন সময়ে এব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন যে, কেউ যেন অন্যদেরকে সদুপদেশ দিয়ে নিজে আবার পাপাচারে মত্ত না থাকে।

তিনি শবে-মি'রাজে একদল লোককে দেখতে পেলেন-যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এরা কারা? জবাবে হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন ঃ এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ওয়ায়েয ও বক্তার দল যারা অন্যদেরকে ধর্মীয় উপদেশ খয়রাত করতেন, কিন্তু নিজেরা তা' পালন করতেন না। (মিশকাত)

এক হাদীছে আছে, বেহেশতবাসী কিছুলোক কোন কোন দোযখবাসী লোকদেরকে দোযখে দেখে বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করবে, আপনারা যে দোযখে, ব্যাপার কী? আমরা তো আপনাদের মুখের ধর্মীয় উপদেশ শুনে সে অনুপাতে আমল করেই বেহেশ্‌তে এসেছি? তারা বল্‌বে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ বিতরণ করতাম, কিন্তু নিজেরা সে অনুসারে আমল করতাম না। অপর এক হাদীছে আছে, পাপাচারী ক্বারী (আলিম)দের দিকে জাহান্নামের আগুন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে। তাঁরা তাতে বিস্মিত হবেন যে, মূর্তিপূজারীদেরও পূর্বে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তখন জবাব দেয়া হবে, জ্ঞাতসারে কোন পাপকর্ম করা অজ্ঞতসারে করার সমান হতে পারে না।[১৭]

কুরআন পাকের সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসারে সমাজপতিদের অমার্জনীয় অপরাধ

"মোটেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি এ পর্যন্ত পৌছে আমি সমাজপতিদের কাছে অনুযোগ করি যে, কুরআনে পাকের প্রচার–প্রসারে আপনাদের পক্ষ থেকে কী সাহায্যটা পাওয়া যায়! আর শুধু তাই নয়, যদি বলি, যখন কুরআন শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করা হচ্ছে, জীবন নষ্ট করা বলে মনে করা হচ্ছে, অযথাই দেমাগ নষ্ট করা ও প্রতিভাকে অযথা মাটি করা বলা হচ্ছে, তখন এসব অপপ্রচার বন্ধ করার জন্যেই বা আপনারা কী করেছেন? হয়তো আপনি এসব কথার সাথে একমত নন, কিন্তু একটি দল যখন কায়মনবাক্যে এ অপচেষ্টায়ই লেগে আছে, তখন আপনার নির্বিকার থাকাটাই কি তাদের সাহায্যের নামান্তর নয়? মানলাম যে আপনি এ ধারণার সাথে আদৌ একমত নন, কিন্তু আপনার ভিন্ন মত পোষণ করায় লাভটা কী হচ্ছে ?

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

ত্রুটি তোমার হবে না যে না হয় তাই নিলাম মেনে,
(কিন্তু) যদি তোমার জানার আগে মরেই যাই লাভ কি জেনে?

আজ কুরআন শিক্ষার প্রবল বিরোধিতা করা হচ্ছে এ জন্যে যে, মসজিদের মোল্লারা এদ্বারা রুটি রুজি হিল্লা করছে! সাধারণভাবে যদিও এটা নিয়্যাতের উপর হামলা এবং অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ–যথা সময়ে এর প্রমাণ দিতে হবে, কিন্তু আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরয করবো, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটু ভেবে দেখুন তো এ স্বার্থপর মোল্লাদের স্বার্থপরতার ফলাফল আপনরা দুনিয়ায় কী দেখছেন, আর আপনাদের নিঃস্বার্থ প্রস্তাবাবলীর ফলাফল কী হবে? কুরআনে পাকের প্রচার–প্রসারে আপনাদের এ মূল্যবান প্রস্তাবাবলী কতটুকু সহায়ক হবে? যাই বলুন না কেন, হুযূর (সা.) আপনাদের প্রতি কুরআনের প্রচারপ্রসারের নির্দেশ দিয়েছেন। এবার আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন, সে নির্দেশ পালনে আপনারা কতটুকু যত্নবান হয়েছেন বা হচ্ছেন? দেখুন, অপর একটি ব্যাপারেও খেয়াল রাখবেন, অনেকের ধারণা, আমরা তো ঐসব কুরআনবিরোধী ধ্যানধারণা বা বক্তব্যের সাথে আর একমত নই! আমাদের তাতে কি? কিন্তু তাতে আপনারা আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহী থেকে বাঁচতে পারছেন না। সাহাবায়ে কিরাম হুযূর (সা.)–কে জিজ্ঞসা করেছিলেন ঃ

انهلك و فينا الصالحون ؟ قال نعم اذا اكثر الخبث ।

—"আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকরা থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো?" জবাবে হুযূর) (সা.) বল্লেন ঃ "হাঁ, যখন মন্দের প্রাচুর্য হয়ে যাবে, তখন তা–ই হবে।" অনুরূপভাবে অন্য রিওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা একটি জনপদকে উলটপালট করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.)·আরয করলেন ঃ রব্বুল আলামীন! ঐ জনপদে আপনার এমন একজন বান্দাও রয়েছেন, যিনি কোনদিন কোন পাপকার্য করেননি! ইরশাদ হলো ঃ ঠিক আছে, কিন্তু আমার অবাধ্যতার দৃশ্য দেখে কোনদিন তার কপাল একটু কুঞ্চিতও হয়নি! আসলে, এ কারণেই আলিম সমাজ নাজায়েয কার্যকলাপ দেখলে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন–যাকে আমাদের মুক্তমনা প্রগতিশীলগণ সঙ্কীর্ণদৃষ্টি বলে অভিহিত করে থাকেন।

আপনারা আপনাদের উদার মন ও সহনশীল চরিত্রের জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন না। কেননা, কোন না–জায়েয কাজ দেখলে সাধ্যমত তার প্রতিবাদ প্রতিবিধান করা কেবল আলিমদেরই নয়, সকলেরই জাতীয় দায়িত্ব।"[১৮]

টীকা ঃ

১. হাদীছে জিবরাঈল নামে বিখ্যাত উক্ত হাদীছের উক্ত অংশে জিবরাঈল (আ)–এর "ইহ্সান কি?" এই প্রশ্নের জবাবে হুযূর (সা.) বলেছিলেন ; "তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ।" এখানে একেই তাসাওউফের শেষ স্তর বলা হয়েছে আর প্রথম স্তররূপে উক্ত হাদীছাংশের অর্থ হচ্ছে, নিয়্যাতের উপরই প্রত্যেক কাজের ফলাফল নির্ভরশীল।"–অনুবাদক

২. আল–আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৯৮৬–৮৭ সালে প্রেরিত প্রথম বাংলাদেশী ইমাম প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে আমার কায়রো অবস্থানকালে জনৈক আফ্রিকান সতীর্থ ইমামের মুখে শুনেছি, বৎসরের ঐ নির্দিষ্ট তারিখে আজ পর্যন্ত নাকি তাঞ্জানিয়ার উক্ত জঙ্গলের হিংস্র শ্বাপদগুলো এক রাতের জন্য অন্যত্র চলে যায় এবং দেশবাসীরা উক্ত জঙ্গলে রীতিমত উৎসব পালন করেন।–অনুবাদক

৩. মূলে আছে گھس جانے کے بعد শায়খ একে এভাবে সংশোধন করেছেন।

৪. মওলবী তকীউদ্দীন নদভী মাযাহেরী প্রণীত "সুহ্বতে বা–আউলিয়া" থেকে উদ্ধৃত। 'বুযুর্গানের প্রথম জীবনের দিকে তাকাবেন,' এবং 'আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের পথ খুবই সহজ" শিরোনামের অনুবাদ মৎপ্রণীত "ফাযায়েলে রমযান ও তার অমর রচয়িতা" পুস্তকে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত। বর্তমান অনুবাদটি সেখানে থেকেই উদ্ধৃত।–অনুবাদক

৫. আকাবির কা সুলূকও ইহ্সান, পৃ. ২১–২২

৬. মুসলমানুঁ কা পেরেশানিউঁ কা বেহতরীন এলাজ, পৃ. ৫৩–৫৭ (সংক্ষিপ্ত)

৭. আল–ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল, পৃ. ২৩–২৫

৮. শায়খুল হাদীছ সাহেব মূলে জাতিদ্রোহী শব্দটি লিখেছেন। (অনুবাদক)

৯. আল–ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল, পৃ. ১২৬–১২৮ উদ্ধৃত উক্তিগুলো যে, বৃটিশ আমাল লিখিত, তা বলাই বাহুল্য। বর্তমানকালে ইংরেজরা বা কংগ্রেসের দালাল স্থলে অন্য কোন দেশের যা সরকারের দালাল শব্দটি এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। –অনুবাদক

১০. ফাযায়েলে হজ্জ, পৃ. ৪১–৫২ সংযোজিত।
উর্দু কবিতার এমন সার্থক প্রয়োগ কোন আলিমের রচনায় কদাচিত দেখা যায়। শায়খুল হাদীছের কবি মন ও সাহিত্যিক মান অনুধাবনের জন্য এগুলোই যথেষ্ট। –অনুবাদক

১১. শরীআত ও তরীকত কা তালাযুম, পৃ. ১২–১৭ সংক্ষিপ্ত

১২. ইখতিলাফে আয়েম্মা, পৃ. ৩০–৩৩ দ্রষ্টব্য।

১৩. আল ই'তেদাল ফী মারাতিবির রিজাল, পৃ. ১৯৭–৯৮

১৪. ফাযায়েলে রমযান, পৃ. ৩২–৩৩ (আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত এবং মহানবী স্মরণিকা পরিষদ ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা সংস্করণ পৃ. ৬১–৬৩

১৫. আপবীতি ৩য় খণ্ড অথবা ইয়াদে আইয়্যাম, ২য় খণ্ড পৃ. ১৩৮–৪০

১৬. ফাযায়েলে সাদাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ ১২৭–৮৮

১৭. ফাযায়েলে তাবলীগ, পৃ. ১৯–২০

১৮. ফাযায়েলে কুরআন মজীদ, পৃ. ৬২–৬৩

পরিশিষ্ট

ছড়িয়ে আছেন সবখানে

হযরত শায়খুল হাদীছের খলীফাদের তালিকা

জন্ম-মৃত্যুর চিরন্তন নিয়মে মানুষ দুনিয়া থেকে একদিন বিদায় হয়ে যায়। মহাপুরুষ ওলী-আউলিয়া এমন কি নবী-রাসূলগণও এর ব্যতিক্রম নন। কুরআন পাকের ভাষায় ঃ

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ ....

'মুহাম্মদ (সা.) রাসূলই ছিলেন, এবং তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়ে গিয়েছেন, সুতরাং তিনি যদি মৃত্যু বরণ করেন...।" (৩ ঃ ১৪৪)

হযতে শায়খুল হাদীছও জন্ম-মৃত্যুর এ সাধারণ নিয়মে নির্ধারিত সময়ে "ইয়া করীম ইয়া করীম" উচ্চারণ করতে করতে চলে গিয়েছেন তাঁর করীম মওলার সন্নিধানে। শায়িত হয়েছেন তাঁরই আজীবন লালিত স্বপ্ন অনুসারে প্রিয় নবীর প্রিয় মদীনায় তাঁরই আসহাব ও আহ্‌লে বায়তের সাথে জান্নাতুল বাকীতে। পিছনে রেখে গেছেন তাঁর সারা জীবনের কীর্তি-তিনটি বস্তু ঃ (১) মুসলিম সাধারণ ও বিশ্বের আলিম সমাজ ও হাদীছ শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর সহজবোধ্য ও জ্ঞানগর্ভ দ্বিবিধ রচনাবলী ; (২) তাবলীগী জামাআত ; (৩) বিশ্বের প্রায় সব ক'টি মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর অসংখ্য আধ্যাত্মিক শিষ্য ও সন্তান। এ তিনটি বস্তুর মধ্যে তিনি ছড়িয়ে আছেন বিশ্বব্যাপী সবদেশে, সব ঠাঁই। তাঁর কাছে যাঁরা আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জন করে যথারীতি খিলাফত লাভ করেছিলেন, তার তালিকা দেখলেই সে সত্যটি পাঠকের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠবে। খলীফাদের তালিকা তাই কোন আধ্যাত্মিক উস্তাদ বা শায়খের জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই হযরত শায়খুল হাদীছের খলীফাগণের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তাঁরই খাস খাদেমও দীর্ঘকাল ধরে শায়খুল

হাদীছের সাথীরূপে মদীনা শরীফে অবস্থানকারী সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হুশিয়ারপুরী সাহেবের শুকরিয়াসহ নিম্নে উদ্ধৃত করছি ঃ

১. হযরত মুফতী মাহ্‌মুদ হাসান গাঙ্গুহী (মরহুম)
২. হযরত মাওলানা আবদুল লতীফ সাহেব (মরহুম), সাবেক নাযিম, মাযাহিরুল উলুম, সাহারানপুর।
৩. হযরত মাওলানা মুনাওয়ার হুসায়ন, শায়খুল হাদীছ, জামেয়া লতীফিয়া কাঠিহার, জেলা পূর্ণিয়া, বিহার।
৪. হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ বলিয়াভী, (মরহুম) মুদার্রিস্, মাদ্রাসায়ে কাশিফুল উলুম, দিল্লী।
৫. হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব আ'জমী, শায়খুল হাদীছ, শাহী মসজিদ, মুরাদাবাদ।
৬. হযরত মাওলানা সাঈদ আহ্‌মদ খান মুহাজিরে মদনী, (মরহুম) আমীরে তাবলীগ, সৌদী আরব।
৭. হযরত মাওলানা উমর সাহেব কান্দেলবী (মরহুম), কান্দেলা, মুজাফ্‌ফর নগর, উত্তর প্রদেশ, ভারত (নিখোঁজ)।
৮. হযরত মাওলানা উমর সাহেব পালনপুরী, (মরহুম) তাবলীগী মারকায, নিযামুদ্দীন, দিল্লী।
৯. হযরত মাওলানা মাসউদ এলাহী সাহেব, মীরাট, মুজাফ্‌ফর নগর, ইউপি।
১০. হযরত কারী আবদুল মুঈদ সাহেব সম্ভলী, ইমাম, খোকাবাজার মসজিদ, বোম্বে।
১১. হযরত মাওলানা ওয়াসিকুল একীন, কুরসী, জেলা বারা বাঙ্কি।
১২. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ্ সাহেব কুর্সবী, জেলা বারা বাঙ্কি।
১৩. হযরত মাওলানা মুফতী জয়নাল আবেদীন সাহেব, দারুল উলুম ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান।
১৪. হযরত মাওলানা কিফায়েত উল্লাহ্ সাহেব, বনাসকাঁটা, পালনপুর, গুজরাট।
১৫. হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ সাহেব, সভাপতি, জমিয়তুল উলামা, রেঙ্গুন, বার্মা।

১৬. হযরত মাওলানা মুঈনুদ্দীন সাহেব, শুক্কুর, সিন্ধু, পাকিস্তান।

১৭. হযরত কারী আমীর হাসান সাহেব, সেওয়ান, বিহার, ভারত।

১৮. হযরত মাওলানা আবদুর রহীম মাতালা সূরাটী, আল–মা'হাদুর রশীদী আল–ইসলামী, চাপাটা, জাম্বিয়া (আফ্রিকা)।

১৯. হযরত মাওলানা আলহাজ্জ মালিক আবদুল হাফিয সাহেব, মক্কা মুয়ায্যমা, সৌদী আরব।

২০. হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন সাহেব, জামেয়া লতীফী, কাঠিহার, জেলা পুর্ণিয়া, বিহার।

২১. হযরত ভাই জামীল আহমদ সাহেব, জামেয়া মিল্লিয়া, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভারত।

২২. হযরত মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব, ধামপুর, জিলা বিজনূর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

২৩. হযরত মাওলানা ইউসুফ মাতালা সাহেব, স্টিঙ্গার, দক্ষিণ আফ্রিকা ।

২৪. হযরত হাজী ইবরাহীম মাতালা সাহেব (মরহুম), স্টিঙ্গার, দক্ষিণ আফ্রিকা।

২৫. হযরত সূফী মুহম্মদ ইকবাল সাহেব মুহাজিরে মাদানী, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদী আরব।

২৬. হযরত ডাক্তার ইসমাঈল মায়মনী সাহেব, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদী আরব।

২৭. হযরত মাওলানা ইহ্সানুল হক সাহেব, মাদ্রাসায়ে আরাবিয়া, রায়বিণ্ড, জেলা লাহোর।

২৮. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাজ্জাদ সাহেব, মাদ্রাসা বায়তুল উলুম, সরায়ে মীর, জেলা আজমগড়, উত্তরপ্রদেশ, ভারত।

২৯. হযরত মাওলানা মুঈনুদ্দীন সাহেব, শায়খুল হাদীছ, মাদ্রাসা এমদাদীয়া মুরাদাবাদ, ভারত।

৩০. হযরত মাওলানা আহ্রারুল হক, মাদ্রাসা নূরুল উলূম রাহ্রাইচ, ইউ. পি।

৩১. হযরত মিঞাজী মূসা সাহেব (মরহুম), ফিরোজপুর, নিমক, মেওয়াত।

৩২. হযরত মাওলানা মুনীরুদ্দীন সাহেব মেওয়াতী (মরহুম) নিমক, মেওয়াত।

৩৩. হযরত মুফতী ইসমাঈল কাছুলভী, জামেয়া ডাভিল, জেলা সূরাট, গুজরাট।

৩৪. জনাব আলহাজ্জ আহমদ নাখিযা আফ্রিকী, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদী আরব।

৩৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া মদনী, জামেয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, আল্লামা বিন্নুরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান।

৩৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম পালনপুরী, মাদ্রাসা তালীমুদ্দীন আনন্দ, জিলা খীড়া, গুজরাট।

৩৭. জনাব আলহাজ্জ মালিক আবদুল হক সাহেব, মক্কা মুকার্‌রমা, সৌদী আরব।

৩৮. হযরত মাওলানা ইউসুফ মাতালা সাহেব, দারুল উলুমিল আরবিয়া ইসলামিয়া হোলকম্ববারী, ইংল্যান্ড।

৩৯. হযরত মাওলানা ইসমাঈল বিদাত সাহেব, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদী আরব।

৪০. হযরত কাযী আবদুল কাদির সাহেব, ঝাউরিয়া, জিলা সারগোদা, পাকিস্তান।

৪১. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাহেব (মরহুম), ফিরোজাবাদ, জেলা আগ্রা, ইউ. পি।

৪২. হযরত মাওলানা আহ্মদ লূলাত সাহেব, করমীলী ভায়াপানূলী, জেলা সূরাট, গুজরাট।

৪৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম সাহেব, বাঁকুড়া, পশ্চিম বঙ্গ।

৪৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়র সাহেব, মক্কী মসজিদ, করাচী, পাকিস্তান।

৪৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সুলায়মান পাণ্ডুর, মুদাররিস, মাদ্রাসা নিউটাউন, জোহান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা।

৪৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেব, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান।

৪৭. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হারুন (মরহুম) ইবনে হযরতজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রহ), নিযামুদ্দীন, দিল্লী।

৪৮. হযরত মাওলানা ওয়ারিছ আলী সাহেব, মাদ্রাসায়ে আরবীয়া এশাআতুল উলূম, খায়রাবাদ, জেলা সীতাপুর, অযোধ্যা।

৪৯. হযরত মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ দেশাই, তারকেশ্বর, জেলা সূরাট, গুজরাট, ভারত।
৫০. হযরত মাওলানা আবদুল হালীম, মাদ্রাসা নিয়ামুল উলূম, গুরীনী চুকিয়া, খিতাসরাই, জেলা জৌনপুর।
৫১. হযরত মাওলানা ফকীর মুহাম্মদ, আন্দামান দ্বীপ, ভারত।
৫২. হযরত হাকীম সা'দ রশীদ আজমিরী, রাণী তালাব, জিলা সূরাট, গুজরাট।
৫৩. হযরত মাওলবী আহমদ মিয়া সাহেব, আল-মা'হাদুল ইসলামী, বাওয়াতির ফাল, জোহান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা।
৫৪. হযরত সাহেবযাদা মাওলানা মুহাম্মদ তালহা সাহেব (হযরতের স্থলাভিষিক্ত), সাহারানপুর।
৫৫. হযরত মাওলানা ইবরাহীম আবদুর রহমান মিয়া, জামে' মসজিদ লিন্য, জোহান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা।
৫৬. হযরত মাওলানা আমজাদউল্লা সাহেব গোরখপুরী (মরহুম), মুহাজিরে মদনী।
৫৭. হযরত কাযী মাহ্মুদুল হাসান, ঝাউরিয়া, জিলা সারগোদা, পাকিস্তান।
৫৮. জনাব আলহাজ্জ হাকীম ইয়াসীন সাহেব, মাদ্রাসা সউলাতিয়া, মক্কা শরীফ।
৫৯. হযরত মাওলানা ইয্হারুল হাসান কান্দেলবী, মাদ্রাসা কাশেফুল উলূম মারকাযে তাবলীগ, নিযামুদ্দীন, দিল্লী।
৬০. হযরত হাজী আবদুল আলীম সাহেব মুরাদাবাদী (মরহুম), মুরাদাবাদ, ইউপি।
৬১. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নদভী মাযাহেরী (মরহুম), নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ।
৬২. হযরত মাওলানা আবদুল আযীয খুলনবী, (মরহুম) আমীরে তাবলীগ জামাআত বাংলাদেশ।
৬৩. হযরত আলহাজ্জ গোলাম দস্তগীর, ৪৮ লুইর মাল রোড, লাহোর।
৬৪. হযরত হাকীম আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল কুদ্দুস দেওবন্দী, মদীনা তাইয়্যিবা।
৬৫. হযরত মাওলানা ইউনুস জৌনপুরী, শায়খুল হাদীছ, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর।

৬৬. হযরত মাওলানা কুতবুদ্দীন গায়াভী, মুদার্রিস, শাখা মাদ্রাসা, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর।

৬৭. হযরত মিয়াজী মুহাম্মদ ঈসা মেওয়াতী, ফিরোযপুর নিমক, মেওয়াত।

৬৮. হযরত মাওলানা শফীক সাহেব দেওবন্দী, মুহতামিম, মাদ্রাসা আরবিয়া, সীলম, মাদ্রাজ।

৬৯. হযরত মাওলানা নসীম আহ্মদ আফ্রিদী, আমরুহা, জিলা মুরাদাবাদ।

৭০. হযরত আলহাজ মুহাম্মদ যকী ভূপালী, মদীনা তাইয়্যিবা, সৌদী আরব।

৭১. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ্ সাহেব (মরহুম), বাহ্লী শরীফ, শুজা আবাদ, পাকিস্তান।

৭২. হযরত আলহাজ্জ আনীস আহ্মদ সাহেব, মদীনা মুনাওয়ারা।

৭৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আকীল সাহেব, সদর মুদার্রিস, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর।

৭৪. হযরত মাওলানা হাশিম হাসান প্যাটেল সাহেব, নায়েবে নাযিম, দারুল উলূম হোলকম্ব বারী, ইংল্যান্ড।

৭৫. হযরত ক্বারী রহীম বখশ সাহেব, (উস্তাযুল কুরা) মুলতান, পাকিস্তান।

৭৬. হযরত মাওলানা হাস্সান আহমদ পাটনভী, মদীনা তাইয়্যিবা।

৭৭. হযরত মাওলানা নজীবুল্লাহ্ চাম্পারনী, মদীনা তাইয়্যিবা।

৭৮. হযরত মাওলানা মুযহির আলম মুজাফ্ফরপুরী, কানাডা প্রবাসী।

৭৯. হযরত আলহাজ্জ ফতেহ মুহাম্মদ, আসানসোল, পশ্চিম বঙ্গ।

৮০. হযরত আলহাজ্জ মুহাম্মদ দাউদ সাহেব (মরহুম), এবেটাবাদ, পাকিস্তান।

৮১. হযরত সাইয়িদ মুখতারুদ্দীন সাহেব, কোয়েটা, পাকিস্তান।

৮২. হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান, মারকাযে তাবলীগ, নিযামুদ্দীন, দিল্লী।

৮৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইশতিয়াক সাহেব, জামেউল উলূম, মুজাফ্ফর-পুর, বিহার।

৮৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব, মুদার্রিস, জামেয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, আল্লামা বিন্নুরী টাউন, করাচী।

৮৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ গার্ডি সাহেব, হোয়াইট রিভার, এলিষ্টন্, ট্রান্সভাল, দক্ষিণ আফ্রিকা।

৮৬. হযরত মাওলানা ফয়যুল হাসান সাহেব কাশ্মীরী, দারুল উলুম, দেওবন্দ।
৮৭. হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেব, বাহুলী শরীফ, শুজা আবাদ, পাকিস্তান।
৮৮. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাহির মনসুরপুরী, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
৮৯. হযরত মাওলানা সূফী আবদুল আহাদ সাহেব, মুজাফ্ফরপুর, বিহার।
৯০. হযরত মাওলানা হাশিম বুখারী সাহেব, দারুল উলূম দেওবন্দ।
৯১. হযরত মাওলানা শাহেদ সাহেব, মাযাহিরুল উলূম, সাহারানপুর।
৯২. হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব লুধিয়ানভী, জামেয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, বিন্নুরী, টাউন করাচী।
৯৩. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ্ সাহেব, শায়খুল হাদীছ, জামিয়া রশীদিয়া সাহীওয়াল, পাকিস্তান।
৯৪. হযরত মাওলানা সাইয়িদ রশীদুদ্দীন সাহেব, মুহ্তামিম, মাদ্রাসায়ে শাহী, মুরাদাবাদ, ইউপি।
৯৫. হযরত আলহাজ্জ হাফিয সগীর আহ্মদ, মদীনা স্টেশনারী মার্ট, আনার-কলি, লাহোর।

تمت بالخير

۱۸، نومبر سنه ۱۹۸۷ ع

ইফাবা (উ) ১৯৯৯-২০০০/অঃ সঃ/৪০২৯ -৫,২৫০